ওঁ তৎ সৎ

উৎসর্গ

প্রাণের ধ্রুবতারা—

জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা

উদাসীনাচার্য্য শ্রীমৎ সুমেরদাসজী

গুরুদেব-শ্রীচরণসরোরুহেষু—

গুরো!

আমার প্রথম গুরু সংসার—অর্থাৎ পিতা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, মাতামহী মাতৃস্বসা, আত্মীয়স্বজন। কেননা, তাঁহাদের ব্যবহারে বুঝিলাম, মায়ামমতা স্বার্থের দাস। স্বার্থ-হানি হইলে পিতা—পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জন দিতে পারেন, ভাই-ভগ্নী—শত্রু হইতে পারে, স্ত্রী-পুত্র—বুকে ছোরা বসাইতে পারে, মাতামহী-মাতৃস্বসা—বিষ উদ্গীরণ করিতে পারেন, আত্মীয়-স্বজন—পদদলিত করিতে পারেন। যদিও সংসারে কোন অভাব অনুভব করি নাই, তথাপি অলক্ষ্যে কে যেন জানাইয়া দিত, "সংসারে সকলেই স্বার্থদাস।"

স্বার্থান্ধগণ কেহই দেখিলেন না যে, তাঁহাদের ব্যবহারে আমার হৃদয় কোন্ উপাদানে গঠিত হইতেছে। আরও বুঝিলাম, রোগে শোকে মানবের পঞ্জরাস্থি ভগ্ন, হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক ও মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হয়। ক্রমে বুঝিলাম, মহতে দরিদ্র দেখিলে উপহাস করে—নিরন্ন বা ব্যাধি-গ্রস্তের কাতর প্রার্থনা পাগলের প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেয়—দুঃখীর দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখিয়া পাপের ফল বলিয়া ঘৃণা করে। হায়!—মনুষ্যহৃদয় দয়া মায়া, সহানুভূতি ও পরদুঃখ-কাতরতার পরিবর্ত্তে কেবল হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং প্রথম শিক্ষায় সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল। তাই বলিতেছি "সংসার প্রথম গুরু।"

দ্বিতীয় গুরু—সাবিত্রী পাহাড়ের পরমহংস শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। যখন সংসারের নিষ্ঠুরতায় ও কালের করাল দংষ্ট্রাঘাতজনিত কাতরতায় ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় লুটিতেছিলাম—দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় ছুটিতেছিলাম, তখন এই মহাত্মার কৃপায় শান্তিলাভ করিলাম ভ্রম ঘুচিল—চমক ভাঙ্গিল। তিনি বেদ, পুরাণ, সংহিতা, দর্শন, গীতা ও উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র সাহায্যে বুঝাইলেন, সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতই জীবের আধ্যাত্মিক

উন্নতির কারণ। জীব সাংসারিক সুখে মুগ্ধ হইয়াই জগন্মাতা ও পরম পিতার চরণ বিস্মৃত হয়। জীবের চৈতন্য সম্পাদন জন্যই মঙ্গলময় জগদীশ্বর কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি হইয়াছে।” আমি এতদিনে জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। স্বল্পায়াসে নিগমের এই নিগূঢ় বাক্য বুঝিতে পারায় তিনি সানন্দে আমাকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া নিগমানন্দ নাম প্রদান করিলেন।

তৃতীয় বা শেষ গুরু আপনি। বিপথে পড়িয়া যখন পরমহংসদেবের উপদেশে পথপ্রদর্শক অনুসন্ধান করিতেছিলাম, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে তখন আপনার চরণ দর্শন হইল। আপনার কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া, পূর্ণ সুখ-শান্তির অধিকারী হইয়াছি। অভূত-পূর্ব্ব বিমল আলোকচ্ছটা দর্শনে নিয়ত শিরায় শিরায় আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মানব সুখের আশায় লালায়িত হইয়া বৃথা সংসারে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আজি আমি গৃহান্নশূন্য হইয়াও অক্ষুণ্ণ মনে জীবনকে ধন্য ও শ্লাঘ্য জ্ঞান করিতেছি। যদি একজনও সংসারপীড়িত ব্যক্তি পূর্ণ সুখশান্তি লাভের যত্ন করে, সেই আশায় গুরূপদিষ্ট সাধনভজনের সুগম পন্থা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতঃ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় আপনার চরণে অর্পিত হইল।

বিদায় গ্রহণ কালে নিবেদন, আপনার চরণসান্নিধ্যে অবস্থান কালে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, "সন্তানের শত অপরাধ পিতার নিকট ক্ষমার্হ" এই ভাবিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করতঃ আশীর্ব্বাদ করুন—যেন অজপার শেষ জপে আপনার জপ সমর্পণ করিতে পারি। আরও প্রার্থনা, যাহারা আমাকে "আমার" বলিয়া জানিয়াছে, তাহাদের লইয়া যেন চরমে আপনার পরমপদে লীন হইতে পারি। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

দেবতায়া দর্শনঞ্চ করুণাবরুণালয়ম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুম্প্রণমাম্যহম্॥

সেবক—শ্রীগুরুচরণ

গ্রন্থকারের নিবেদন

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
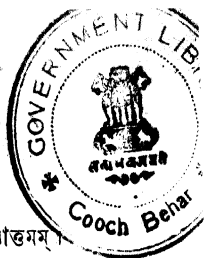
শ্রীমদ্‌গুরু-নারায়ণ-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-স্যন্দমান-মকরন্দপানে আনন্দিত হইয়া, তদীয় কৃপায় অভিনব উদ্যমে "যোগী গুরু" এতদিনে লোকলোচন-গোচর করিলাম।

আমাদের দেশে প্রকৃত যোগশাস্ত্র বা যোগোপদেষ্টা গুরু নাই। পাতঞ্জল দর্শনের যোগসূত্র বা শিব-সংহিতা, গোরক্ষ-সহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি যাহা যোগশাস্ত্র নামে প্রচলিত আছে, তৎপ্রদর্শিত পন্থায় সাধনে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারেন, এমন কেহ আছেন কি? যোগ, তন্ত্র ও স্বরোদয়-শাস্ত্র-সিদ্ধ সাধকের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, পাণ্ডিত্যবলে উক্ত শাস্ত্র বুঝাইবার শক্তি কাহারও নাই। যোগী গুরুও নিতান্ত দুর্ল্লভ। গৃহস্থগণের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি বহুদিন তীর্থ ও পার্ব্বত্য বনভূমিতে বহু সাধুসন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়া বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি, আজকাল যে সকল জটাজূটসমাযুক্ত সন্ন্যাসীর বিরাট্‌মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে হাজারকরা একজন যোগী বা তন্ত্রোক্ত সাধক দুর্ল্লভ। অনেকে পেটের দায়ে অনন্যোপায় হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাদের সাধনে প্রবৃত্তি ত যায়ই না, পরন্তু কতকগুলি ভেল্কি বুজরুকি শিক্ষা করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্তে

বিনা পরিশ্রমে উদর পোষণ করিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে,—"গোত্র হারাইলে কাশ্যপ, আর জাতি হারাইলে বৈষ্ণব"—এখন এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগী গুরু নিতান্ত বিরল। থাকিলেও তাঁহাদের দৌড় প্রাণায়াম পর্য্যন্ত ; তাহাও যে উপযুক্ত শিক্ষায় অনুষ্ঠিত, বিশ্বাস হয় না। আজকাল বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি দুই এক খানি যোগশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বের কৃতিত্ব ব্যতীত সাধন পদ্ধতির কোন সুগম পন্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসাদারগণের বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে পড়িয়া কোন কোন সাধনপ্রয়াসী ব্যক্তি ঐ পুস্তক ক্রয় করেন, পাঠান্তে যখন বুঝিতে পারেন, "চাবি গুরুর হাতে", তখন অর্থনাশে মনস্তাপে শান্তিসুখে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ ঐ সকল পুস্তক প্রদর্শিত প্রাণায়ামাদি করিতে গিয়া কষ্টভোগ ও দেহ নষ্ট করেন। বহু মহাপুরুষ-পরম্পরা প্রকাশিত জ্ঞানগরিমা গণ্ডূষে উদরসাৎ করিতে গেলে পরমার্থ লাভ দূরের কথা, অনর্থ উৎপাদিত হইবে, ধ্রুব সত্য।

সমস্ত সাধনার মূল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। সুখের বিষয় এই, যোগসাধনের আজকাল অনেকেরই প্রবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু প্রবৃত্তি হইলে কি হইবে? উপদেশ, শিক্ষা দেয় কে? গুরু ব্যতীত এই নিগূঢ় পথের প্রদর্শক কে? আজকাল যে সকল ব্যবসাদার গুরু দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ব্যবসার খাতিরে মন্ত্রদান করিয়া বেড়ান, শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার ক্ষমতা সে গুরুদেবের নাই। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইবেন কিরূপে? বরং পৈতৃক গুরুদেব অপেক্ষা অনেক স্থলেই শিষ্যকে জ্ঞানী দেখিতে পাওয়া যায়। আর শাস্ত্রে যে সকল যোগ-পন্থা উক্ত হইয়াছে, তাহা কোন যোগী গুরু হাতে-কলমে

শিখাইয়া না দিলে তাহাতে ফল লাভ করা সুদূরপরাহত। আর এক কথা, কলির জীব স্বল্পায়ু ও দুর্ব্বল। বিশেষতঃ চব্বিশ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও আজকাল অনেকে অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সদ্‌গুরু মিলিলেও অষ্টাঙ্গ-সাধনের কঠোর নিয়ম সংযম ও প্রাণায়ামাদির ন্যায় কায়িক ও মানসিক কঠিন পরিশ্রম এবং অভ্যাসের সুদীর্ঘ সময় কাহারও নাই। এই সব প্রতিবন্ধকবশতঃ কাহারও সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহা পক্ক বিল্বফলে কাকচঞ্চুপুটাঘাতের ন্যায় বৃথা। এই সকল অভাব ও প্রতিবন্ধক দূর করাই আমার এই গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য। আমি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন বৃথা পরিভ্রমণ ও সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করি, পরে জগদ্‌গুরু ভূতভাবন ভবানী-পতির কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ করিয়া তদীয় কৃপায় লুপ্তপ্রায় গুপ্ত যোগ-সাধনের সহজ ও সুখসাধ্য কৌশল-উপায়াদি শিক্ষা করিয়াছি। বহুদিন ধরিয়া সেই সকল কৌশলে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি। তাই আজ ভারতবাসী সাধক-ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

শাস্ত্র অসীম, জ্ঞান অসীম, সাধন অনন্ত। যে সকল সাধন-কৌশল শিক্ষা করিয়াছি, তাহা সমস্ত আলোচনা ও আন্দোলন করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে। আয়ত্তাধীন হইলেও মুদ্রিত করিতে না পারিলে কিরূপে সাধারণের উপকার হইবে? আমার ত "অস্থ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।" মুদ্রিত করিতে মুদ্রার প্রয়োজন। বিশেষতঃ নেতি, ধৌতি, বস্তি, লৌলিকী, কপালভাতি ও গজকারিণী প্রভৃতি হঠযোগাঙ্গ-সাধন গৃহত্যাগী সাধুসন্ন্যাসীরই সাজে। এই হা-অন্ন, যো-অন্ন, বাজারে চাকুরী দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে সময় কুলায় না, সাধনের সময় এবং নিয়ম

পালন হইবে কিরূপে? আর বাঙ্গালীর হঠযোগাদি সাধনের উপযুক্ত শরীর নহে। আরও এক কথা, যোগ সাধনের এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে, যাহা মুখে বলিয়া, হাতে কলমে দেখাইয়া না দিলে লেখনীসাহায্যে বুঝাইতে পারা যায় না। অকারণ সেই সমস্ত গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি বা বাহাদুরী লাভ করা এই পুস্তক-প্রকাশের উদ্দেশ্য নহে। তবে যদি কাহারও ঐরূপ সাধনে প্রবৃত্তি হয় এবং তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হয়েন, পরীক্ষা দ্বারা উপযুক্ত বুঝিতে পারিলে যত্নের সহিত শিখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

কলিকালে দুর্ব্বল, স্বল্পায়ু ও অন্নসংস্থান জন্য অনিয়মিত পরিশ্রমকারী মানবগণের জন্য যোগেশ্বর জগদ্গুরু, মহাদেব সহজ ও সুখসাধ্য লয়যোগের বিধান করিয়াছেন। প্রাণায়ামাদি প্রকৃত যোগ নহে, যোগসাধনের বিশেষ অনুকূল ও সহায়কারী বটে। কিন্তু অনিয়ম ও বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস-কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মস্তকের পীড়াদি নানা রোগ উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া কয়েকটি সহজসাধ্য যোগসাধন-পদ্ধতি এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম, যাহাতে সাধারণে ইহার মধ্যে যে কোন একটী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। কিন্তু লিখিত নিয়ম ও উপদেশমত কার্য্য করা চাই। নিজে ওস্তাদি এবং Principle খাটাইতে গেলে ফল হইবে না। যে কোন একটী ক্রিয়া নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ শরীর সুস্থ ও নীরোগ হইবে, মনে অপার আনন্দ ও শান্তি বোধ করিবেন এবং দেহস্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তির চৈতন্য ও আত্মার মুক্তি হইবে।

যোগসাধন করিতে হইলে উত্তমরূপে দেহতত্ত্ব ও দেহস্থিত চক্রাদি অবগত হইতে হয়, নতুবা সাধনে কোন ফল হয় না। কিন্তু তৎসমুদয়

যথাযথ বর্ণনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সে সুদীর্ঘ সময় ও অজস্র গোলাকৃতি রজতখণ্ড কোথায় পাইব? তবে যে কয়েকটী সাধন কৌশল প্রদর্শিত যইল, সেই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীর যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহা তত্তৎস্থানে যথাযথ লিখিত হইয়াছে; সাধারণের বুঝিবার মত ভাষা ব্যবহার করিতেও ত্রুটী করি নাই। ইহাতেও যদি কাঁহারও কোন বিষয় বুঝিতে গোলযোগ ঘটে, আমার নিকট উপস্থিত হইলে সংশয় অপনোদন করিয়া দিব।

স্বধর্ম্মনিরত পাঠকগণের মধ্যে অনেকে মন্ত্র-জপাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্র জপ করিয়া কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না, তাহার কারণ কি? মন্ত্র-জপ-রহস্য-সাধন ও জপ-সমর্পণ-বিধি ব্যতিরেকে মন্ত্র সিদ্ধি হয় না; সুতরাং জপ-ফল প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বিধিপূর্ব্বক জপ-রহস্যাদি সম্পাদন করিতে না পারিলে ও মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুরচক্রে তাহার ক্রিয়াদি না করিলে কথনই মন্ত্রের চৈতন্য হইবে না; সুতরাং প্রাণহীন দেহের ন্যায় প্রাণহীন মন্ত্র জপ করিলেও কোন ফল হইবে না। ইহা আমার মনগড়া কথা নহে; শাস্ত্রে উক্ত আছে—

চৈতন্যরহিতা মন্ত্রা প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপৈরপি॥

—তন্ত্রসার

অচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র, অচৈতন্য মন্ত্র লক্ষকোটি জপের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবেই দেখুন, মালা-ঝোলা লইয়া শুধু বাহ্যড়াম্বর ও অনু-ষ্ঠান করিলে মন্ত্রজপে ফল পাইবেন কিরূপে? কিন্তু কয়জন গুরু দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যকে মন্ত্র চৈতন্যের উপায়াদি শিক্ষা দিয়া থাকেন? হয়ত গুরু-দেবই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কাজেই শিষ্য বেচারী গুরুদত্ত সেই নীরস শুষ্ক

মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিয়া যে তিমিরে—সেই তিমিরে! তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রের অবস্থা সেই এক প্রকার। আজকাল এই শ্রেণীর গুরুদেবগণ বলিয়া থাকেন, "কলিকালে মানবগণ সাধু ও গুরু মানে না।" কিন্তু সেইটী যে নিজেদের ত্রুটীতে হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করেন না।* কেবল মন্ত্র দিয়া নিয়মিতরূপে বার্ষিকী আদায় করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলে ভক্তি থাকে কিরূপে? বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার, আহার, সাংসারিকতা বা ক্রিয়া কর্ম্মে শিষ্য হইতে গুরুদেবের কোন প্রভেদ নাই। শিষ্যের অজ্ঞানান্ধারকার বিদূরিত করিয়া, সংসারে ত্রিতাপস্বরূপ বিষয়ের বিনাশ করিবার গুরুদেবের নিজেরই এক ক্রান্তি ক্ষমতা নাই, তাঁহার প্রতি প্রীতি, ভক্তি, সম্মান থাকিবে কিরূপে? এই সকল বিবেচনা করিয়া জাপককগণের উপকারার্থে মন্ত্রচৈতন্যের সহজ ও সুগম পন্থা শেষকল্পে লিখিত হইল। সাধকগণ জপ-রহস্য অবগত হইয়া পশ্চাদুক্ত প্রণালীতে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রচৈতন্য হইবে এবং জপে সিদ্ধিলাভ করিবেন।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আমার পুঁথিগত বিদ্যা নহে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া আমি সাফল্য লাভ করিয়াছি, তদীয় আদেশানুসারে তাহারই মধ্যে কয়েকটী সহজ ও সুখসাধ্য পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, নিজে নিজে শাস্ত্র পড়িয়া বা কাহারও ভড়ং-ভাড়ং বচন-রচন দেখিয়া শুনিয়া তদীয় উপদেশে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। আনাড়ী ব্যবসাদারের উপদেশে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে ফললাভের আশা নাই, বরঞ্চ প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। শ্বাসকাসাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া, জন্মের মত সাধনভজনের

* মন্ত্রপ্রদান করিয়া বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রচৈতন্য করাইয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখাইয়া দিতে পারিলে, উন্নতকণ্ঠে বলিতেছি, অতি পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হইবে।

আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে এবং অকালে কালকবলে পতিত বা আজীবন স্বোপার্জ্জিত রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত যোগ-পদ্ধতি কয়টী অতি সহজ ও সুখসাধ্য এবং সিদ্ধ যোগিগণের অনুমোদিত। ইহার মধ্যে যে কোন একটী ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে নীরোগ হইয়া ও তৃপ্তিলাভ করিয়া দিন দিন মুক্তিপথে অগ্রসর হইবেন। তবে যাঁহারা অজ্ঞান-মলিন পৃথিবীতে পূর্ণ জ্ঞানপ্রভাবের বিমল আলোকচ্ছটা আকাঙ্ক্ষা করেন, অচঞ্চল অনন্ত আলোকধার সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী মহা-আলোকময় মহাপুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহাদের মহাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইবার নহে।

প্রথম প্রথম বায়ুধারণা অভ্যাসকালে অক্ষি, কর্ণ, পঞ্জরাস্থি ও শিরোবেদনা অনুভূত হয়। এমন কি শ্বাসকাসের লক্ষণও প্রকাশ পায়। কিন্তু হঠযোগ প্রভৃতিতে ঐরূপ রোগাদির উদ্ভবের কথা বটে, এই গ্রন্থসন্নিবেশিত সাধনে সে আশঙ্কা নাই। অথাপি স্বরকল্পে শরীর সুস্থ নীরোগ ও দীর্ঘজীবী এবং বলিপলিতরহিত কান্তিবিশিষ্ট করিবার কৌশল বর্ণিত হইল। পাঠকগণ! পরীক্ষা করিয়া সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

মানব ভুলভ্রান্তির দাস তাহাতে আমার বিদ্যাবুদ্ধির পুঁজি নাই বলিলেও হয়। সদা-সর্ব্বদা আমার নিকট শিক্ষিত অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে এবং এলাহাবাদ কুম্ভমেলা দর্শনে গমন করিব, এই জন্য তাড়াতাড়ি কাপি লিখিয়াছি, সুতরাং ভুল অবশ্যম্ভাবী। মরালধর্ম্মানুসরণকারী জাপক ও সাধকগণ দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সফলকাম হইবেন এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থকারও সুখী হইবে।

আসাম প্রদেশস্থ গারোহিলের হাজং বস্তির আমার পরম ভক্ত অপত্য-তুল্য শ্রীমান্ সীতারাম সরকার ও শ্রীমান্ মদনমোহন দাস কায়মনোপ্রাণে যেরূপ সেবা ও ব্যয়াদি বহন করিয়া আমার সাধনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার মত বাগ্বিভব আমার নাই। তাহাদের উপকারের প্রত্যুপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। এই পরপিণ্ডভোজী ভিখারীর আজকাল আশীর্ব্বাদ সম্বল; তাই কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, বিরূপাক্ষবক্ষোবিহারিণী দাক্ষায়ণীর কৃপায় উক্ত বাবাজিদ্বয় সুস্থ ও কার্য্যক্ষম শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হউক।

পাতিলদহ পরগণার তহশীল-কর্মচারী আমার প্রিয়ভক্ত শ্রীউমাচরণ সরকার ও তৎপত্নী শ্রীমতী হেমলতা দাসী সর্ব্ববিষয়ে এই গ্রন্থপ্রকাশে যেরূপ যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা নাই। ফলে তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে এ গ্রন্থ প্রকাশ অসম্ভব হইত।

এই পুস্তক প্রকাশের জন্য শিক্ষিত বহু মহাত্মার উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য পাইয়াছি। তাহার মধ্যে হরিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার আশ্রিত-প্রতিপালক, স্বধর্ম্মনিরত, অকপটহৃদয় ও আমার অকারণবন্ধু প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু রায় সারদাপ্রসাদ সিংহ আগাগোড়া যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। হরিপুর নিবাসী উকিল, উদারহৃদয় বাবু ললিতমোহন ঘোষ বি এ, বি এল, প্রবেশিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগসাধনরত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, সংস্কৃত শিক্ষক, মিষ্টভাষী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, পোষ্টমাষ্টার, বিনয়ী বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি শিক্ষিত মহোদয়গণ

স্বতঃ-পরতঃ যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে সর্ব্বমঙ্গলার নিকট তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা করি।

বিদায়গ্রহণ সময়ে পাঠকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই আমার সকল আশা ও পরিশ্রম সফল হইবে। আমি নাম-যশ চাই না, এ বাজারে অখ্যাতিরও অভাব নাই। কিন্তু কিছুতেই আমার ভ্রূক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই, এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিনে একজন সাধকও যদি আমার বর্ণিত ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে লেখনীধারণ সার্থক ও গৃহান্নশূন্য হইয়াও অক্ষুণ্ণ মনে জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব। নিবেদনমিতি।

গারোহিল-যোগাশ্রম
১০ই পৌষ, বড়দিন
১৩১২

ভক্তপদারবিন্দ-ভিক্ষু
দীন—নিগমানন্দ
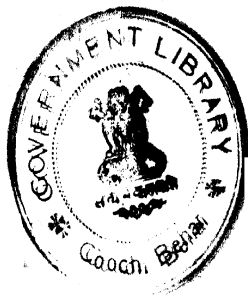
সপ্তম সংস্করণের বক্তব্য

যোগী গুরু পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কালে যোগকল্পের চক্র কয়েকটাতে কিছু সংযোজনা আর স্বরকল্পে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এবার আদ্যোপান্ত যথাদৃষ্ট সংশোধন করা সত্ত্বেও ইচ্ছামত পরিবর্দ্ধন করিতে পারিলাম না। আড়াই হাজার পুস্তক অল্পদিনে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি পুনর্মুদ্রিত করিতে হইল। ধর্ম্মপুস্তকের এইরূপ সমগ্র দেশময় আদর দেখিয়া শিক্ষিতসমাজে ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাইতেছি। ভক্ত, ভাগবত ও ভগবানের জয় হউক। কিমধিকবিস্তরেণ।

সারস্বত মঠ
১০ই পৌষ, বড়দিন
১৩৩৩

ভক্তপদারবিন্দ-ভিক্ষু
দীন—নিগমানন্দ

সূচীপত্র

—❧—

প্রথম অংশ—যোগকল্প

দ্বিতীয় অংশ—সাধন-কল্প

তৃতীয় অংশ—মন্ত্রকল্প

চতুর্থ অংশ—স্বরকল্প

বাণী-আবাহন

নরামরাসুরারাধ্যা বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
মে গতিস্ত্বৎপদাম্বুজং বাগ্দেবীং প্রণমাম্যহম্ ॥

গীত

(ভৈরবী—একতালা)

কুরু করুণা জননি!
সরোজিনি—শ্বেত-সরোজ-বাসিনি!
অমল-ধবল উজল-ভাতি,
শ্রীমুখে জড়িত তড়িত-জ্যোতিঃ,
চাঁচর চিকুরে, চূড়া শিরোপরে, ফুল্লারবিন্দ-লোচনী ॥
শোভিছে কর্ণেতে কনক-কুণ্ডল, সৌদামিনী জিনি করে টলমল,
ঝলসে তাহাতে মাণিক-মণ্ডল, গজমতি মতি হরে;—
সুচারু দ্বিভুজ মৃণাল-গঞ্জিতা,
বীণা-যন্ত্র করে, করে সুশোভিতা,
কত শোভা করে, নখর-নিকরে, প্রভাকর-করে জিনি ॥
চরণে তরুণ-অরুণ-কিরণ, লাজে দ্বিজরাজ লয়েছে শরণ,
হংস 'পরে রাখি যুগল চরণ, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে;—
তোমারি কৃপায় কবি কালিদাস,
বেদবিভাগ ক'রে নাম বেদব্যাস,
পূরাও অভিলাষ, নলিনের ভাষ, নৃত্য-গীতরূপিণী ॥

প্রণমামি পদাম্বুজে অম্বুজবাসিনী.
সুরাসুরনরারাধ্যা বিদ্যা-বিধায়িনী।
আমি হীন দীন-সত্ত্ব,
কি বুঝিব তব তত্ত্ব ?
গীর্ব্বাণগণেশ যার নাহি পান সীমা—
মূঢ়মতি আমি অতি, না জানি মহিমা।

শুন মা প্রাণের উন্মাদনা-আকুলতা—
তোমা বিনা কার কাছে জানাইব ব্যথা ?
বিধির বিচিত্র বিধি,
সাধ্য নাহি আমি রোধি ;
মম গতি যে শ্রীপতি, তাঁহার বিধানে
সৌধরাজি ত্যজি আজি নিবাস শ্মশানে !

নেমিনী চক্রের মত অদৃষ্ট নিয়ত,
কর্ম্মসূত্র ফলে হইতেছে বিঘূর্ণিত ;
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা,
নিশ্চয় ফলিবে তাহা,
সুখদুঃখ সম ভাবি তাহে নাহি খেদ—
চরমে সমান গতি নাহিক প্রভেদ।

শান্তিসুখ নাই মাগো ভবের বিভবে—
প্রকৃত সুখের মুখ দেখিয়াছি এবে।
গায়ে চিতাভস্ম মাখি,
"মা—মা" বলে সদা ডাকি,
নীরব-নিশীথে শুনি অনাহত নাদ—
কতই উপজে মনে অমল আহ্লাদ!

অন্তে যেন পাই আমি শ্রীহরি চরণ,
পার্থিব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন।
খ্যাতি, প্রতিপত্তি, আশা,
প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা,
মায়া, মোহ, দয়া, ধর্ম্ম, দিছি বিসর্জ্জন—
হৃদয় শ্মশান-সম ভীতির কারণ!

মরু-সম এ বিষম আমার হৃদয়—
আশার অঙ্কুর কেন তাহাতে উদয়?
উদাসীন ধর্ম্ম নয়—
দুরাশার অভ্যুদয়,
ধৈর্য্য-বাঁধে রোধিবারে নারি আশা-নদী,
সবেগে হৃদয়-ক্ষেত্রে বহে নিরবধি।

লুপ্তপ্রায় গুপ্তশাস্ত্র করিতে প্রকাশ,
হয়েছে আমার মনে বড় অভিলাষ।
শ্রীগুরুর কৃপাবলে,
সিদ্ধ-যোগিগণ-স্থলে,
যোগ-সাধনের যত সহজ কৌশল,
বহুদিন ঘুরে ঘুরে করেছি সম্বল।

সেই সব সুখসাধ্য সাধন পদ্ধতি,
প্রচার করিতে সাধ শুন মা ভারতি!
কিন্তু কোন গুণ-ভরে,
লেখনী করেতে ধ'রে,
শিবোক্ত শাস্ত্রের কথা করিব প্রচার?
বিদ্যাবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত আমি দুরাচার।

তবে কেন অসম্ভব আশা করি মনে,
খঞ্জের দুরাশা যথা হিমাদ্রি-লঙ্ঘনে?
জম্বুক শম্বুক কবে,
সিংহ-নক্রে বিনাশিবে?
তথাপি হ'তেছি কেন দুরাশার দাস--
অসম্ভব মরুভূমে কমল বিকাশ!

যাহাদের উপকার সাধিবার তরে,
সাধন পদ্ধতি লিখি সানন্দ অন্তরে,
সেই বঙ্গ-ভ্রাতাগণ,
করি পুস্তক পঠন,
কৌতুকে হাসিবে আর দিবে করতালি—
কোন নীচাশয় দিবে সুখে গালাগালি !

নাহি এ ধরায় এক বিন্দু অশ্রুজল,
খল পিশাচেতে পরিপূর্ণ ভূমণ্ডল !
কেহ যাক্‌ অধঃপাতে,
কারো ক্ষতি নাই তাতে,
হিংসুক পাষণ্ড যত পরশ্রী-কাতর,
পাপে পরিপূর্ণ সব বাহির অন্তর !

মদ-গর্ব্বে স্ফীত বক্ষে ভ্রময়ে সংসারে—
দুর্ব্বল দেখিলে সুখে পদাঘাত করে !
দেখি ভবে অবিরত,
দুঃখী তাপী জন কত,
আছে এই বিশ্বমাঝে সংখ্যা নাহি তার ;—
মনোদুঃখে মুহ্যমান মন সবাকার ।

নিরাশায় নিপীড়িত হইয়া জননি,
ডাকি মা কাতরে তোরে মাধব-মোহিনি!
যার পানে মুখ তু'লে,
চাহ তুমি কুতূহলে,
তার কি অভাব মাতঃ, এ ভব-ভবনে?
সাক্ষী তার কালিদাস ভারত গগনে।

তোমার প্রসাদে মহাদস্যু রত্নাকর,
লভিয়া ভাস্বর-জ্ঞান হ'ল কবীশ্বর।
তাই মা তোমারে ডাকি,
হৃদি মাঝে এস দেখি,
চরণে সঁপিয়া মন ধরি মা লেখনী—
বিদ্রূপের ভয়ে ভীত নহে এ পরাণী!

কাতরে করুণা মাতঃ, কর নিজ গুণে,
কৃপাসিন্ধু ফুরা'বে না বিন্দু-বিতরণে।
বঙ্গের গৌরব-রবি,
শ্রীমধুসূদন কবি,
ঘ-য়ে রফলা ঈ দিয়া ঘৃত লিখিয়া সে,
তোমার প্রসাদে কাব্য প্রকাশিল শেষে।

তাই মা ভারতী তোমা ক'রেছি শরণ,
অবশ্য হইবে মম বাসনা পূরণ।
মনে হয় যার যাহা,
সুখেতে বলুক তাহা,
ধৈর্য্য শিক্ষা করিব মা তোর কৃপাবলে—
উপেক্ষা করিব সর্ব্ব বচন কৌশলে।

দেহ দিব্যজ্ঞান দাসে অজ্ঞাননাশিনী,
কুযশ-সুযশে যেন না টলে পরাণী!
সুখ-দুঃখ সম জ্ঞানে,
র'ব স্বকার্য্য সাধনে,
নিত্যনিরঞ্জনে ভাবি নিত্যানন্দ পাব—
সর্ব্ব জীবে ব্রহ্মভাবে সদা নিরখিব।

আর এক কথা মাগো নিবেদি চরণে—
বিরহ-বিধুর মম আত্মীয়-স্বজনে,
দেহ দিব্যজ্ঞান দিয়া,
দিব্যপথ দেখাইয়া,
হতভাগা তরে যেন নাহি পায় ব্যথা—
রেখ মা ভারতী শেষ কিঙ্করের কথা!

সেবকাধম
শ্রীনলিনীকান্ত

প্রথম অংশ

যোগ-কল্প

যোগীগুরু

প্রথম অংশ—যোগরহস্য

গ্রন্থকারের সাধনপদ্ধতি সংগ্রহ

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

ভূতভাবন ভবানীপতির ভবভীতি-ভঞ্জন, ভক্তহৃদিরঞ্জন যুগল চরণ স্মরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিলাম।

বিশ্বপিতা বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বত্র একই নিয়ম, চিরদিন সমান যায় না। আজ যিনি সুধা-ধবলিত সৌধমধ্যে সুখে শয়ন করিয়া চতুর্ব্বিধ রসাস্বাদনে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছেন, কাল তিনি বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য অন্যের দ্বারস্থ। আজ যে পিতা পুত্রের জন্মোৎসবে মুক্তহস্তে অজস্র ধনব্যয় করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতেছেন, কাল তিনি সেই নয়নানন্দদায়ক পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করতঃ শ্মশানে পড়িয়া ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় ধড়ফড় করিতেছেন। আজ যিনি বিবাহ-বাসরে অবগুণ্ঠনবতী বালিকা-বধূর বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবীসুখে বিভোর হইয়া আশার হার গাঁথিতেছেন, কাল তিনি সেই প্রাণসম

প্রিয়তমাকে অপরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী জানিয়া প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত। আজ যিনি পর্য্যঙ্ক'পরে প্রিয় পতির পার্শ্বে বসিয়া প্রেমের তুফানে প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতেছেন, কাল তিনি আলুলায়িতকেশা ছিন্নভিন্ন-মলিনবেশা পাগলিনীপ্রায় মৃতপতির পার্শ্বে পড়িয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছেন। অন্য দেশে অন্য জাতিগণ যে সময় দিগ্বসন পরিধান ও বৃক্ষকোটরে পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিয়া কষায় কন্দমূলফলে ক্ষুন্নিবারণ করিত, সেই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ সরস্বতীতীরে বসিয়া সুললিতস্বরে সামগানে দিগ্‌দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করিতেন। কালে মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইয়া হিন্দুগণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিপুল জ্ঞানগরিমা, আর্য্যবীর্য্য, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন; ভারত-গগন ঘোর অজ্ঞান অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হইল। বীর্য্যৈশ্বর্য্যশালী আর্য্যগণ শেষে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন। কালে মুসলমান রাজত্ব অন্তর্হিত হইয়া বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দু গণ বিকৃতমস্তিষ্ক ও পথহারা হইলেন। যে হিন্দুধর্ম্ম কত যুগযুগান্তর হইতে বিমল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আসিতেছে, কত অতীত কাল হইতে এই ধর্ম্মের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহস্য উদ্ভেদ হইতেছে, কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত হিন্দুগণকে বর্ত্তমান যুগের সভ্য শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিকৃত-মস্তিষ্ক ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাচ্ছীল্য করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই বর্ত্তমান যুগে, রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে অশেষ অত্যাচার সহ্য করিয়াও সজীব রহিয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "চিরদিন সমান যায় না"—স্রোত ফিরিয়াছে। এখন হিন্দুগণের হৃদয়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতালিপ্সা জাগিয়া উঠিয়াছে।

হিন্দুগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, এই অতি বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিরাজ্যের সীমা কোথায়? হিন্দুধর্ম্ম গভীর, সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানসম্মত, দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান অজ্ঞান হইয়া যাইতেছে। দিন দিন হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ উন্নতি বুঝা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই ধর্ম্মের অমল ধবল কৌমুদীতে সমগ্র দেশের সমগ্র মানব, সমগ্র জাতি উদ্ভাসিত ও প্রফুল্লিত হইবে। আজকাল হিন্দুগন্তান হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, হিন্দুধর্ম্ম মানেন, হিন্দুমতে উপাসনা করেন। স্কুলকলেজের ছাত্র হইতে যুবক, প্রৌঢ় অনেকেরই সাধনভজনে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে কেহই সাধন বিষয়ে প্রকৃত পথ দেখিতে পান না। অস্মদ্দেশীয় প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণ সাধনের যেরূপ কঠিন বাঁধন ব্যক্ত করেন, সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, শুনিয়াই সে আশায় জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হয়। ধর্ম্মকর্ম্মের যেরূপ লম্বা চওড়া পাতনামা প্রস্তুত করেন, আজীবন কষ্টোপার্জ্জিত অর্থব্যয় করিয়াও তাহা সম্পাদন করা অনেকের পক্ষে সুকঠিন। ধর্ম্ম করিতে হইলে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, ধনরত্নে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, ঘরবাড়ী ছাড়িতে হইবে, অনাহারে দেহ শুষ্ক করিতে হইবে, সং সাজিয়া বৃক্ষতল আশ্রয়ে শীতবাত সহ্য করিতে হইবে, নতুবা ভগবানের কৃপা হইবে না! ধর্ম্মে যে এতটা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, বড়ই আশ্চর্য্য কথা! আমি জানি, সুখেরই জন্য ধর্ম্মাচরণ শাস্ত্রেও এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়—

সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বে হি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥

—দক্ষসংহিতা

তবেই দেখুন, ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যই সুখ লাভ। অনাহার, অর্থব্যয়

করিয়া কায়িক ও মানসিক কষ্ট ভোগ অজ্ঞানতার পরিচায়ক। দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবেই গৃহে প্রচুর অন্ন থাকিতে উপবাস করিয়া কাল কাটাইতে হয়। আমাদের অসীম শাস্ত্র, অনন্ত সাধনকৌশল। আমরা বৎসরের মধ্যে ভাদ্রমাসে একদিন শাস্ত্রগুলি রৌদ্রে দেই, পরে গাঁঠরী বাঁধিয়া শুষ্কমুখে পরের দিকে চাহিয়া থাকি; কিম্বা একটা বিকৃত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করি, নয় কলিকালের স্কন্ধে দোষের বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। পাঠক! আমি কিরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া, শেষে সর্ব্বমঙ্গলময় সত্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দ সদাশিবের অনুগ্রহে সদ্‌গুরু লাভ করি, তাহা আপনাদের না জানাইয়া প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

ত্রয়োবিংশবর্ষ বয়সে ফুল্ল প্রাণের সমস্ত সুখশান্তি; আশাভরসা, উদ্যম ও অধ্যবসায় ভাদ্রের ভরা ভৈরবনদতীরস্থ কদম্বতলে ভস্মীভূত করত স্মৃতির জ্বলন্ত চিন্তা বুকে লইয়া বাটী হইতে বাহির হই। পরে কত নগর গ্রাম, পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া সুচারু কারুকার্য্যখচিত সুধাধবলিত সুদৃশ্য সৌধরাজি নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু প্রাণের আগুন নিভিল না। কত নদ, নদী, হ্রদাদির উত্তাল তরঙ্গসমাকুল, কলিজা-কম্পিতকারী কলকল নাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু কালের করাল দংষ্ট্রাঘাতজনিত কাতরতা কমিল না। কত পর্ব্বত, উপত্যকা অধিত্যকা আরোহণ করিয়া, বিশ্বপাতা বিধাতার বিশ্বসৃষ্টিকৌশলের বিচিত্র ব্যাপারাবলী অবলোকন করিলাম, কিন্তু জীবনের জ্বালা জুড়াইল না। কত শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমে অপূর্ব্ব প্রকৃতি পদ্ধতি ও বনকুসুমের সুদৃশ্য সুন্দর সুষমা সন্দর্শন করিলাম, কিন্তু অন্তরজ্বালা অন্তর্হিত হইল না। বহু দিনান্তে আদ্য, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা, বিন্ধ্যাদ্রিনিলয়া মহামায়ার কৃপায় সাবিত্রী পাহাড়ে সাধকাগ্রগণ্য পরমহংস শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত

হইল। পরমজ্ঞানী পরমহংসদেবের উপদেশে জীবের জন্ম ও জন্মান্তর রহস্য, গত্যাগতি, কর্ম্মফলভোগ, মায়াদি নিগমের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়ার মোহ দূরীভূত হইল। পার্থিব পদার্থের অসারতা বুঝিলাম, হৃদয়নিকুঞ্জে কোকিলা তখন তান ধরিল—কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হইল। মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, মর জগতে আর মরণ ময়ণের অভিনয় করিতে ফিরিব না। আমি কার? কে আমার? কেন বৃথা ক্রন্দনের রোল? একাকী আসিয়াছি; একাকী যাইব। সাধ করিয়া কেন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হই? হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে শাস্ত্র-বাক্য ধ্বনিত হইল,—

পিতা কস্য মাতা কস্য কস্য ভ্রাতা সহোদরাঃ।
কায়াপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥

মায়ামোহের আবরণ অনেকটা অপসারিত হইল বটে; কিন্তু প্রাণে একটা প্রবল পিপাসা জাগিয়া উঠিল; স্থির করিলাম, কোনও একটা সাধক সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হইয়া একটী সুখসাধ্য সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া লীলাময়ের বিচিত্র লীলার মধুর স্বাদ আস্বাদন করিতে করিতে জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিব। এই ভাবিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। বহু সাধু-সন্ন্যাসী অনুসরণ করিলাম। কেহ ধূনীর ছাইকে চিনি করিতে শিখাইল, কেহ তপ্ততৈলে হাত দিবার কৌশল দেখাইল, কেহ কাপড়ে আগুন বাঁধিবার পন্থা প্রদর্শন করিল, কিন্তু আমার প্রাণের প্রবল পিপাসা পূর্ণ হইল না। একজন প্রখ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধকের সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিলাম। কিছুদিন পরে তিনি এক অস্বাভাবিক দ্রব্য সংগ্রহের আদেশ করিলেন। "শনি মঙ্গলবারে বজ্রাহত গর্ভবতী চণ্ডাল রমণীর উদরস্থ মৃত সন্তানের উপরি আসন ভিন্ন তন্ত্রোক্ত সাধনে সিদ্ধিলাভ

সুকঠিন।" এই কথা শুনিয়াই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। যাঁহারা যোগী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা নেতি ধৌতি প্রভৃতি এরূপ কঠিন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, আমার বংশের মধ্যে কেহ তদভ্যাসে সক্ষম হইবে না। বৈরাগী বাবাজীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলিলেন, "বিল্বফলের ন্যায় মস্তক সুমুণ্ড করিয়া সুদীর্ঘ শিখা রাখ, গলায় মালার পিত্তলের আংটায় ঝুলি ঝোলাইয়া, কাঠের মালায় গুরুদত্ত মন্ত্র জপ কর—নিয়মিতরূপে হরিবাসর ও প্রত্যহ কিঞ্চিৎ গোপীমৃত্তিকা গাত্রে লেপন না করিলে গোপীবল্লভের কৃপা হইবে না।" আর এক সম্প্রদায় আধুনিক বৈরাগী শাস্ত্রের কতকগুলি বাঙ্গালা পয়ার আওড়াইয়া নিজেদের অনুকূলে কদর্থ করিয়া বুঝাইলেন, "শক্তি ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই" এবং মাতামহীর সমবয়স্কা একটী মাতাজী গ্রহণের ব্যবস্থা দিলেন। এই হেতুবাদে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডবাসী পরোপকারপরায়ণ একটি বাবাজী তদীয় অনাথা কন্যাটীকে নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; আমি অকৃতজ্ঞ, এহেন উদার-হৃদয়, নিঃস্বার্থ পরোপকারীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া পলায়ন করি। পাঞ্জাব প্রদেশস্থ অমৃতসহরের উদাসীন সম্প্রদায় বলিলেন, "পৈতাদি পরিত্যাগ করিয়া ছত্রিশ জাতির অন্নভক্ষণ করিয়া বেড়াইলেই ব্রহ্মভাব স্ফুরিত হইবে।" সন্ন্যাসিগণ অখণ্ড বিভূতিলেপন, সুদীর্ঘ জটাজূটধারণ, চিমটাগ্রহণ ও হরিতানন্দে দমের কৌশল শিক্ষা দিলেন। নাগা সম্প্রদায়, নেংটা হইয়া কোমরে লোহার জিঞ্জির ধারণ ও অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া ফলমূল ভক্ষণের ব্যবস্থা দান করিলেন। সাবিত্রী পাহাড়ের পূজ্যপাদ পরমহংসদেব পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পাকা করিয়া দিয়াছিলেন, তাই এইসব ফক্কড়ের ফাঁকা কথায় মন বাঁকা হইল না। ইহাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া জগদ্গুরু যোগেশ্বরের চরণ স্মরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে ঘুরিতে লাগিলাম।

পশ্চিম প্রদেশে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া কামাখ্যামায়ীর চরণদর্শনাভিলাষে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীর সমভিব্যাহারে আসাম বিভাগে আসিলাম। আসাম আসিয়া পরশুরামতীর্থ-দর্শনে বাসনা হইল। গৌহাটী হইতে ষ্টিমারে ডিব্রুগড় আসিয়া তথা হইতে বাষ্পীয় শকটারোহণে সদিয়া পহুঁছিলাম। সদিয়া হইতে প্রায় ২০।২৫ জন সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল বন-ভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য টীলা উল্লঙ্ঘন করিয়া বহুকষ্টে পরশুরাম তীর্থে উপনীত হইলাম। তীর্থটী নয়ন ও মনপ্রাণ প্রফুল্লতাপ্রদ স্বভাবসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। শাস্ত্রে কথিত আছে, ভার্গব সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণান্তে এই ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিয়া মাতৃ-হত্যাজনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পান এবং হস্তসংলগ্ন পরশু স্খলিত হয়। সেই অবধি এই স্থানের নাম "পরশুরাম তীর্থ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এই ব্রহ্মকুণ্ড হইতেই ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু আজকাল ব্রহ্মকুণ্ডের সহিত উক্ত নদের কোনও সংস্রব নাই। ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া আমিও সকলের ন্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান পূজাদি করিয়া পরিশ্রম সার্থক ও জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলাম।

যে দিবস ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হই, তাহার দুই দিন পরে আমি প্রবল জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইলাম। রাস্তায় কয়েক দিন অনিয়মিত পরিশ্রমে পূর্ব্ব হইতেই কাতর ছিলাম। তাহার উপর জ্বর ও আমাশয়ে চারি পাঁচ দিনেই উত্থানশক্তি তিরোহিত হইল। সঙ্গীয় সন্ন্যাসিগণ প্রত্যা-গমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম; আমার এক পা চলিবার শক্তি নাই, কিরূপে সেই দুর্গম বন-ভূমি ও পর্ব্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিব? সঙ্গিগণকে দুই চারি দিন অপেক্ষা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুনয় বিনয় করিলাম; কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। তাঁহারা একদিন রাত্রে আমার অজ্ঞাতসারে সাধুজনোচিত সহৃদয়তা দেখাইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি একাকী সেই জনমানবশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে বিষম বিপদ

জ্ঞান করিলাম। নাতিদূরে অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির একটী ক্ষুদ্র বাস্ত ছিল। আমি নিরুপায় হইয়া তাহাদের নিকট কাতরে স্থান ভিক্ষা চাহিলাম। তাহারা সাধু ব্রাহ্মণ মানে না, কিন্তু আমার নবীন বয়স, কাতর শরীর দেখিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক—সাদরে স্থানদান করিল। নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন ভাষা—কাজেই প্রথম প্রথম জড়ের মত থাকিতে বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহাদের ভাষা শিখিয়া লইলাম—ক্রমে তাহাদের সহিত সম্ভাব সংস্থাপিত হইল। তাহারা সেবকের ন্যায় আমার সেবা করিতে লাগিল। আমি তাহাদের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আশাতীত যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা লাভ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হইতে কিঞ্চিদধিক একমাস অতিবাহিত হইল। আমি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় ব্রহ্মকুণ্ডে আসিলাম; কিন্তু সেখানে আসিয়া জানিলাম, আগামী কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে সদিয়া যাইবার সঙ্গী পাওয়া যাইবে না। সেই শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি একাকী অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব আশ্রয়দাতার শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ছয় সাত মাসের জন্য স্থান দিতে স্বীকৃত হইল। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থান ভারতবর্ষের অন্তর্গত বা বৃটিশ শাসনাধীন নহে।

সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপাতা বিধাতার চরণ ভরসা পূর্ব্বক, "জব জৈসা—তব তৈসা" ভাবিয়া সেই সব অশিক্ষিত অসভ্যদিগের সঙ্গে একরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। তাহাদের উদারস্বভাব, সরলপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার, সহানুভূতি, আতিথেয়তা প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ দেখিয়াছি, বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী ভারতবাসীর মধ্যে কুত্রাপি তাহা দৃষ্ট হয় না। কোনও দেশের কোনও জাতির মধ্যে এরূপ ভদ্রতা ও মনুষ্যত্ব এ দুর্দ্দিনে মিলিবে না। ইহাদিগকে আমরা অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া

ঘৃণা করি, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব মরজগতে দেখিতে চাও, তবে এই অসভ্য ব্যতীত অন্য কুত্রাপি মিলিবে না। আর আমরা যদি মানুষ বলিয়া পরিচিত হই, তবে ইহারা দেবতা। হায়! কি কুক্ষণেই আমরা সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিলাম। একজন সভ্য-শিক্ষিত বাবুর বাটীতে দাস-দাসী ও কুকুর-বিড়ালে অন্ন খাইয়া ফুরাইতে পারে না, কিন্তু বাবু দেশের কি গ্রামের নিরন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা দূরে থাকুক, তদীয় ভ্রাতা বাটীর পার্শ্বে বাস করিয়া, সারাদিন অনাহারে ঘুরিয়া, অন্নসংগ্রহে অসমর্থ হইয়া বেলাশেষে শুষ্কমুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, বাবু সেদিকে দৃক্‌পাত করেন কি? ক্ষুধাতুর অতিথিকে একমুঠা অন্ন দান করা আমরা অপব্যয় মনে করি। বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় পথিককে এক রাত্রির জন্য স্থান দিতে কুণ্ঠিত হই। ইহাতেও যদি আমরা সভ্য-শিক্ষিত ও মানুষ হই, তবে অভদ্র পাষণ্ড পিশাচ কাহারা? জামাজোড়া পরিয়া, ঘড়ি ছড়ি লইয়া, টেরি বাগাইয়া গাড়ী হাঁকাইলে সভ্য হয় না। সভা করিয়া দুই চারিটী ইংরাজী বোল ছড়াইলেই তাহাদের শিক্ষিত বলা যায় না। হায়! কি অশুভক্ষণেই ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল—আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর অধম হইয়াছি। তাই নিজের অবস্থা নিজে বুঝিতে না পারিয়া শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়াছি। সেই অসভ্য ও অশিক্ষিতগণের মধ্যে যে ভদ্রতা ও মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি, এ জীবনে বুঝি তাহা আর ভুলিতে পারিব না। জগন্মাতা জগদম্বার নিকট কাতরে প্রার্থনা করি, আমার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণের ঘরে ঘরে সেইরূপ অসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হউক।

এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি করিতে করিতে ক্রমেই সাধারণের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য বস্তির ব্যক্তিগণও আমার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। আমারও অনেকদিন ধরিয়া একস্থানে অবস্থান

কিছু কষ্টকর বোধ হওয়ায় নূতন নূতন বাস্তুতে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে ব্রহ্মকুণ্ডের প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে আসিয়া পড়িলাম। এইসকল স্থানে সমতল ভূমি নাই, কেবল স্তরে স্তরে পর্ব্বতশ্রেণী সজ্জিত, পর্ব্বতের পাদদেশে আট দশ ঘর লইয়া এক একটী ক্ষুদ্র পল্লী। আমি খাই, নিদ্রা যাই, কোনদিন বা সাহস করিয়া পাহাড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে যাই। একদিন বৈকালে ঐরূপ ভ্রমণে বাহির হইলাম। বর্ষাকাল, ভাবী বৃষ্টির আশঙ্কায় তালি-দেওয়া একটী ছিন্ন ছত্র সংগ্রপূর্ব্বক অনেক বনজঙ্গল, টীলা অতিক্রম করিয়া একটী নূতন স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানটী পর্ব্বতের এক নিভৃত সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ। সেখানে জনমানবের প্রসঙ্গও নাই। কেবল পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঝরণা, ঝরণার কোলে নীলিম বনভূম; বনভূমির কোলে শ্বেত-পীত লোহিত কুসুমগুচ্ছ, কুসুমের কোলে সুগন্ধ আর শোভা। স্থানটী নয়ন-মন-তৃপ্তিকর দেখিয়া অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া উপবেশন করিলাম। বসিয়া স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টিরচনাকৌশল, প্রকৃতির বিচিত্র গতি প্রভৃতি আন্দোলন-আলোচনা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ নদীতরঙ্গের ন্যায় এক একটী করিয়া কত রকমের চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইল। কত দেশের কথা, কত লোকের কথা, তাহাদের আচারব্যবহার, প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার কথা, সর্ব্বশেষে নিজ জন্মভূমির কথা মনে পড়িল। সেই বাল্যকাল, পিতামাতা, তাঁহাদের আদর-মাখান কথা, ভাই-ভগ্নির আবদার, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ, বাল্যবন্ধুর সরল প্রাণের অকপট ভালবাসা, প্রণয়িনীর প্রাণমাতান কথা—এইসকল বিষয় মনে হইবামাত্র প্রাণের ভিতর একটা প্রবল ঢেউ উঠিল। হৃদয়ের বাঁধনগুলা ঢিলা হইয়া গেল, বুকের ভিতর ঢেঁকীর 'পাড়' পড়িতে লাগিল, চক্ষু দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিল, মুহূর্ত্তে পরমহংসদেবের উপদেশবাক্য তৃণের ন্যায় পূর্ব্ব স্মৃতির খরস্রোতে কোথায়

ভাসিয়া গেল—দর্শন, বিজ্ঞান, গীতা, পুরাণাদির শাস্ত্রজ্ঞান রসাতলে গেল—শেষে আত্মবিস্মৃত হইলাম।

কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না, যখন পূর্ব্বজ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, তখন দেখি, ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় ময়ূখমালা উপসংহৃত করিয়া অস্তাচল শিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যা নব বালিকাবধূর ন্যায় অন্ধকার-অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া দেখা দিয়াছেন। পূর্ব্বেই পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে, কচিৎ দুই একটা পাখী শাখিশাখে বসিয়া সুললিত স্বরে কর্ণকুহরে পীযূষধারা ঢালিয়া দিতেছে। মহামায়ার মায়ামোহের প্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম; ভাবিলাম, "আমি যা তাই আছি। একটী তরঙ্গাঘাতেই যখন হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলা এলাইয়া পড়িল, তখন শাস্ত্রাদি জ্ঞানের গরিমা বৃথা।" যাহা হউক, অধিক ভাবিবার অবসর কৈ? বস্তুতে ফিরিতে হইবে। ভীতচকিত চিত্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া বুঝিতে পারিলাম, পথ হারাইয়া বিপথে আসিয়াছি। তখন বনের ভিতর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রাণের ভয়ে আকুলিবিকুলি করিয়া বাহিরে বাহির হইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম বৃথা হইল। যেদিকে যাই, কেবল অসীম জঙ্গল ও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। হতাশ্বাস হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িলাম। শরীর হইতে ঘাম ছুটিতে লাগিল। এখন উপায়?—এই নিবিড় অন্ধকারে দুর্ভেদ্য বনভূমি অতিক্রম করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। পর্ব্বতের কোন্ পার্শ্বে বস্তি আছে, তাহা আদৌ ঠিক নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বস্তির অনুসন্ধান বৃথা; বরং এরূপভাবে নিরর্থক ভ্রমণ করিতে করিতে হয়ত ব্যাঘ্রভল্লুকের করাল দংষ্ট্রাঘাতে ভবলীলা সংবরণ করিতে হইবে; নয় বন্যহস্তিযূথের পদদলিত হইতে হইবে। অকারণ বস্তির অনুসন্ধানে কষ্টভোগ করি কেন? এই স্থানেই অবস্থিতি করি, যাহা হয়

হউক। বিপদ চিন্তা ভীতির কারণ, কিন্তু বিপদে পতিত হইলে আপনা হইতেই সাহস সঞ্চার হয়। একাকী সেই ভয়ানক বনভূমিতে বসিয়া প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কখনও মনে হইতে লাগিল, ঐ বুঝি করালবদন বিস্তার করিয়া হিংস্র জন্তু গ্রাস করিতে আসিতেছে। কখনও মনে হইতে লাগিল, ভীমদর্শন ভূত প্রেত পিশাচগণ বিকট দন্ত বাহির করিয়া অট্ট হাস্যে বন ভূমি কম্পিত করিতেছে। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, এরূপ যন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা বুঝি মৃত্যু হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল, অবশেষে সাহস সঞ্চার হইল, নানারূপে মনকে দৃঢ় করিতে লাগিলাম। শাস্ত্রকারগণের উপদেশ মনে পড়িল—

মৃত্যু র্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।২৬

যখন একদিন মৃত্যু নিশ্চয়ই, তখন সেই মৃত্যুর জন্য এত অধীর হইতেছি কেন?

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥
- গীতা, ২।২৭

পূজনীয় পরমহংসদেবের প্রাণস্পর্শী বাক্যও মনে হইল,—

"নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিবেদনা।"

আপনা আপনি মৃত্যুভীতি অনেকটা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা নিতান্ত কাপুরুষের পরিচায়ক। বৃক্ষোপরি অধিরোহণ করিলে হিংস্র প্রাণীর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু গাছে উঠিবার উপায় কি? আমি যে বৃক্ষ অধি-

রোহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। পল্লীগ্রামে জন্ম হইলেও সময়ে সে কৌশল শিক্ষা করি নাই। তথাপি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নিকটে একটা প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য বৃক্ষের শাখা প্রায় ভূমি-সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতেছিল। সামান্য চেষ্টায় শাখার উপর উঠিয়া কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে শাখা বাহিয়া তাহার উৎপত্তিস্থানে আসিলাম। অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য গহ্বর। যেখানে শাখাটী শেষ হইয়াছে, ঠিক তাহারই পার্শ্ব দিয়া গুঁড়ির ভিতর প্রকাণ্ড গর্ত্ত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম গহ্বরের ভিতর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ; কেবলমাত্র একজন মনুষ্য অক্লেশে বসিয়া থাকিতে পারে এমন স্থান আছে। আমি সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে কোটরে নামিলাম। কোনও ভয়ের কারণ নাই দেখিয়া তলায় উপবিষ্ট হইলাম এবং ছাতাটী খুলিয়া গহ্বরের মুখ সমাচ্ছাদিত করিলাম। কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া অপার করুণা-নিলয় জগৎ-পিতা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। কত সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু কালরাত্রি যেন আর যাইতে চাহে না। বহুক্ষণ পরে রাত্রি প্রভাতের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। বন্যকুক্কুট ও অন্যান্য দুই একটী পাখী ডাকিতে লাগিল। হৃদয় প্রফুল্ল হইল। এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম ভাবিয়া মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও মৃত্যুচিন্তায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হওয়ায় ও উষাকালের মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ শরীরে লাগায় অত্যন্ত নিদ্রার আবেশ হইল। সেইরূপ ভাবে বসিয়াই বৃক্ষগাত্রে ঠেস্ দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, বন-ভূমি আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ছাতাটী বন্ধ করিয়া ভয়ে ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখি, আমি যে বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছি, তাহার তলদেশে শুষ্ক বৃক্ষপত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া একটী মনুষ্যমূর্ত্তি উপবিষ্ট আছেন। রাত্রিশেষে সহসা এই

নিবিড় জঙ্গলে মানুষ আসিল কোথা হইতে? উনিও কি আমার ন্যায় বিপদাপন্ন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। চিন্তানুরূপ ভূত-প্রেতাদির কল্পনাও একবার মনে উঠিল। শেষে দুর্গানাম স্মরণ পূর্ব্বক সাহসে নির্ভর করিয়া কোটর হইতে বহির্গত হইলাম। এবং পূর্ব্বের বৃক্ষশাখা দিয়া অবতরণ করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সহসা বৃক্ষ হইতে আমাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া তিনি ভীত, চকিত কি বিস্মিত হইলেন না। এমন কি, মুখ তুলিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। দেখিলাম, মস্তক অবনত করিয়া আপন মনে গাঁজা ডলিতেছেন। কৌপীন ভিন্ন সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। তদীয় পার্শ্বে একটী বৃহৎ চিম্‌টা এবং একটা দীর্ঘলাঙ্গুল কলিকা পতিত রহিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে তাঁহাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া অনুমান করিলাম। কিন্তু এই পার্ব্বতীয় বন-ভূমে সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে, তাহা ত একদিনও কাহারও নিকট শুনি নাই। যাহা হউক, কোনও কথা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। নিকটে উপবিষ্ট হইলাম। তাঁহার গাঁজা প্রস্তুত হইলে কলিকায় সাজিয়া অগ্নি উত্তোলন করতঃ বিধিমতে দম লাগাইলেন এবং আমাকে কলিকা দেওয়ার জন্য হাত বাড়াইলেন। যদিও আমার গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না, তথাপি ভয়ে ভয়ে কলিকা গ্রহণান্তর দুই এক টান্ দিয়া প্রত্যর্পণ করিলাম। তিনি পুনরায় দম দিয়া অগ্নি ফেলিয়া দিলেন, ভূমি হইতে চিম্‌টা উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং হস্তসঙ্কেতে আমাকে তদীয় অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাবিলাম, "কোথায় যাইতেছি? এ ব্যক্তি কে? ইহার মনের উদ্দেশ্য কি? আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, পরিচয় লইলেন না, অথচ সঙ্গে যাইতে

আদেশ করিলেন, ইহার কারণ কি ?" একবার বঙ্কিমবাবুর "কপাল-কুণ্ডলার" কাপালিকের কথা মনে পড়িল। অমনি বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি কাল-বারিণী কালবরণী কালীর চরণ ভরসা করিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। তিনি গুল্মলতা-কণ্টকাদি উপেক্ষা করিয়া দানবের ন্যায় গমন করিতেছেন। গাঁজার নেশায় আমি চক্ষুতে সরিষা ফুল দেখিতেছি, লজ্জাবতীর কাঁটায় পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। তথাপি যথাসাধ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহার পশ্চাৎ গমনে ত্রুটী হইতেছে না। বলা বাহুল্য, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

কিছুক্ষণ এইরূপে সেই নিবিড় বন-ভূমি অতিক্রম করিয়া একটী টীলার নিকট আসিলাম। এই স্থানটী স্বভাবসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; একদিকে টীলার উন্নতশীর্ষ বীরের ন্যায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অন্য তিন দিকে দুর্ভেদ্য নীলিম বন-ভূমি। মধ্যে খানিকটা স্থান পরিষ্কার, বৃক্ষাদিশূন্য; একটী ক্ষুদ্র ঝরণা টীলার পার্শ্ব দিয়া সবেগে সুমধুর শব্দ করিতে করিতে গমন করিয়াছে। এই স্থানে আসিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। কি বিরাট্ মূর্ত্তি!—তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত মাংসল বাহুদ্বয়, রক্তাভ অধরোষ্ঠ, ভ্রমরকৃষ্ণ ঝুমরো ঝুমরো দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন, সর্ব্বশরীরে সরলতা মাখা, ব্রহ্মতেজ শরীর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত। এ জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মধুর মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত একটীও নয়নগোচর হয় নাই। কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রাণাধারে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইল; কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া গেলাম। আমার অজ্ঞাতসারে দেহ আপনাআপনি তদীয় চরণে লুণ্ঠিত হইল।

তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া উঠাইয়া ধীর গম্ভীর মধুর বাক্যে বলিলেন, "বাবা! সহসা রাত্রি শেষে আমাকে বৃক্ষতলে দেখিয়া ও তোমার পরিচয়াদি কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সঙ্গে আসিতে আদেশ করিয়াছি, ইহাতে তুমি কিছু ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ? কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই—তুমি কে? কি অভিপ্রায়ে ঘুরিতেছ? আজি বৃক্ষকোটরেই বা কেন অবস্থিতি করিতেছ?—তাহা আমি অবগত হইয়াছিলাম; সেই জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। নিশীথ সময় তোমার বিষয় অবগত হইয়া তোমাকে এখানে আনিবার জন্যই ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

আমি অবাক্!—ইনি আমার বিষয় পূর্ব্বেই কিরূপে অবগত হইলেন? তাঁহাকে সিদ্ধমহাপুরুষ বলিয়া আমার ধারণা জন্মিল। গত রাত্রের দারুণ কষ্ট বিস্মৃত হইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। আমি তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম।

তিনি মিষ্ট বাক্যে আমাকে আশ্বস্ত করিয়া আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ও এই জন্মের অনেক গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিলেন এবং যোগশিক্ষা ও সাধন-কৌশল দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। গতরাত্রির বিপদ সম্পদের কারণ বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। এতদিনে মনো-রথ সিদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া হৃদয় প্রফুল্ল ও উল্লাসিত হইয়া উঠিল।

পরে সেই সিদ্ধমহাপুরুষ টীলার সন্নিহিত হইয়া কৌশলে একখানা বৃহ-দায়তন প্রস্তর অপসারিত করিলেন। আশ্চর্য্য দৃশ্য! প্রকাণ্ড গহ্বর!! আমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, গহ্বরটী একখানা ক্ষুদ্র গৃহের ন্যায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। তিনি আমায় কতকগুলি হস্তলিখিত যোগ ও স্বরোদয় শাস্ত্র পাঠ করিতে দিলেন। আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া সিদ্ধমহা-পুরুষের সহিত তদীয় আশ্রমে সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

প্রত্যহ তিনি আমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে সস্নেহে যোগ ও স্বরশাস্ত্রের গূঢ় কূটস্থানের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং মৌখিক উপদেশ ও সাধনের সহজ ও সুখসাধ্য কৌশল দেখাইয়া দিলেন। আমি সেথায় কিঞ্চিদধিক তিন মাস অবস্থিতি করতঃ সিদ্ধমনোরথ হইয়া কৃতজ্ঞ ও ভক্তিগদ্গদচিত্তে তদীয় চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রফুল্লচিত্তে আমাকে পূর্ব্বের পার্ব্বত্য বস্তিতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

পূর্ব্বপরিচিত আশ্রয়দাতাগণ সহসা আমাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইল। তাহারা তিন চারিদিন পার্ব্বত্য বনভূমে আমার অনুসন্ধান করিয়াছিল। কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া হিংস্র জন্তুর কবলিত হইয়াছি সিদ্ধান্ত করিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ও মনোবেদনা পাইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলাম এবং দুই এক দিন করিয়া তাহাদের বাটীতে বাস করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলাম। পরে সেখান হইতে তীর্থযাত্রিগণের সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলাম।

সিদ্ধমহাপুরুষপ্রদর্শিত পন্থায় ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আমি শাস্ত্রোক্ত সাধনার সুফল সম্বন্ধে বিশেষ সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। তাই আজ স্বদেশী সাধনপথানুসন্ধিৎসু ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থে কয়েকটী সদ্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সহজ ও সুখসাধ্য সাধনপদ্ধতি সন্নিবেশিত করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সাধকগণকে যাহাতে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে না হয়, আমার তাহাই একান্ত ইচ্ছা। এক্ষণে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। যদি কাহারও কোন বিষয় বুঝিতে গোল কি সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমাকে পত্র লিখিলে বা নিকটে উপস্থিত হইলে সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার ঠিকানা ঠিক নাই। "কার্য্যাধ্যক্ষ—সারস্বত-মঠ, পোঃ সারস্বত-মঠ, যোরহাট আসাম"—এই ঠিকানায় রিপ্লাইকার্ড লিখিয়া আমার অবস্থিতির স্থান জানিয়া লইবেন।

যোগের শ্রেষ্ঠতা

সর্ব্বসাধনার মূল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। শাস্ত্রে কথিত আছে যে বেদব্যাসপুত্র শুকদেব পূর্ব্বজন্মে কোন বৃক্ষোপরি শাখান্তরালে থাকিয়া শিবমুখনির্গত যোগোপদেশ শ্রবণ করতঃ পক্ষিযোনি হইতে উদ্ধার হইয়া পরজন্মে পরম যোগী হইয়াছিলেন। যোগ শ্রবণে যখন এত ফল, তখন যোগ সাধন করিলে ব্রহ্মানন্দ লাভ ও সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যোগ বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই যে, অবিদ্যা-বিমোহিত আত্মা জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ের অধীন হইয়াছেন। সেই তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভের উপায় যোগ। যোগাভ্যাস ব্যতীত প্রকৃতির মায়াজাল জ্ঞাত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি যোগী, তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতি মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী হইয়া পলায়ন করেন। সোজা কথায়, সেই যোগী ব্যক্তিতে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়েন। প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি আর পুরুষপদবাচ্য হন না, তখন কেবল আত্মা নামে সৎস্বরূপে অবস্থিত হন। এই সৎস্বরূপে অবস্থান করা যায় বলিয়া যোগ শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যোগই ধর্ম্মজগতের একমাত্র পথ। তন্ত্রের মন্ত্র, মুসলমানের আল্লা, খৃষ্টানের খৃষ্ট, পৃথক হইলেও যখন তাঁহারা সেই সেই চিন্তায় আত্মহারা হন, তখন তাঁহারা অজ্ঞাতসারে যোগাভ্যাস করেন বৈ কি! তবে কোন দেশের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই আর্য্য-যোগধর্ম্মের ন্যায় পরিণতি বা পরিপুষ্টি ঘটে নাই। ফলতঃ অন্যান্য জাতিসম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতীয় তন্ত্র মন্ত্র পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি সমস্তই যোগমূলক।

যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই জ্ঞান হইতেই মানবাত্মার মুক্তি হইয়া থাকে। সেই মুক্তিদাতা পরমজ্ঞান, যোগ ব্যতীত শাস্ত্র পাঠে লাভ করা যায় না। ভগবান্ শঙ্করদেব বলিয়াছেন—

অনেকশতসংখ্যাভিস্তর্কব্যাকরণাদিভিঃ।
পতিতা শাস্ত্রজালেষু প্রজ্ঞয়া তে বিমোহিতাঃ॥

—যোগবীজ, ৮

শত শত তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণাদি অনুশীলন পূর্ব্বক মানবগণ শাস্ত্রজালে পতিত হইয়া কেবল বিমোহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞান যোগাভ্যাস ব্যতীত উৎপন্ন হয় না।

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি॥
সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৫১

বেদচতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহার নবনীতস্বরূপ সারভাগ যোগিগণ পান করিয়াছেন। আর তাহার অসার ভাগ যে তক্র (ঘোল বা মাঠা), পণ্ডিতগণ তাহাই পান করিতেছেন। শাস্ত্রপাঠে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা মিথ্যা প্রলাপমাত্র, প্রকৃত জ্ঞান নহে। বহির্মুখীন মনবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখীন করতঃ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে সংযোজনা করার নাম প্রকৃত জ্ঞান।

একদা ভরদ্বাজ ঋষি পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "কিং জ্ঞানমিতি?" ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন—"একাদশেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ সদ্গুরূপাসনয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈর্দৃগ্দৃশ্যপ্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং

ঘট-পটাদিবিকারপদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানম্।" অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ জিহ্বা নাসিকা-ত্বক্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদ-মুখ-পায়ু-উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহপূর্ব্বক সদ্গুরুর উপাসনা দ্বারা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট-পট-মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎবস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্য পদার্থ নাই, এতদ্রূপ অনুভবাত্মক যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহার নাম জ্ঞান। যোগাভ্যাস না করিলে কখনই জ্ঞান লাভ হয় না। সাধারণের যে জ্ঞান, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান। কেননা জীবমাত্রেই মায়াপাশে বদ্ধ; মায়াপাশ ছিন্ন না করিতে পারিলে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক দর্শন করিবার উপায় যোগ। যোগসাধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনরূপেই মোক্ষলাভের হেতুভূত যে দিব্যজ্ঞান, তাহা উদয় হয় না। যোগবিহীন সাংসারিক জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র;—তদ্দ্বারা কেবল সুখ-দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, মুক্তিপথে যাইবার সাহায্য পাওয়া যায় না; পরম যোগী মহাদেব নিজমুখে বলিয়াছেন—

যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি।

—যোগবীজ, ১৮

হে পরমেশ্বরি! যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হইতে পারে? সদাশিব যোগের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া পার্ব্বতীর নিকট বলিয়াছেন—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোঽপি ধর্ম্মজ্ঞোঽপি জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনা যোগেন দেবোঽপি ন মুক্তিং লভতে প্রিয়ে॥

— যোগবীজ, ৩১

হে প্রিয়ে! জ্ঞানবান্, সংসারবিরক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় কিম্বা কোন দেবতাও যোগ ব্যাতিরেকে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যোগযুক্ত জ্ঞান ব্যতীত কেবল সাধারণ শুষ্কজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। যোগরূপ অগ্নি অশেষ পাপপঞ্জর দগ্ধ করে এবং যোগদ্বারা দিব্যজ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান হইতেই লোক সকল নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। যোগানুষ্ঠানে সমাধি অভ্যাসের পরিপাক হইলেই অন্তঃকরণের অসম্ভবাদি দোষের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে আত্মদর্শন মাত্রেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সুতরাং আপনা আপনিই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পাইতে থাকে। যোগসিদ্ধি ভিন্ন কখনই প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। যোগী ভিন্ন অন্যের জ্ঞান প্রলাপ মাত্র।

> যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্ মারুতো মধ্যমার্গে
> যাবদ্বিন্দু র্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ।
> যাবদ্ ধ্যানসহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
> তাবজ্ জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ॥
>
> —গোরক্ষসংহিতা, ৪র্থ অংশ

যে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু সুষুম্না-বিবর মধ্যে বিচরণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ না করে, যে পর্য্যন্ত বীর্য্য দৃঢ় না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত চিত্তের স্বাভাবিক ধ্যানাকার বৃত্তিপ্রবাহ উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত যে জ্ঞান, তাহা মিথ্যা প্রলাপ মাত্র, উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও বীর্য্যকে বশীভূত করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। চিত্ত সততই চঞ্চল, স্থির হয় কিসে? শাস্ত্রেই তাহার উত্তর আছে। যথা—

> যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো ময্যেকচিত্ততা।
>
> —আদিত্য পুরাণ

যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগ দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সুতরাং চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রাণসংরোধ,—কুম্ভক দ্বারা প্রাণবায়ু স্থিরীকৃত হইলে চিত্ত আপনা আপনিই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। চিত্ত স্থির হইলেই, বীর্য্য স্থির হয়। বীর্য্য স্থির হইলেই প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়। কুম্ভককালে প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মহাকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণবায়ু স্থির হইলেই চিত্ত স্থির হয়; কারণ—

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ।

—হঠযোগপ্রদীপিকা, ২৯

মন ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা, মন প্রাণবায়ুর অধীন। সুতরাং প্রাণবায়ু স্থির হইলেই, চিত্ত নিশ্চয়ই স্থির হইবে। চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। সুতরাং সকলেরই যোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তদভ্যাসে নিযুক্ত হওয়া উচিত। যোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ বা আত্মার মুক্তি হয় না।

এই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। এই যোগে সকলেই, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যোগ-বলে অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতালাভ করিতে পারে—কর্ম্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সমাধিপদ লাভ করিতে পারে। মত, অনুষ্ঠান, কর্ম্ম, শাস্ত্র ও মন্দিরে যাইয়া উপাসনা প্রভৃতি উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও সাধক এই যোগ-সাধনার কৈবল্যপদ লাভ করিতে পারেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

যোগবলে অত্যাশ্চর্য্য অমানুষিক ক্ষমতা লাভ হয়। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন। তাঁহার বাক্যসিদ্ধি হয়; দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, বীর্য্যস্তম্ভন, কায়ব্যূহধারণ ও পরশরীরে প্রবেশের ক্ষমতা জন্মে; বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণাদি ধাতুন্তর হয় এবং অন্তর্দ্ধান হইবার ক্ষমতা জন্মে। যোগপ্রভাবে এইসকল শক্তি লাভ হয় এবং অন্তর্য্যামিত্ব ও অবিরোধে শূন্যপথে গমনাগমনের ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু সাবধান, অলৌকিক শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যোগসাধন করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা, তাহাতে মানব সমাজে, দশের মাঝে বাহবা পাওয়া যায়—কিন্তু যে যেমন, তাহাই থাকিবে। ব্রহ্মোদ্দেশে যোগসাধন আবশ্যক—বিভূতি আপনি বিকশিত হইবে। যোগাভ্যাসে আসক্তিশূন্য হইতে গিয়া আবার যেন আসক্তির আগুনে দগ্ধ কিম্বা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে গিয়া কণ্টক-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে না হয়।

আর এক কথা, সিদ্ধিলাভে যত প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে সন্দেহই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আমি এত খাটিতেছি, ইহাতে ফল হইবে কি না—এই সন্দেহই সাধন পথের কণ্টক। কিন্তু যোগে সে আশঙ্কা নাই, যতটুকু অভ্যাস করিবে, তাহারই ফল পাইবে। কাহারও যোগসাধনে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সাংসারিক প্রতিবন্ধকবশতঃ ঘটিয়া না উঠিলে, যদি সেই ইচ্ছা লইয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে পরজন্মে জন্মস্থানাদিরূপ এরূপ উৎকৃষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইবে, যাহাতে যোগাবলম্বনের সুবিধা হইয়া মুক্তির পথ মুক্ত হইবে। যদি কেহ যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করে, তবে এ জন্মে যতদূর অনুষ্ঠান করিয়াছে, পরজন্মে আপনিই সেই জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে, সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে যোগভ্রষ্ট বলা যায়। যোগভ্রষ্টের মৃত্যুর পরের অবস্থার কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায়

অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"যোগভ্রষ্ট জন পুণ্যকারী ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থানে বহুদিবস অবস্থান করিয়া সদাচারসম্পন্ন ধনী-গৃহে অথবা ব্রহ্মবুদ্ধসম্পন্ন উচ্চবংশে জন্মলাভ করে। সেই জন্য পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ বিষয়ে অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে।"* এইরূপ শ্রেষ্ঠতা অবগত হইয়া যোগানুষ্ঠানে যত্ন করা সকলের কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক,—

যোগ কি ?

সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।

—যোগশাস্ত্র

যৎকালে মনুষ্য সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার সেই মনের লয়াবস্থা যোগ বলিয়া উক্ত হয়। অপিচ—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

—পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২

চিত্তের বৃত্ত সকলকে রুদ্ধ বা নিরোধ করার নাম যোগ। বাসনা—কামনা-বিজড়িত চিত্তকে বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিপ্রবাহ স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই মানবহৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। চিত্ত

* প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

গীতা, ৬।৪১-৪২

সদা সর্ব্বদাই উহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাদিগকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে। উহাকে দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চিদ্‌ঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে লইয়া যাওয়ার নাম যোগ। চিত্ত পরিষ্কার না হইলে তাহাকে নিরোধ করা যায় না—যেমন মলিন বস্ত্রে দাগ ধরে না, তাহাকে কোন রঙে রঞ্জিত করিতে হইলে পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। আমরা জলাশয়ের তলদেশ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ কি? জলাশয়ের জল অপরিষ্কার বশতঃ এবং সর্ব্বদা তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ায় উহার তলদেশে দৃষ্টি পতিত হয় না। যদি জল নির্ম্মল থাকে আর বিন্দুমাত্র তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। জলাশয়ের তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—জলাশয় চিত্ত, আর উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তিস্বরূপ। আমাদের হৃদয়স্থ চৈতন্যঘন পুরুষকে দেখিতে পাই না কেন? আমাদের চিত্ত হিংসাদি পাপে মলিন এবং আশাদি বৃত্তিতে তরঙ্গায়িত; কাজেই আমরা হৃদয় দেখিতে পাই না। যম-নিয়মাদি সাধনে চিত্তমল বিদূরিত করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার নাম যোগ। যম-নিয়মাদি সাধনে হিংসা-কাম-লোভাদি পাপমল বিদূরিত ও কামনা বাসনা বিজড়িত চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে পারিলে হৃদয়স্থ চৈতন্য পুরুষের সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ দর্শন ঘটিলে—"আমি কে?" "তিনি কে?"—সে ভ্রম দূর হয়। জগৎ কি, পুত্র কলত্র কি, সোনার বাঁধন কি, লোহার বাঁধন কি, সে জ্ঞান জন্মে। হৃদয় দৃঢ়ভক্তি ও অহেতুক প্রেমসম্পন্ন হয়। সেই শ্যামসুন্দর, চিদ্‌ঘন রূপ আর ভুলিতে পারা যায় না। তখন দিব্যজ্ঞান জন্মে,—বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়,—দারা-পুত্র-ধনৈশ্বর্য্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে, ঘট পট-প্রেমপ্রীতি কিছু নহে, সেই আদি-অন্তহীন চরাচর

বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপই সত্য। সত্যস্বরূপের সত্তা জ্ঞানে অসত্য দূরে যায়—রাধাশ্যামের মহারাসের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যায়।

চিত্তের এই অবস্থা লাভের জন্য যোগের প্রয়োজন। কিন্তু এই অবস্থা পাইতে হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এখন দেখা যাউক, কিরূপে সেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে শরীর-তত্ত্ব জানা আবশ্যক।

শরীর-তত্ত্ব

—**()**—

যোগ শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে আপন শরীরটীর বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। শরীর ও প্রাণ এই দুইটী বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত না হইলে যোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র; এই জন্য যোগী হইবার পূর্ব্বে বা তৎসঙ্গে সঙ্গে উহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কারণ কায় ও প্রাণের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাত না হইলে, প্রাণকে সংযম করা যায় না, দেহকেও অরুগ্ন রাখা যায় না এবং কোন্ নাড়ীতে কিরূপে প্রাণ সঞ্চরণ করে, কিরূপে প্রাণকে অপানের সহিত সংযোগ করিতে হয়, তাহাও জানা যায় না। সুতরাং যোগসাধনও হয় না। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে,—

নবচক্রং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।
স্বদেহে যো ন জানন্তি কথং সিধ্যন্তি যোগিনঃ॥

—উৎপত্তি তন্ত্র

নবচক্র, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চাকাশ স্বদেহে যে ব্যক্তি জানে

না, তাহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে? যে কোন সাধন জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই দেহ মধ্যে আছে।

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥
—শিবসংহিতা

"ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিনলোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, তৎসমস্তই দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সেই সকল পদার্থ মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপন আপন বিষয়ের সম্পাদন করিতেছে।

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥
—শিব সংহিতা

জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিতি করে এবং সমুদয় নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও অবস্থান করিয়া থাকে। মুনি-ঋষিসকল, গ্রহ নক্ষত্র, পুণ্য-তীর্থ, পুণ্য-পীঠ ও পীঠদেবতাগণ এই দেহে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সৃষ্টিসংহারক চন্দ্র-সূর্য্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতও দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন।

জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়।
—শিব সংহিতা

যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে দেহতত্ত্বটী জানা আবশ্যক।

প্রত্যেক জীবশরীরই শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্—এই সপ্তধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, তেজ ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে শরীরনির্ম্মাণসমর্থ এই সপ্তধাতু এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদি শারীর-ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চভূত হইতে এই শরীর জাত বলিয়া, ইহাকে ভৌতিক দেহ কহে। ভৌতিক দেহ নির্জ্জীব ও জড় স্বভাবাপন্ন; কিন্তু ইহা চৈতন্যরূপী পুরুষের আবাসভূমি হওয়াতে সচেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শরীরাভ্যন্তরে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, ঐ স্থানগুলিকে চক্র বলে। তাহারা আপন আপন চক্রে অবস্থান করতঃ শারীরিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রটী পৃথিবীতত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রটী জলতত্ত্বের স্থান, নাভিমূলে মণিপুর চক্রটী অগ্নিতত্ত্বের স্থান, হৃদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ুতত্ত্বের স্থান, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশতত্ত্বের স্থান। যোগিগণ এই পাঁচটী চক্রে পৃথ্ব্যাদি ক্রমে পঞ্চমহাভূতের ধ্যান করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত চিন্তাযোগ্য আরও কয়েকটী চক্র আছে। ললাটদেশে আজ্ঞা নামক চক্রে পঞ্চ তন্মাত্রতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, চিত্ত ও মনের স্থান। তদূর্দ্ধে জ্ঞান নামক চক্রে অহংতত্ত্বের স্থান। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে একটী শতদল চক্র আছে, তন্মধ্যে মহত্তত্ত্বের স্থান। তদূর্দ্ধে মহাশূন্যে সহস্রদলচক্রে প্রকৃতিপুরুষ পরমাত্মার স্থান। যোগিগণ পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব এই ভৌতিক দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন।

———:※:———

নাড়ীর কথা

—*—

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥

শিবসংহিতা, ২।১৩

ভৌতিক দেহটী কার্য্যক্ষম হইবার জন্য মূলাধার হইতে প্রধানভূতা সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী উৎপন্ন হইয়া, "গলিত অশ্বত্থ বা পদ্মপত্রে যেরূপ শিরাজাল দৃষ্ট হয়" তদ্রূপ অস্থিময় দেহের উপর ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে। এই সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে চতুর্দ্দশটী প্রধান। যথা—

সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী॥
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়াসুষুম্নিকাঃ॥

শিব সংহিতা ২।১৪-১৫

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী—এই চতুর্দ্দশটী নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিন নাড়ী প্রধানা। সুষুম্না নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া নাভিমণ্ডলে যে ডিম্বাকৃতি নাড়ীচক্র আছে, তাহার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। সুষুম্নার বামপার্শ্ব হইতে ইড়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব হইতে পিঙ্গলা উত্থিত

হইয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ চক্রকে ধনুষাকারে বেষ্টন করতঃ ইড়া দক্ষিণনাসাপুট পর্য্যন্ত এবং পিঙ্গলা বামনাসাপুট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। মেরুদণ্ডের রন্ধ্রাভ্যন্তর দিয়া সুষুম্না নাড়ী ও মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশ দিয়া পিঙ্গলেড়া নাড়ীদ্বয় গমন করিয়াছে। ইড়া চন্দ্রস্বরূপা, পিঙ্গলা সূর্য্যস্বরূপা, এবং সুষুম্না চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্তা ও প্রস্ফুটিত ধুস্তুর পুষ্পসদৃশ শ্বেতবর্ণা।

পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য প্রধানা নাড়ীর মধ্যে কুহূ নাড়ী সুষুম্নার বাম দিক হইতে উত্থিত হইয়া মেঢ্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। বারুণী নাড়ী দেহের ঊর্দ্ধে এবং অধঃ প্রভৃতি সর্ব্ব গাত্রই আচ্ছাদন করিয়াছে। যশস্বিনী দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ পর্য্যন্ত, পূষানাড়ী দক্ষিণ নেত্র পর্য্যন্ত, পয়স্বিনী দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত, সরস্বতী জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত, শঙ্খিনী বাম কর্ণ পর্য্যন্ত, গান্ধারী বাম নেত্র পর্য্যন্ত, হস্তিজিহ্বা বামপদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত, অলম্বুষা বদন পর্য্যন্ত এবং বিশ্বোদরী উদর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এইরূপে সমস্ত শরীরটী নাড়ী দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। নাড়ীর উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে মনঃস্থির করিয়া চিন্তা করিলে বোধ হইবে, কন্দমূলটী ঠিক যেন পদ্মবীজকোষের চতুষ্পার্শ্বস্থ কেশরের মত নাড়ীসমূহ দ্বারা বেষ্টিত; এবং বীজকোষটীর মধ্যস্থল হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পরাগকেশরের মত উত্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ক্রমে ঐ সকল নাড়ী হইতে শাখাপ্রশাখাসকল উত্থিত হইয়া শরীরটীকে আপাদমস্তক বস্ত্রের টানা-পড়িয়ানের মত ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

যোগিগণ প্রধানভূতা এই চতুর্দ্দশ নাড়ীকে পুণ্যনদী বলিয়া থাকেন। কুহূ নাম্নী নাড়ীকে নর্ম্মদা, শঙ্খিনী নাড়ীকে তাপ্তী, অলম্বুষা নাড়ীকে গোমতী, গান্ধারী নাড়ীকে কাবেরী, পূষা নাড়ীকে তাম্রপর্ণী এবং হস্তি-জিহ্বা নাড়ীকে সিন্ধু বলে। ইড়া গঙ্গারূপা, পিঙ্গলা যমুনাস্বরূপা আর

সুষুম্না সরস্বতীরূপিণী ; এই তিন নদী আজ্ঞাচক্রের উপরে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের নাম ত্রিকূট বা ত্রিবেণী। এলাহাবাদের ত্রিবেণীতে লোকে কষ্টোপার্জ্জিত পয়সা ব্যয় করিয়া কিম্বা শারীরিক ক্লেশস্বীকার করিয়া স্নান করিতে যান, কিন্তু ঐ সকল নদীতে বাহ্যস্নান করিলে যদি মুক্তি হইত, তবে তীর্থাদির জলে জলচর জীবজন্তু থাকিত না, সকলেই উদ্ধার পাইত। শাস্ত্রেও ব্যক্ত আছে যে,—

"অন্তঃস্নানবিহীনস্য বহিঃস্নানেন কিং ফলম্ ?"

অন্তস্নানবিহীন ব্যক্তির বাহ্যস্নানে কোন ফল নাই। গুরুর কৃপায় যিনি আত্মতীর্থ জ্ঞাত হইয়া আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে এই তীর্থরাজ ত্রিবেণীতে মানস স্নান বা যৌগিক স্নান করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিপদ লাভ করেন, শিববাক্যে সন্দেহ নাই।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই প্রধান তিনটী নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সর্ব্বপ্রধানা। ইহার গর্ভে বজ্রাণী নামক একটী নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী শিশ্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া শিরঃস্থান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্তা আছে। বজ্র নাড়ীর অভ্যন্তরে আদ্যন্ত প্রণবযুক্তা অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদিতে ও অন্তেতে পরিবৃতা মাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্মা চিত্রাণী নাম্নী আর একটী নাড়ী আছে। এই চিত্রাণী নাড়ীতে পদ্ম বা চক্র সকল গ্রথিত রহিয়াছে। চিত্রাণী নাড়ীর মধ্যে আর একটী বিদ্যুদ্বর্ণা নাড়ী আছে, তাহার নাম ব্রহ্মনাড়ী—মূলাধারপদ্মস্থিত মহাদেবের মুখবিবর হইতে উত্থিত হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রদল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। যথা—

তন্মধ্যে চিত্রাণী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা
তাতন্তূপমেয়া সকলসরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্।

ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্ গ্রথনরচনয়া শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা
তস্যান্তর্ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবান্তসংস্থা ॥

—পূর্ণানন্দ পরমহংসকৃত ষট্চক্র।

এই ব্রহ্মনাড়ীটী অহর্নিশ যোগিগণের পরিচিন্তনীয়; কারণ, যোগ-সাধনার চরম ফল এই ব্রহ্মনাড়ীটী হইতে লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া গমন করিতে পারিলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, এবং যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে কোন্ নাড়ীতে কিরূপ বায়ু সঞ্চরণ করে, জানা আবশ্যক।

বায়ুর কথা

—❊—

ভৌতিক দেহে যত প্রকার শারীরিক কার্য্য হইয়া থাকে, তৎসমস্তই বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চৈতন্যের সাহায্যে এই জড় দেহে বায়ুই জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। দেহ কেবল যন্ত্র মাত্র; বায়ু ঐ যন্ত্রটীর চালনা করিবার উপকরণ। সুতরাং বায়ুকে বশ করার উপায়ের নাম যোগসাধনা। বায়ু বশ হইলেই মনও বশ হয়, মন স্ববশে আসিলে ইন্দ্রিয়জয় করা যায়, ইন্দ্রিয় জয় হইলেই সিদ্ধিলাভের আর বাকী থাকে না। বায়ু জয় করিয়া যাহাতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাহার জন্যই যোগিগণ যোগসাধন করিয়া থাকেন; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বায়ুর বিষয় জ্ঞাত হওয়া অতীব প্রয়োজন।

মানবদেহের অভ্যন্তরে হৃদ্দেশে অনাহত নামক একটী রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে বায়ুবীজ (যং) নিহিত আছে। ঐ বায়ুবীজ বা বায়ুযন্ত্র প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; প্রাণবায়ু শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া দৈহিক কার্য্যভেদে দশ নাম ধারণ করিয়াছে।

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ।
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
—গোরক্ষসংহিতা, ২৯

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশনামে প্রাণবায়ু অভিহিত হইয়া থাকে। এই দশ বায়ু মধ্যে, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু অন্তঃস্থ এবং নাগাদি পঞ্চ বায়ু বহিঃস্থ। অন্তঃস্থ পঞ্চ প্রাণের দেহ মধ্যে পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুহ্যমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ।
ব্যানো ব্যাপী শরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ॥
—গোরক্ষসংহিতা, ৩০

প্রধান পঞ্চ বায়ুর মধ্যে হৃদ্দেশে প্রাণবায়ু, অপান বায়ু গুহ্যদেশে, সমান বায়ু নাভিমণ্ডলে, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে, ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। যদিও বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এক প্রাণবায়ুই মূল ও প্রধান।

প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।
—শিবসংহিতা

প্রাণ বায়ুর বৃত্তিভেদে বিবিধ নাম সঙ্কলিত হইয়াছে। এক্ষণে এই

—৫

দশ বায়ুর গুণ

জানা আবশ্যক। প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চবায়ু ও নাগাদি বহিঃস্থ পঞ্চবায়ু যথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া, শারীরিক সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। যথা—

নিঃশ্বাসোচ্ছাসরূপেণ প্রাণকর্ম্ম সমীরিতম্।
অপানবায়োঃ কর্ম্মৈতদ্বিণ্মূত্রাদি বিসর্জ্জনম্
হানোপাদানচেষ্টাদিব্যানকর্ম্মেতি চেষ্যতে।
উদানকর্ম্ম তচ্চোক্তং দেহস্যোন্নয়নাদি যৎ॥
পোষণাদি সমানস্য শরীরে কর্ম্ম কীর্ত্তিতং।
উদ্গারাদিগুণো যস্তু নাগকর্ম্ম সমীরিতং।
নিমীলনাদি কূর্ম্মস্য ক্ষুতৃষ্ণে কৃকরস্য চ।
দেবদত্তস্য বিপ্রেন্দ্র তন্দ্রাকর্ম্মেতি কীর্ত্তিতং।
ধনঞ্জয়স্য শোথাদি সর্ব্বকর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতং॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ৪।৬৬ - ৬৯

নাসিকা দ্বারা হৃদয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস, উদরে ভুক্তান্ন-পানীয়কে পরিপাক ও পৃথক্ করা, নাভিস্থলে অন্নকে পুরীষরূপে, পানীয়কে স্বেদ ও মূত্ররূপে এবং রসাদিকে বীর্য্যরূপে পরিণত করা **প্রাণ** বায়ুর কার্য্য। উদরে অন্নাদি পরিপাক করিবার জন্য অগ্নিপ্রজ্বালন করা, গুহ্যে মলনিঃসারণ করা, উপস্থে মূত্র নিঃসারণ করা, অণ্ডকোষে বীর্য্য নিঃসারণ করা এবং মেঢ্র, উরু, জানু, কটিদেশ ও জঙ্ঘাদ্বয়ের কার্য্য সম্পন্ন করা **অপান** বায়ুর কার্য্য। পরিপক্ক রসাদিকে বাহাত্তর হাজার নাড়ীমধ্যে পরিব্যাপ্ত করা, দেহের

পুষ্টিসাধন করা ও স্বেদ নির্গত করা **সমান** বায়ুর কার্য্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থান ও অঙ্গের উন্নয়ন করা **উদান** বায়ুর কার্য্য। কর্ণ, নেত্র, ঘাড়, গুল্‌ফ, গলদেশ ও কটির অধোদেশের ক্রিয়া সম্পন্ন করা **ব্যান** বায়ুর কার্য্য। উদ্গারাদি **নাগ** বায়ু, সঙ্কোচনাদি **কুর্ম্ম** বায়ু, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি **কৃকর** বায়ু, নিদ্রাতন্দ্রাদি **দেবদত্ত** বায়ু ও শোষণাদি কার্য্য **ধনঞ্জয়** বায়ু সম্পন্ন করিয়া থাকে। বায়ুর এই সকল গুণ অবগত হইয়া বায়ু জয় করিতে পারিলে স্বেচ্ছামত শরীরের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং শরীর সুস্থ, নীরোগ ও পুষ্টিকান্তিবিশিষ্ট করা যায়।

শরীরে যে পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল দেহ জীবিত থাকে। সেই বায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে মৃত্যুসংঘটন হয়। প্রাণবায়ু নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে, আর যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত অপান বায়ু অধোভাগে গমনাগমন করে। যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগ স্ফীত করিতে থাকে, সেই কালেই অপান বায়ু যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে। এইরূপ নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান উভয় দিক্ হইতে প্রাণ ও অপান এই দুই বায়ুই পূরককালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচককালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে। যথা—

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ॥
তথা চৈতৌ বিসম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিদম্।

—ষট্‌চক্রভেদটীকা।

অপান প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানবায়ুকে আকর্ষণ

করে। যেমন শ্যেনপক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, উড্ডীন্ হইলেও পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে, প্রাণবায়ুও সেইরূপ নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়াও অপান বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করে ; এই দুই বায়ুর বিসংবাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীত ভাবে গমনে জীবন রক্ষা হয়। আর যখন ঐ দুই বায়ু নাভিগ্রন্থি ভেদ পূর্ব্বক একত্রে মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা দেহ ত্যাগ করে, পৃথিবীর ভাষায় জীবেরও মৃত্যু হয়। গমন কালে ঐ ভাবকে নাভিশ্বাস বলে। বায়ুর ঐ সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া উচিত। অধুনা শরীরস্থ হংসাচারের বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

হংস-তত্ত্ব

মানব-দেহের অভ্যন্তরে হৃদ্দেশে অনাহত নামক পদ্মে ত্রিকোণাকার পীঠে বায়ু বীজ যং আছে। এই বায়ুমণ্ডল মধ্যে কামকলারূপ তেজোময় রক্তবর্ণ পীঠে কোটীবিদ্যুৎসদৃশ ভাস্বর সুবর্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ শিব আছেন। তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ তেজোময় অতি সূক্ষ্ম একটী মণি আছে। তন্মধ্যে নির্ব্বাত দীপকলিকার ন্যায় হংসবীজ-প্রতিপাদ্য তেজোবিশেষ আছে। ইনিই জীবের জীবাত্মা। অহংভাব আশ্রয় করিয়া এই জীবাত্মা মানবদেহে আছেন। আমরা মায়ায় মুহ্যমান ও শোকে কাতর হই এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ফলভোগ করিয়া থাকি, তাহা আমাদের সকলেরই

হৃদয়স্থিত ঐ জীবাত্মা ভোগ করিয়া থাকেন। অনাহত পদ্মে এই জীবাত্মা অহোরাত্র সাধনা বা যোগ অথবা ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। যথা—

সোঽহং—হংসঃ পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

হংসের বিপরীত "সোঽহং" জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে হংস উচ্চারিত হয়। শ্বাসবায়ুর নির্গমন সময়ে হং ও গ্রহণ সময়ে সঃ এই শব্দ উচ্চারিত হয়। হং শিবস্বরূপ এবং সঃ শক্তিরূপিণী। যথাঃ -

হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র, ১১।৭

শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যদি গ্রহণ করা না গেল, তবে তাহাতেই মৃত্যু হইতে পারে, অতএব 'হং' শিবস্বরূপ বা মৃত্যু। 'সঃ' কারে গ্রহণ, ইহাই শক্তিস্বরূপ। অতএব এই শ্বাস-প্রশ্বাসেই জীবের জীবত্ব ; শ্বাসরোধেই মৃত্যু। সুতরাং **হংসই** জীবের জীবাত্মা। শাস্ত্রেও ভূতশুদ্ধির মধ্যে আছে "হংস ইতি জীবাত্মানং" অর্থাৎ হংস এই জীবাত্মা।

এই হংসশব্দকেই **অজপা** গায়ত্রী বলে। যতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, ততবার "হংস" পরম মন্ত্র অজপা জপ হয়। জীব অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার অজপা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপ ও সাধনা। ইহা জানিতে পারিলে মালা-ঝোলা লইয়া আর বাহ্যানুষ্ঠান বা উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। দুঃখের বিষয়, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ও সঙ্কেতের উপদেশাভাবে এমন সহজ জপসাধনা কেহ বুঝে না। গুরূপদেশে এই হংসধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হংস বিপরীত "সোঽহং" সাধকের সাধনা। জীবাত্মা সর্ব্বদা এই "সোঽহং" (অর্থাৎ আমিই তিনি, কি না আমিই সেই পরমেশ্বর) শব্দ জপ

করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন বিষয়বিমূঢ় মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধক সামান্য কৌশলে এই স্বত-উত্থিত অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসামান্য "হংস" ও "সোহহং" ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

প্রণব-তত্ত্ব

—**()**—

অনাহত পদ্মের পূর্ব্বোক্ত "হংস" ধ্বনিকে প্রণবধ্বনি বলে। যথা—

শব্দব্রহ্মেতি তাং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবঃ সদাশিবঃ।
অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥

—পরাপরিমলোল্লাস

অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম। তাহা সাক্ষাৎ দেবতা সদাশিব। সেই শব্দ অনাহত চক্রে আছে। অনাহত পদ্মে হংস উচ্চারিত হয়। সেই হংসই প্রণব বা ওঁকার। যথা:—

হকারঞ্চ সকারঞ্চ লোপয়িত্বা ততঃ পরং।
সন্ধিং কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোঽসৌ মহামনুঃ ॥

—যোগস্বরোদয়।

অর্থাৎ "হংস" বিপরীত "সোহহং" হয়; কিন্তু স আর হ লোপ হইলে কেবল ওঁ থাকিল। ইহাই হৃদয়স্থ শব্দব্রহ্মরূপ ওঁকার। সাধকগণ

শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবধ্বনি (ওঁকার) শ্রবণলালসায় দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে চিন্তা করিয়া গুরূপদেশানুসারে ক্রিয়া করিবেন, তাহা হইলে হংস বা ওঁকারধ্বনি কর্ণগোচর হইবে।

এই শব্দব্রহ্মরূপ ওঁকার ব্যতীত আর একটী বর্ণব্রহ্মরূপ ওঁকার আছেন। তাহা আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে নিরালম্বপুরে নিত্য বিরাজিত। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ **আজ্ঞাচক্র** আছে। এই চক্রের উপর যেস্থানে সুষুম্না-নাড়ীর শেষ ও শঙ্খিনীনাড়ীর আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানকে **নিরালম্বপুরী** বলে। তাহাই তেজোময় তারকব্রহ্ম স্থান। এইখানে ব্রহ্মনাড়ী আশ্রিত তারক বীজ প্রণব (ওঁকার) বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রণব বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ এবং শিবশক্তিযোগে প্রণবরূপ। শিব শব্দে হ-কার, তাহার আকার গজকুম্ভের ন্যায় অর্থাৎ "ও" কার। ও-কার রূপ পর্য্যঙ্কে নাদরূপিণী দেবী; তদুপরি বিন্দুরূপ পরম শিব। তাহা হইলেই ওঁ-কার হইল। সুতরাং শিব-শক্তি বা প্রকৃতি-পুরুষের সমযোগেই ওঁকার। তন্ত্রে এই ওঁকারের স্থূলমূর্ত্তি বা **রাজরাজেশ্বরী**রূপ মহাবিদ্যা প্রকাশিতা।* তাহার গূঢ় রহস্য ও বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নহে।

সাধক যোগানুষ্ঠানে যথাবিধি ষট্চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয়ে এই নিরালম্ব পুরীতে আসিলে মহাজ্যোতিরূপ ব্রহ্ম ওঁকার অথবা আপন আপন ইষ্টদেবতা দর্শন হয় এবং প্রকৃত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। সকল দেব-দেবীর বীজ স্বরূপ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ প্রণব-তত্ত্ব অবগত হইয়া সাধন করিলে এই তারকব্রহ্ম স্থানে জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করা

* শ্রীমৎ স্বামী বিমলানন্দ কৃত কলিকাতা—চোরবাগান আর্টষ্টুডিও হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীকালিকা মূর্ত্তি প্রণবের স্থূলরূপ। পঞ্চপ্রেতাসনে মহাকাল শায়িত, তাঁহার নাভিকমলে শিবশক্তি অবস্থিতা—অপূর্ব্ব মিলন!

যায়। তাহা হইলে আর তীর্থে তীর্থে ছুটাছুটী করিয়া অকারণ কষ্টভোগ করিতে হয় না।

ওঁকার প্রণবের নামান্তর মাত্র। ওঁকারের তিন রূপ ;—শ্বেত, পীত ও লোহিত। অ, উ, ম যোগে প্রণব হইয়াছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রণবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যথা—

শিবো ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুরোঙ্কারে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অকারশ্চ ভবেদ্ব্রহ্মা উকারঃ সচ্চিদাত্মকঃ॥
মকারো রুদ্র ইত্যুক্তঃ—

অ-কার ব্রহ্মা, উ-কার বিষ্ণু, ম-কার মহেশ্বর। সুতরাং প্রণবে ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেব, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন শক্তি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেজন্য ইহাকে ত্রয়ী কহে। শাস্ত্রে আছে, "ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ" অর্থাৎ ত্রয়ী অকার, উকার ও মকার বিশিষ্ট শব্দ প্রণবধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলদাতা। যিনি প্রণবত্রয়যুক্ত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রী জপে তিন প্রণব সংযুক্ত এবং ইষ্টমন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব দ্বারা সেতুবন্ধন করিয়া জপ না করিলে গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র জপ নিষ্ফল। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীর আদি ও অন্তে দুই প্রণব যোগে জপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; আদি, ব্যাহৃতির পরে ও শেষে এই তিন স্থানে প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অ, উ, ম, যোগে প্রণব। প্রণবের এই অকার নাদ-রূপ, উকার বিন্দুরূপ, মকার কলারূপ এবং ওঁকার জ্যোতীরূপ। সাধকগণ সাধনাসময়ে প্রথমে নাদ শুনিয়া নাদলুব্ধ হন, পরে বিন্দুলুব্ধ, তৎপরে কলা-লুব্ধ হইয়া সর্ব্বশেষে জ্যোতির্দ্দর্শন করিয়া থাকেন।

প্রণবে অষ্ট অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান, পঞ্চ দেবতা প্রভৃতি আরও অনেক গুহ্যরহস্য আছে। কিন্তু সে সকলের সম্যক্‌তত্ত্ব বা বিশদ ব্যাখ্যা বিবৃত করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত **মূলাধার** পদ্ম আছে। তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মনাড়ী-মুখে **স্বয়ম্ভূলিঙ্গ** আছেন। তাঁহার গাত্রে দক্ষিণাবর্ত্তে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া **কুণ্ডলিনী** শক্তি আছেন। যথা—

পশ্চিমাভিমুখী যোনির্গুদমেঢ্রান্তরালগা।
তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুণ্ডলী সদা॥

---শিবসংহিতা

গুহ্য ও লিঙ্গ এই দুয়ের মধ্যস্থানে পশ্চাদভিমুখী **যোনিমণ্ডল** আছে—সেই যোনিমণ্ডলকে কন্দও বলা যায়। যোনিমণ্ডলের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি নাড়ী সকলকে বেষ্টন করিয়া সার্দ্ধ ত্রিকুটিলাকার সর্পরূপে আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্না ছিদ্রকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

এই কুণ্ডলিনীই নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা **প্রকৃতি**; তাঁহার দুই মুখ, এবং বিদ্যুল্লতাকার ও অতি সূক্ষ্ম, দেখিতে অর্দ্ধ ওঙ্কারের প্রতিকৃতিতুল্য। নরামরাসুরাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনী বিরাজিত আছেন।

পদ্মোদরে যেমন অলির অবস্থিতি, সেইরূপ দেহ মধ্যে কুণ্ডলিনী বিরাজিত থাকেন। ঐ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে কদলী কোষের ন্যায় কোমল মূলাধারে চিৎশক্তি থাকেন। তাঁহার গতি অতি দুর্লক্ষ্য।

কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণ তেজঃস্বরূপ দীপ্তিমতী এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের প্রসূতি **ব্রহ্মশক্তি**। এই কুণ্ডলিনী-শক্তিই ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ করেন। এই শক্তিই আমাদের জীবনীশক্তি। এই শক্তিকে আয়ত্তীভূত করাই যোগসাধনের উদ্দেশ্য।

এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিই জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ। কিন্তু কুণ্ডলিনী-শক্তি ব্রহ্মদ্বার রোধ করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন; তাহাতেই জীবাত্মা রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অহংভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং অজ্ঞানমায়াচ্ছন্ন হইয়া সুখদুঃখাদি ভ্রান্তি জ্ঞানে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা না হইলে শত শত শাস্ত্রপাঠে বা গুরূপদেশে প্রকৃত জ্ঞান সমুদ্ভূত হয় না এবং তপ-জপ ও সাধন-ভজন সমস্তই বৃথা। যথা—

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবি বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥

—গৌতমীয় তন্ত্র

মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি যাবৎ জাগরিত না হইবেন, তাবৎকাল মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চ্চনা বিফল। যদি পুণ্যপ্রভাবে সেই শক্তি-দেবী জাগরিতা হয়েন, তবে মন্ত্র জপাদির ফলও সিদ্ধ হইবে।

যোগানুষ্ঠান দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই মানব-জীবনের পূর্ণত্ব। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান পাঠে সাধকের ঐ শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে ও ঐ শক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিতা হইয়া থাকেন। ধ্যান যথা—

ধ্যায়তে কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্॥

এক্ষণে শরীরস্থ নবচক্রাদির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ; নতুবা যোগ সাধন বিড়ম্বনা মাত্র।

নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥

—যোগ স্বরোদয়

শরীরস্থ নবচক্র, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চ প্রকার ব্যোম যে ব্যক্তি অবগত নহে, সে ব্যক্তি কেবল নামধারী যোগী অর্থাৎ সে যোগতত্ত্বের কিছুই জ্ঞাত নহে। কিন্তু নবচক্রের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করা এই নিঃস্ব লেখকের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে এই গ্রন্থে যে কয়েকটী সাধন কৌশল সন্নিবেশিত হইল, তৎসাধনোপযোগী মোটামুটী নবচক্রের বিবরণ বর্ণিত হইল। যিনি সম্যক জানিতে চাহেন, তিনি পূর্ণানন্দ পরমহংস কৃত "ষট্‌চক্র" হইতে জানিয়া লইবেন। যোগসাধন ব্যতীত, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য জপ পূজাদি করিতেও চক্রাদির বিবরণ জানা আবশ্যক।

নবচক্রং

মূলাধারং চতুষ্পত্রং গুদোর্দ্ধে বর্ত্ততে মহৎ।
লিঙ্গমূলে তু পীতাভং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্‌দলম্‌॥

তৃতয়ং নাভিদেশে তু দিগ্দলং পরমাদ্ভুতম্‌।
অনাহতমিষ্টপীঠং চতুর্থকমলং হৃদি॥

কলাপত্রং পঞ্চমন্তু বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ।
আজ্ঞায়াং ষষ্ঠকং চক্রং ভ্রুবোর্মধ্যে দ্বিপত্রকম্‌॥

চতুঃষষ্টিদলং তালুমধ্যে চক্রন্তু মধ্যমম্‌।
ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্যষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভম্‌॥

নবমন্তু মহাশূন্যং চক্রন্তু তৎ পরাৎপরম্‌।
তন্মধ্যে বর্ত্ততে পদ্মং সহস্রদলমদ্ভুতম্‌॥

—প্রাণতোষিণীধৃত তন্ত্রবচন

এই তন্ত্রবচনের ব্যাখ্যায় সাধকগণ নবচক্রের বিবরণ কিছুই জানিতে পারিবেন না; অতএব ষট্‌চক্রের সংস্কৃতাংশ পরিত্যাগ করিয়া অনুবাদ হইতে সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইল।

প্রথম—মূলাধার চক্র

মানবদেহের গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে ও লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত যে যোনিমণ্ডল আছে, তাহারই উপরে **মূলাধার** পদ্ম অবস্থিত। ইহা অল্প রক্তবর্ণ ও চতুর্দ্দল বিশিষ্ট, চতুর্দ্দল ব শ ষ স এই চারি বর্ণাত্মক। এই চারি বর্ণের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অষ্টশূল-শোভিত চতুষ্কোণ **পৃথ্বীমণ্ডল** আছে। তাহার একপার্শ্বে পৃথ্বীবীজ **লং** আছে। তন্মধ্যে পৃথ্বীবীজ প্রতিপাদ্য **ইন্দ্রদেব** আছেন। ইন্দ্রদেবের চারিহস্ত ও পীতবর্ণ এবং শ্বেত হস্তীর উপর উপবিষ্ট। ইন্দ্রের ক্রোড়ে শৈশবাবস্থায় চতুর্ভুজ **ব্রহ্মা** আছেন। ব্রহ্মার ক্রোড়ে রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, সালঙ্কৃতা **ডাকিনী** নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা।

লং বীজের দক্ষিণে কামকলারূপ রক্তবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল আছে। তন্মধ্যে তেজোময় রক্তবর্ণ **ক্লীং** বীজরূপ কন্দর্প নামক রক্তবর্ণ স্থিরতর বায়ুর বসতি। তাহার মধ্যে ঠিক ব্রহ্মনাড়ীর মুখে **স্বয়ম্ভু লিঙ্গ** আছেন। ঐ লিঙ্গ রক্তবর্ণ ও কোটী সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়। তাঁহার গাত্রে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনী-শক্তি আছেন। এই কুল-কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে চিৎশক্তি বিরাজিতা। এই কুণ্ডলিনী-শক্তি সকলেরই ইষ্টদেবীস্বরূপিণী এবং মূলাধারচক্র মানব দেহের আধার স্বরূপ, এজন্য ইহার নাম আধারপদ্ম। সাধন-ভজনের মূল এই স্থানে, এই জন্য ইহাকে মূলাধারপদ্ম বলে।

এই মূলাধারপদ্ম ধ্যান করিলে গদ্য পদ্যাদি, বাক্‌সিদ্ধি ও আরোগ্যাদি লাভ হয়।

দ্বিতীয়—স্বাধিষ্ঠান চক্র

লিঙ্গমূলে সংস্থিত দ্বিতীয় পদ্মের নাম **স্বাধিষ্ঠান**। ইহা সুপ্রদীপ্ত অরুণ বর্ণ ও ষড়্ দলবিশিষ্ট; ষড়-দল—ব ভ ম য র ল এই ছয় মাতৃকাবর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা এই ছয়টী বৃত্তি রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকাভ্যন্তরে শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার **বরুণ মণ্ডল** আছে। তন্মধ্যে বরুণবীজ শ্বেতবর্ণ **বং** রহিয়াছে। তাহার মধ্যে বরুণবীজপ্রতিপাদ্য শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ **বরুণ** দেবতা মকরারোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে জগৎপালক নবযৌবনসম্পন্ন **হরি** আছেন। তাঁহার চতুর্ভুজ, চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তভ শোভিত এবং পরিধানে পীতাম্বর। তাঁহার ক্রোড়ে দিব্যবস্ত্র ও আভরণভূষিতা, চতুর্ভুজা গৌরবর্ণা **রাকিণী** নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা।

এই পদ্ম ধ্যান করিলে ভক্তি, আরোগ্য ও প্রভুত্বাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে।

তৃতীয়—মণিপুর চক্র
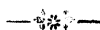
নাভিদেশে তৃতীয় পদ্ম **মণিপুর** অবস্থিত। ইহা মেঘবর্ণ দশদলযুক্ত, দশদল—ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশ মাতৃকাবর্ণাত্মক। এই দশ

বর্ণ নীলবর্ণ। প্রত্যেক দলে লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায় তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা ও ভয় এই দশটী বৃত্তি রহিয়াছে। মণিপুর পদ্মের কর্ণিকামধ্যে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ **বহ্নিমণ্ডল** আছে। তন্মধ্যে বহ্নিবীজ **রং** আছে ; ইহাও রক্তবর্ণ। এই বহ্নিবীজমধ্যে তৎপ্রতিপাদ্য চারি হস্তযুক্ত রক্তবর্ণ **অগ্নি**দেব মেষারোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে জগন্নাশক ভস্মভূষিত সিন্দুরবর্ণ **রুদ্র** ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দুই হস্ত, এই দুই হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। তাঁহার ত্রিনয়ন ও পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তাঁহার ক্রোড়ে পীতবসন পরিধানা, নানালঙ্কারভূষিতা চতুর্ভুজা, সিন্দুরবর্ণা **লাকিনী** নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা।

এই পদ্ম ধ্যান করিলে আরোগ্য ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয় এবং জগন্নাশাদি করিবার ক্ষমতা জন্মে।

চতুর্থ—অনাহতচক্র

হৃদয়ে বন্ধুকপুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট দ্বাদশদলযুক্ত চতুর্থ পদ্ম **অনাহত** অবস্থিত। দ্বাদশদল,—ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশ মাতৃকা-বর্ণাত্মক। বর্ণ কয়েকটীর রং সিন্দুরবর্ণ। প্রত্যেক দলে আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ এই দ্বাদশটী বৃত্তি রহিয়াছে। এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল এবং ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট **বায়ুমণ্ডল** আছে। তাহার একপার্শ্বে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ **যং** আছে। এই বায়ুবীজমধ্যে তৎপ্রতিপাদ্য ধূম্র

বর্ণ, চতুর্ভূজ **বাসুদেব** কৃষ্ণসারাধিরোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে বরাভয়-লসিতা ত্রিনেত্রা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা মুণ্ডমালাধরা পীতবর্ণা **কাকিনী** নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা। এই অনাহত পদ্মমধ্যস্থ বাণলিঙ্গ শিব ও জীবাত্মার বিষয় হংস তত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এই অনাহত পদ্ম ধ্যান করিলে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

পঞ্চম—বিশুদ্ধচক্র

কণ্ঠদেশে ধূম্রবর্ণ ষোড়শদলবিশিষ্ট **বিশুদ্ধ** পদ্ম অবস্থিত। ষোড়শদল - অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোল মাতৃকাবর্ণাত্মক। এই বর্ণগুলির বর্ণ শোণ পুষ্পের বর্ণ সদৃশ। প্রত্যেক দলে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সপ্ত স্বর ও হুঁ ফট্ বৌষট্, বষট্ স্বধা, স্বাহা, নমঃ, বিষ ও অমৃত প্রভৃতি রহিয়াছে। এই পদ্মের কর্ণিকায় শ্বেতবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে স্ফটিকসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট **হং** আছে। তাহার মধ্যে হং-বীজ প্রতিপাদ্য **আকাশ**-দেবতা শ্বেতহস্তীতে আরূঢ়। তাঁহার চারি হাত, ঐ চারি হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। এই আকাশ-দেবতার ক্রোড়ে ত্রিলোচনান্বিত পঞ্চমুখলসিত দশভুজ সদসৎ-কর্ম্ম-নিয়োজক ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর **সদাশিব** আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে শর, চাপ, পাশ ও শূলযুক্তা চতুর্ভুজা পীতবসনা রক্তবর্ণা **শাকিনী** নাম্নী তৎশক্তি অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে বিরাজিতা। এই অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের নিকটে সকলেরই বীজমন্ত্র বা মূলমন্ত্র বিদ্যমান আছে।

এই বিশুদ্ধপদ্ম ধ্যান করিলে, জরা ও মৃত্যুপাশ বিরহিত হইয়া ভোগাদি হয়।

—:※:—

ষষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র

—※—

ভ্রূদ্বয়মধ্যে শ্বেতবর্ণ দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাপদ্ম অবস্থিত। দুই দল - হ ক্ষ এই দুই বর্ণাত্মক। এই পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল আছে। ত্রিকোণের তিন কোণে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণ এবং ত্রিগুণান্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেব আছেন। ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ ঠং দীপ্তিমান আছেন। ত্রিকোণ মণ্ডলের এক পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ বিন্দু আছে। তাহার পার্শ্বে চন্দ্রবীজ প্রতিপাদ্য বরাভয়-লসিত দ্বিভুজ দেববিশেষের ক্রোড়ে জগন্নিধান-স্বরূপ শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিনেত্র জ্ঞান-দাতা শিব আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে শশিসম শুক্লবর্ণা ষড়বদনা বিদ্যা-মুদ্রা-কপাল-ডমরু-জপবটি-বরাভয় শর-চাপাঙ্কুশ-পাশ-পঙ্কজ-লসিতা দ্বাদশভুজা হাকিনী নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা।

আজ্ঞাচক্রের উপরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মিলন স্থান। এই স্থানের নাম ত্রিকুট বা ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণীর ঊর্দ্ধে সুষুম্না মুখের নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল আছে। অর্দ্ধচন্দ্রের উপরে তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ একটী বিন্দু আছে। ঐ বিন্দুর উপরি ঊর্দ্ধাধোভাবে দণ্ডাকার নাদ আছে। দেখিতে ঠিক যেন একটী তেজোরেখা দণ্ডায়মান। ইহার উপরে

শ্বেতবর্ণ একটী ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। তন্মধ্যে শক্তিরূপ শিবাকার হকারার্দ্ধ আছে। এই স্থানে বায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার অন্যান্য বিষয় প্রণবতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এই আজ্ঞাপদ্মের আর একটী নাম **জ্ঞানপদ্ম**। পরমাত্মা ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ইচ্ছা তাঁহার শক্তি। এখানে প্রদীপ্তশিখারূপিণী আত্ম জ্যোতিঃ সুপীত স্বর্ণরেণুর ন্যায় বিরাজমান। এই স্থানে যে জ্যোতির্দ্দর্শন হয়, তাহাই সাধকের **আত্মপ্রতিবিম্ব**। এই পদ্ম ধ্যান করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ দর্শন ঘটিলে যোগের চরম ফল অর্থাৎ প্রকৃত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম—ললনাচক্র

তালুমূলে রক্তবর্ণ চৌষট্টিদলবিশিষ্ট **ললনাচক্র** অবস্থিত। এই পদ্মে **অহংতত্ত্বের** স্থান। এখানে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্ভ্রম, উর্ম্মি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশটী বৃত্তি এবং অমৃতস্থালী আছে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে উন্মাদ, জ্বর, পিত্তাদি জনিত দাহ, শূলাদি বেদনা এবং শিরঃপীড়া ও শরীরের জড়তা নষ্ট হয়।

অষ্টম—গুরুচক্র

—**()**—

ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্বেতবর্ণ শতদলবিশিষ্ট অষ্টমপদ্ম অবস্থিত। এই পদ্মের কর্ণিকায় ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের তিন কোণে যথাক্রমে হ, ল, ক্ষ, এই তিন বর্ণ রহিয়াছে। তাদ্ভিন্ন তিন দিকে সমুদয় মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলকে যোনিপীঠ ও শক্তিমণ্ডল কহে। ঐ শক্তিমণ্ডল মধ্যে তেজোময় কামকলা-মূর্ত্তি। মস্তকে তেজোময় একটী বিন্দু আছে। তাহার উপর দণ্ডাকার তেজোময় নাদ রহিয়াছে।

ঐ নাদোপরি নির্ধূম অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ আছে। তাহার উপরে হংসপক্ষীর শয্যাকার তেজোময় পীঠ। তদুপরি একটী শ্বেতহংস; এই হংসের শরীর জ্ঞানময়, দুই পক্ষ আগম ও নিগম। চরণ দুইটী শিবশক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ এবং নেত্র ও কণ্ঠ কামকলারূপ। এই হংসই গুরুদেবের পাদপীঠস্বরূপ।

ঐ হংসের উপর শ্বেতবর্ণ বাগ্‌ভব বীজ (গুরুবীজ) ঐং আছে। তাহার পার্শ্বে তদবীজপ্রতিপাদ্য গুরুদেব আছেন। তাঁহার শ্বেত বর্ণ এবং কোটিসূর্য্যাংশুতুল্য তেজঃপুঞ্জ। তাঁহার দুই হাত—এক হস্তে বর ও অন্য হস্তে অভয় শোভা পাইতেছে। শ্বেতমালা ও শ্বেত গন্ধ ধারণ এবং শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া হাস্যবদনে, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাঁহার বামক্রোড়ে রক্তবসনপরিধানা সর্ব্বভূষণভূষিতা তরুণ অরুণসদৃশ রক্তবর্ণা গুরুপত্নী বিরাজিতা। তিনি বামকরে একটী পদ্ম ধারণ ও দক্ষিণ করে শ্রীগুরুকলেবর বেষ্টন করিয়া উপবিষ্টা আছেন।

শ্রীগুরু ও গুরুপত্নীর মস্তকোপরি সহস্রদল পদ্মটী ছত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

এই সহস্রদল পদ্মে হংসপীঠের উপর গুরুপাদুকা এবং সকলেরই গুরু আছেন। ইনিই অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এই পদ্মে উপরোক্ত প্রকারে সপত্নী গুরুদেবের ধ্যান করিতে হয়।

এই শতদল পদ্ম ধ্যান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ ও দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

নবম—সহস্রার

—•—

ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর মহাশূন্যে রক্তকিঞ্জল্ক শ্বেতবর্ণ সহস্রদলবিশিষ্ট নবম-চক্র **সহস্রার** অবস্থিত। সহস্রদল পদ্মের চারিদিকে পঞ্চাশ দল বিরাজিত এবং উপর্য্যুপরি কুড়ি স্তরে সজ্জিত। প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশ দলে পঞ্চাশ মাতৃকা বর্ণ আছে।

সহস্রদলকমল-কর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রিকোণ চন্দ্রমণ্ডল আছে। তাহার অন্য নাম শক্তি মণ্ডল। এই শক্তি মণ্ডলের তিন কোণে যথাক্রমে হ, ল, ক্ষ, এই তিন বর্ণ আছে এবং তিন দিকে সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

ঐ শক্তিমণ্ডল মধ্যে তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডল বিশেষ আছে। তদুপরি মধ্যাহ্নকালীন কোটীসূর্য্যস্বরূপ তেজঃপুঞ্জ একটী **বিন্দু** আছে; তাহা বিশুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ শ্বেতবর্ণ। এই বিন্দুই **পরমশিব** নামে

জগদুৎপত্তি-পালন-নাশকরণশীল পরমেশ্বর। ইনিই অজ্ঞান তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মা। ইঁহাকেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সাধন বলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করাকে **ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার** বলে।

'পরমশিব ঐ বিন্দু সতত গলিত সুধা স্বরূপ। ইহার মধ্যে সমস্ত সুধার আধার গোমূত্রবর্ণা **অমা** নামক কলা আছে। ইনিই আনন্দ ভৈরবী। ইহার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার **নির্ব্বাণ কামকলা** আছেন। এই নির্ব্বাণ কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা। তন্মধ্যে তেজোরূপ পরম নির্ব্বাণ শক্তি—তৎপরে **নিরাকার মহাশূন্য**।

এই সহস্রদল পদ্মে কল্পতরু আছে। তন্মূলে চতুর্দ্বারসংযুক্ত জ্যোতির্ম্মন্দির; তাহার মধ্যে পঞ্চদশ অক্ষরাত্মিকা বেদিকা। তদুপরি রত্নসিংহাসনে চণকাকার মহাকালী ও মহারুদ্র আছেন; তাহা মহাজ্যোতিঃময়। ইঁহারই নাম চিন্তামণিগৃহে মায়াচ্ছাদিত **পরমাত্মা**।

এই সহস্রদলপদ্ম ধ্যান করিলে জগদীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে কামকলাতত্ত্ব জানা আবশ্যক। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেব ভক্ত ও পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি ব্যতীত

কামকলা-তত্ত্ব

—*—

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; তাই সাধারণ পাঠকগণের নিকট সে গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই

পুস্তকে কামকলা বলিয়া যে যে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে ত্রিকোণাকার ভাবিয়া লইবেন। প্রোক্ত নয় চক্র ব্যতীত মনশ্চক্র, সোম-চক্র প্রভৃতি আরও অনেক গুপ্ত চক্র আছে; এবং পূর্ব্বোল্লিখিত নয়-চক্রের প্রত্যেক চক্রের নীচে একটী করিয়া প্রস্ফুটিত উর্দ্ধমুখ চক্র আছে। বাহুল্যভয়ে এবং মুদ্রা' অভাবে গ্রন্থখানি অমুদ্রিত থাকিবে এই চিন্তায় সম্যকৃতত্ত্ব বিশদ্ বর্ণনা করিতে পারিলাম না। তবে যে পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল, তাহাই সাধকগণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। প্রোক্ত নবচক্রে ধ্যানকালে সাধকগণের একটী

বিশেষ কথা

—※—

জানা আবশ্যক। পদ্মগুলি সর্ব্বতোমুখী; কিন্তু যাঁহারা ভোগী, অর্থাৎ ফল কামনা করেন, তাঁহারা পদ্ম সমুদয় অধোমুখী চিন্তা করিবেন আর যাঁহারা যোগী অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা উর্দ্ধমুখ চিন্তা করিবেন। এইরূপ ভাবভেদে উর্দ্ধ বা অধোমুখ চিন্তা করিবেন। আর পদ্ম সমুদয় অতি সূক্ষ্ম—ভাবনা করা যায় না বলিয়া চতুরঙ্গুলি কল্পনা করিয়া চিন্তা করিতে হয়

ষোড়শাধারং

পাদাঙ্গুষ্ঠৌ চ গুল্‌ফৌ চ * * *।
পায়ুমূলং তথা পশ্চাৎ দেহমধ্যঞ্চ মেঢ্রকং ॥
নাভিশ্চ হৃদয়ং গার্গি কণ্ঠকূপস্তথৈব চ।
তালুমূলঞ্চ নাসায়া মূলং চাক্ষোশ্চ মণ্ডলে।
ভ্রুবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ মূর্দ্ধা চ মুনিপুঙ্গবে ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

প্রথম—দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ, দ্বিতীয়—পাদগুল্‌ফ, তৃতীয়—গুহ্যদেশ, চতুর্থ—লিঙ্গমূল, পঞ্চম নাভিমণ্ডল, ষষ্ঠ—হৃদয়, সপ্তম—কণ্ঠকূপ, অষ্টম—জিহ্বাগ্র, নবম—দন্তাধার, দশম—তালুমূল, একাদশ—নাসাগ্রভাগ, দ্বাদশ—ভ্রূমধ্য, ত্রয়োদশ—নেত্রাধার, চতুর্দ্দশ—ললাট, পঞ্চদশ—মূর্দ্ধা ও ষোড়শ—সহস্রার, এই ষোলটী আধার। ইহার এক এক স্থানে ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্ঠানে লয়যোগ সাধন হয়। ক্রিয়া কৌশল সাধনকল্পে লিখিত হইল।

ত্রিলক্ষ্যং

আদিলক্ষ্যঃ স্বয়ম্ভূশ্চ দ্বিতীয়ং বাণসংজ্ঞকম্।
ইতরং তৎপরে দেবি জ্যোতারূপং সদা ভজ ॥

স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ এই তিন লিঙ্গই ত্রিলক্ষ্য। এই লিঙ্গত্রয় যথাক্রমে মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রে অধিষ্ঠিত আছেন।

ব্যোমপঞ্চকং

—※—

আকাশন্তু মহাকাশং পরাকাশং পরাৎপরম্।
তত্ত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণম্॥

আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ এই পঞ্চব্যোম। পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ তত্ত্বকে পঞ্চাকাশ বলে। এই পঞ্চাকাশের বাসস্থান শরীর তত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থিত্রয়

—※—

ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি এই তিনটীকে গ্রন্থিত্রয় বলে। মণিপুর-পদ্ম ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতপদ্ম বিষ্ণুগ্রন্থি ও আজ্ঞাপদ্ম রুদ্রগ্রন্থি নামে অভিহিত।

শক্তিত্রয়

উর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্ গুদঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনম্॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

কণ্ঠদেশে—বিশুদ্ধচক্রে উর্দ্ধশক্তি, গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রে অধঃশক্তি ও নাভিদেশে—মণিপুর চক্রে মধ্যশক্তি বিরাজিতা আছেন। ইহাদিগকে নামান্তরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অথবা গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী বলে। এই শক্তিত্রয়ই প্রণবের জ্যোতিঃ স্বরূপ। যথা—

ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি।

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৪

মূলা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে তিন গুণে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন।

সর্ব্বার্থ-সাধিনী, সর্ব্বশক্তি-প্রদায়িনী, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী, শম্ভুসীমন্তিনী শিবানীর শক্তিতে সুধী সাধকগণের সাধন-সরণি সুগম সাধনোদ্দেশে ও সুবিধার্থে সর্ব্বাগ্রে সানন্দে সাধ্যমত সম্যক্ শরীর-তত্ত্ব সুশৃঙ্খলে ও সুন্দর ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া অধুনা

যোগ-তত্ত্ব

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। **যোগ** কাহাকে বলে ?—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

— যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ। তদ্ভিন্ন দেহকে দৃঢ়করণের নাম যোগ, মনকে সুস্থির করণের নাম যোগ, চিত্তকে একতান করার নাম যোগ, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ করার নাম যোগ, নাদ ও বিন্দু একত্র করার নাম যোগ, প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করার নাম যোগ, সহস্রারস্থিত পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগের নাম যোগ। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার যোগের কথা উক্ত হইয়াছে। যথা—সাংখ্যযোগ, ক্রিয়াযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ, বিবেকযোগ, বিভূতিযোগ, প্রকৃতি-পুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, মোক্ষযোগ ও রাজাধিরাজযোগ। ফলে ভাব-ব্যাপক কর্ম্মমাত্রকেই যোগ বলা যায়। এবম্প্রকার বহুবিধ যোগ ঐ এক প্রকার যোগেরই অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলনেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। বস্তুতঃ যোগ একই প্রকার বই দুই প্রকার নহে ; তবে ঐ একই প্রকার যোগ সাধনের সোপানীভূত যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে, সেই সমস্তই স্থানবিশেষে—উপদেশবিশেষে এক একটা স্বতন্ত্র যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধনই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হয়। তাহার সহজ উপায় বক্ষ্যমাণ যোগের প্রণালী। যোগের আটটী অঙ্গ আছে। যোগসাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে

যোগের আটটী অঙ্গ

সাধন করিতে হইবে। সাধন অর্থে অভ্যাস; যোগের আটটী অঙ্গ যথা—

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৪৫

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। যোগ সাধন করিতে হইলে অর্থাৎ পূর্ণমানুষ হইয়া স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই অষ্টযোগাঙ্গের সাধনা অর্থাৎ অভ্যাস করিতে হয়। প্রথমতঃ

যম

কাহাকে বলে এবং তাহার সাধন প্রণালী জানা আবশ্যক।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ ৩০

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইগুলিকে যম বলে।

অহিংসা,—

মনোবাক্‌কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নং অহিংসা ॥

মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা সর্ব্বভূতের পীড়া উপস্থিত না করার নাম অহিংসা। যখন মনোমধ্যে হিংসার ছায়াপাত মাত্র না হইবে, তখনই অহিংসা সাধন হইবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৫

যখন হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অপরে তাঁহার নিকট আপন আপন স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ চিত্ত হিংসাশূন্য হইলে সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও তাঁহার হিংসা করিবে না।

সত্য,—

পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসো যথার্থত্বং সত্যম্‌।

পরহিতের জন্য বাক্য ও মনের যে যথার্থ ভাব, তাহাকে সত্য বলে। সরল চিত্তে অপকট বাক্য, যাহাতে দুরভিসন্ধির লেশমাত্র নাই, তাহাই সত্যভাষণ। সত্য স্বভাবগত হইলে আর মনে যখন মিথ্যার উদয় হইবে না, তখনই সত্যসাধন হইবে।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্‌।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৬

অন্তরে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন ক্রিয়া না করিয়াই তাহার ফললাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বাক্য সিদ্ধ হয়।

অস্তেয়,—

পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোঽস্তেয়ম্ ।

পরের দ্রব্য অপহরণ পরিত্যাগ করার নাম **অস্তেয়।** পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা মাত্র যখন মনে উদিত হইবে না, তখনই অস্তেয় সাধন হইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৭

অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার নিকট সমস্ত রত্ন আপনা আপনি আসিয়া থাকে। অর্থাৎ অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনই ধনরত্নের অভাব হয় না।

ব্রহ্মচর্য্য—

বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্ ।

শরীরস্থ বীর্য্যকে অবিচলিত ও অবিকৃত অবস্থায় ধারণ করার নাম **ব্রহ্মচর্য্য।** শুক্রই ব্রহ্ম; সুতরাং সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় মৈথুন বর্জ্জন করিয়া বীর্য্যধারণ করা কর্ত্তব্য। অষ্টবিধ মৈথুন পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

—সাধন-পাদ, পাতঞ্জল, ৩৮

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্য লাভ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেহে ব্রহ্মণ্যদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।*

* আমাদের "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" নামক গ্রন্থে এতদ্বিষয় সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায় বর্ণিত আছে।

অপরিগ্রহ,

দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকারোঽপরিগ্রহঃ।

দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাধন পরিত্যাগ করার নাম **অপরিগ্রহ**। স্থূল কথা লোভ পরিত্যাগ করাকেই **অপরিগ্রহ** বলা যায়। যখন 'ইহা চাই, উহা চাই' মনেই হইবে না, তখনই অপরিগ্রহ সাধন হইবে।

অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং জন্মকথন্তাসংবোধঃ।

— পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৯

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

এই সমস্তগুলির সাধনা হইলে যমসাধনা হইল। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে সকল দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগকেই এই যমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। ইহা না করিলে মানুষ ও পশুতে কিছু প্রভেদ থাকে না। এখন

নিয়ম

কাহাকে বলে ও তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, অবগত হইতে হইবে।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩২

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার নাম নিয়ম। ইহাদিগকে অভ্যাসের নাম **নিয়মসাধন**।

শৌচ,—

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জালাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরং ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

শরীর ও মনের মালিন্য দূর করিবার নাম **শৌচ**। তাই বলিয়া সাবান, ফুলেলা বা এসেন্স প্রভৃতি বিলাসিতার বাহার নহে; গোময়, মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের এবং দয়াদি সদ্গুণ দ্বারা মনের মালিন্য দূর করিতে হয়।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪০

শুচি থাকায় নিজ দেহকে অশুচি বোধে তৎপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং পরসঙ্গ করিতেও ঘৃণা জন্মায়। তখন অবধূত গীতার এই মহান্ বাক্য মনে পড়ে। যথা—

বিষ্ঠাদিনরকং ঘোরং ভগং চ পরিনির্ম্মিতম্।
কিমু পশ্যসি রে চিত্তং কথং তত্রৈব ধাবসি ॥

—৮।১৪

সন্তোষ,—

যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি।
বা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণং ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

প্রতিদিন যাহা কিছু লাভে মনে সন্তুষ্টরূপ বুদ্ধি থাকাকেই সন্তোষ কহে। স্থূল কথায়—দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করার নাম **সন্তোষ**।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪২

সন্তোষ সিদ্ধ হইলে অনুত্তম সুখ লাভ হয়। সে সুখ অনির্ব্বচনীয়, বিষয়-নিরপেক্ষ সুখ অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত এই সুখের কোন সম্বন্ধ নাই।

তপস্যা ঃ—

বিধিনোক্তেন মার্গেন কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তপস্যাং তপ উত্তমং ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

বেদবিধানানুসারে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতোপবাস দ্বারা শরীর শুষ্ক করাকে উত্তম তপস্যা বলে। তপস্যা না করিলে যোগসিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে না। যথা—

নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।

তপস্যা সাধন করিলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যথা—

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৩

তপস্যা দ্বারা শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ দেহশুদ্ধি হইলে ইচ্ছানুসারে দেহকে সূক্ষ্ম বা স্থূল করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হইলে সূক্ষ্ম দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদগ্রহণ ও স্পর্শ ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় সকল গ্রহণে শক্তি জন্মে।

স্বাধ্যায় ;—

স্বাধ্যায়ঃ প্রণবশ্রীরুদ্রপুরুষসূক্তাদিমন্ত্রাণাং জপঃ মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নঞ্চ।

প্রণব ও সূক্তমন্ত্রাদি অর্থচিন্তা পূর্ব্বক জপ এবং বেদ ও ভক্তিশাস্ত্রাদি ভক্তি পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাকে **স্বাধ্যায়** বলে।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রযোগঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৪

স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরপ্রণিধান,—

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।

—পাতঞ্জল-দর্শন

ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনার নাম **ঈশ্বরপ্রণিধান**।

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৫

ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা যোগের চরম ফল সমাধি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা যত শীঘ্র চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, অন্য প্রকারে তত শীঘ্র কথনই কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কেননা তাঁহার চিন্তায় তাঁহার ভাস্বর জ্যোতিঃ হৃদয়ে আপতিত হইয়া সমস্ত মলরাশি বিদূরিত করিয়া দেয়। এক্ষণে যোগের তৃতীয়াঙ্গ

আসন

কিরূপে সাধন করিতে হয় তাহা জানিতে হইবে।

স্থিরসুখমাসনম্ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৬

শরীর না পড়ে, না টলে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ না জন্মে, এইরূপ ভাবে সুখে উপবেশন করিবার নাম আসন। যোগশাস্ত্রে বহুপ্রকার আসনের কথা উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটী আসন ও সাধনকৌশল "সাধনকল্পে" প্রদর্শিত হইল।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ।

—সাধন-পাদ পাতঞ্জল, ৪৮

আসন অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসকল যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে পারে না। আসন অভ্যাস হইলে যোগের শ্রেষ্ঠ ও গুরুতর বিষয় চতুর্থাঙ্গ

অভ্যাস করিতে হয়। আগে দেখা যাউক, প্রাণায়াম কাহাকে বলে

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৯

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিধৃত করার নাম **প্রাণায়াম**। তদ্ভিন্ন প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগকেও প্রাণায়াম বলে। যথা—

প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুম্ভকৈঃ॥

— যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।২

প্রাণায়াম বলিলে আমরা সাধারণতঃ রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই বুঝিয়া থাকি। বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া অভ্যন্তর অংশ পূরণ করাকে **পূরক**, জলপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় অভ্যন্তরে বায়ু ধারণ করাকে **কুম্ভক** এবং ঐ ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করাকে **রেচক** বলে। প্রথমে হস্তের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ু রোধ করিয়া প্রণব (ওঁ) অথবা আপন আপন ইষ্টমন্ত্র ষোড়শ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ু রোধ করতঃ ওঁ বা মূলমন্ত্র চৌষট্টি বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবেন; তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ নাসাপুট হইতে তুলিয়া লইয়া ওঁ বা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু রেচন করিবেন। এই ভাবে পুনরায় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ শ্বাসত্যাগের পর ঐ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই ওঁ বা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরক এবং উভয় নাসাপুট ধরিয়া কুম্ভক, শেষে বাম নাসায় রেচন করিবেন। অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথম বারের ন্যায় নাসাধারণ ক্রমানুসারে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবেন। বাম হস্তের কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিবেন।

প্রথম প্রথম প্রাগুক্ত সংখ্যায় প্রাণায়াম করিতে হইলে, ৮।৩২।১৬ অথবা ৪।১৬।৮ বার জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বা যাঁহাদের মন্ত্র জপের সুবিধা নাই, তাঁহারা এক, দুই এরূপ সংখ্যার দ্বারাই প্রাণায়াম করিবেন; নতুবা ফল হইবে না। কেন না তালে তালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর সাবধান ;— যেন সবেগে রেচক বা পূরক না হয়। রেচকের সময় বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ অল্প বেগে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু যেন নিঃশ্বাসবেগে উড়িয়া না যায়। প্রাণায়াম-কালীন সুখাসনে উপবেশন করিয়া মেরুদণ্ড, ঘাড়, মস্তক সোজা ভাবে রাখিতে হয় এবং ভ্রূর মাঝারে দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহাকে সহিত-কুম্ভক বলে। যোগশাস্ত্রে অষ্ট প্রকার কুম্ভকের কথা উল্লেখ আছে। যথা—

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকা॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১৯৫

সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী এই আট প্রকার কুম্ভক।* ইহাদের বিশেষ বিবরণ মুখে বলিয়া, কৌশল দেখাইয়া না দিলে সাধারণের কোন উপকার দর্শিবে না, তাই ক্ষান্ত রহিলাম। বিশেষতঃ তঙ্কার অভাব; তঙ্কা থাকিলে শঙ্কা ছিল না, ডঙ্কা মারিয়া এ লঙ্কা সে লঙ্কা লিখিতে পারিতাম।

* মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে উক্ত অষ্ট প্রকার প্রাণায়ামের সাধন-পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ ৫২

প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে মোহরূপ আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়; প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বরোগমুক্ত হয়েন; কিন্তু অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রমে নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হয়।' যথা—

প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ ।
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বরোগসমুদ্ভবঃ ॥
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনা ।
ভবন্তি বিবিধা দোষাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥

—সিদ্ধিযোগ

নিয়মমত প্রাণায়াম করিলে সর্ব্বরোগ ক্ষয় হয়; কিন্তু অনিয়ম ও বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মস্তকের পীড়াদি নানা রোগ সমুদ্ভব হইয়া থাকে ।

প্রাণায়াম রীতিমত অভ্যাস হইলে যোগের পঞ্চমাঙ্গ

প্রত্যাহার

সাধন করিতে হয়। প্রাণায়াম অপেক্ষা প্রত্যাহার আরও কঠিন ব্যাপার। যথা—

স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ ৫৪

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতাবস্থায় চিত্তের অনুগত হইয়া থাকার নাম **প্রত্যাহার।** ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হইয়া থাকে, সেই বিষয় হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করাকে প্রত্যাহার বলে।

ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।

---পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৫৫

প্রত্যাহার সাধনায় ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়। প্রত্যাহারপরায়ণ যোগী প্রকৃতিকে চিত্তের বশে আনয়ন করিয়া পরম স্থৈর্য্য লাভ করিবেন, ইহাতেই বহিঃপ্রকৃতি বশীভূতা হইবেন। প্রত্যাহারের পরে যোগের ষষ্ঠাঙ্গ

ধারণা

—*—

সাধন করিতে হয়। ধারণা কাহাকে বলে?

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

— পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ১

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত

ষোড়শাধারে কিম্বা কোন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম **ধারণা**।

বিষয়ান্তর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যে কোন একটী বস্তুতে চিত্তকে আরোপণ করতঃ বাঁধিবার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ চিত্ত একমুখী হইবে। ধারণা স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহাই

ধ্যান

—*—
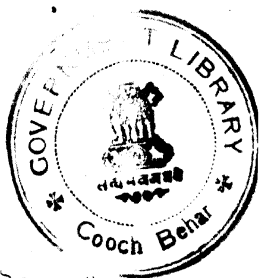
নামক যোগের সপ্তমাঙ্গে পরিণত হইবে। যথা—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

—পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ২

ধারণা দ্বারা ধারণীয় পদার্থে চিত্তের যে একাগ্রতা ভাব জন্মে, তাহার নাম **ধ্যান**। চিত্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ চিন্তা করাকে ধ্যান বলে। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার।

পরব্রহ্মের কিম্বা সহস্রারস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করার নাম **নির্গুণ ধ্যান**।

সূর্য্য, গণপতি, বিষ্ণু, শিব ও আত্মা প্রকৃতি কিম্বা ষট্‌চক্রস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ধ্যান করার নাম **সগুণ ধ্যান**।

সগুণ ও নির্গুণ ধ্যান ভিন্ন জ্যোতিঃ ধ্যান অনেকে করিয়া থাকেন। ধ্যানের পরিপক্কাবস্থাই

সমাধি

ধ্যান গাঢ় হইলে, ধ্যেয়বস্তু ও আমি—এরূপ জ্ঞান থাকে না। চিত্ত তখন ধ্যেয় বস্তুতেই বিনিবেশিত ; স্থূল কথায় তাহাতে লীন। সেই লয় অবস্থাকেই সমাধি বলে।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।

—পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ৩

কেবল সেই পদার্থ (স্বরূপ আত্মা) আছেন, এইরূপ আভাস জ্ঞান মাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, চিত্তের ধ্যেয় বস্তুতে এইরূপ যে তন্ময়তা, তাহার নাম **সমাধি**। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থাকে সমাধি বলে। যথা—

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

—দত্তাত্রেয় সংহিতা

বেদান্তমতে সমাধি দুই প্রকার। যথা সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান জ্ঞেয়, এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম **সবিকল্প সমাধি**। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাই **সম্প্রজ্ঞাত** সমাধি নামে উক্ত আছে।

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম **নির্ব্বিকল্প সমাধি**। পাতঞ্জলি মতে ইহাই **অসম্প্রজ্ঞাত** সমাধি।

এই বক্ষ্যমাণ অষ্টাঙ্গ যোগের প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পর পর এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, মরজগতে অমরত্ব লাভ হয়। অধিক কি, কোন প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া ইহার যমনিয়ম পালনেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে। অষ্টাঙ্গ সাধন করিলে আর চাই কি?—মানবজন্মধারণ সার্থক! কিন্তু ইহা যেমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তেমনি কঠিন ও গুরুতর ব্যাপার। সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই সিদ্ধযোগিগণ এই মূল অষ্টাঙ্গযোগ হইতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সহজ সুখসাধ্য যোগের কৌশল বাহির করিয়াছেন। আমি সেই কারণে প্রাগুক্ত অষ্টাঙ্গযোগের বিশেষ বিবরণ বিশদভাবে ব্যক্ত না করিয়া এ-ক্ষেপে সংক্ষেপে সারিলাম।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহারাও তিনজনে যোগ সাধন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে পরমযোগী সদাশিবের পঞ্চম আম্নায়ে দশবিধ যোগের কথা ব্যক্ত আছে। তন্মধ্যে

চারিপ্রকার যোগ

—*()*—

প্রধানতঃ প্রচলিত যথা—

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কং।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ॥

—শিবসংহিতা; ৫।১৭

মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ এই চারি প্রকার যোগ যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন

মন্ত্রযোগ

—*—

সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ একপ্রকার অসম্ভব।

মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।

মন্ত্রজপ করিতে করিতে যে মনোলয় হয়, তাহার নাম **মন্ত্রযোগ**। মন্ত্রজপ-রহস্য ও জপসমর্পণ ব্যতিরেকে মন্ত্রজপ সিদ্ধ হয় না। বিশেষ— সুপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব। গুরু বা উপদেশের অভাব না হইলেও বহুজন্ম না খাটিলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধি হয় না। এজন্য সর্ব্বপ্রকার সাধনের মধ্যে মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

মন্ত্রযোগশ্চ যঃ প্রোক্তো যোগানামধমঃ স্মৃতঃ।
অল্পবুদ্ধিরিমং যোগং সেবতে সাধকাধমঃ॥

—দত্তাত্রেয়সংহিতা

যোগ সমূহের মধ্যে মন্ত্রযোগ অতি অধম; অধম অধিকারী এবং অল্পবুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্ত্রযোগ সাধনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়

হঠযোগ

—*—

সাধন আজকাল একরূপ সাধ্যাতীত। হঠযোগের লক্ষণে উক্ত আছে;—

হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে ॥

—সিদ্ধ-সিদ্ধান্তপদ্ধতি

হ শব্দে সূর্য্য এবং ঠ শব্দে চন্দ্র, হঠ-শব্দে চন্দ্র সূর্য্যের একত্র সংযোগ। অপান বায়ুর নাম চন্দ্র এবং প্রাণ বায়ুর নাম সূর্য্য; অতএব প্রাণ ও অপান বায়ুর একত্র সংযোগের নাম হঠযোগ। হঠযোগাদি সাধনের উপযুক্ত অবস্থা ও শরীর বাঙ্গালীর অতি কম। আর

রাজযোগ

—✻—

দ্বৈতভাববর্জ্জিত হইলেও সংসারী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ রাজযোগের ক্রিয়াদি মুখে বলিয়া বুঝাইয়া না দিলে পুস্তক পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসম্ভব। এই জন্য স্বল্পজীবী নিরন্ন কলির মানবগণের জন্য সহজ ও সুখসাধ্য

লয়যোগ

—✻—

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য যোগ ব্যতীত লয়যোগের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকেই সহজে ও শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। আমিও সেই সদ্যপ্রত্যক্ষ ফলপ্রদ লয়যোগ সাধারণে প্রকাশ মানসে এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি।

লয়যোগ অনন্ত প্রকার। বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে যত প্রকার পদার্থের সম্ভব হইতে পারে, তৎসমস্তেই লয়যোগ সাধনা হইতে পারে। অর্থাৎ চিত্তকে যে কোন পদার্থের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে একতান হইতে পারিলেই লয়যোগ সিদ্ধ হয়।

সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষলয়াবধানানি বসন্তি লোকে।

—যোগতারাবলী

জগতে সদাশিব-কথিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকার লয়যোগ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সাধারণতঃ যোগিগণ চারি প্রকার লয়যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। চারি প্রকার লয়যোগ, যথা

শাম্ভব্যা চৈব ভ্রামর্য্যা খেচর্য্যা যোনিমুদ্রয়া।
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা

শাম্ভবীমুদ্রা দ্বারা ধ্যান, খেচরীমুদ্রা দ্বারা রসাস্বাদন, ভ্রামরী কুম্ভক দ্বারা নাদ শ্রবণ ও যোনিমুদ্রা দ্বারা আনন্দ ভোগ এই চারি প্রকার উপায় দ্বারাই লয়যোগ সিদ্ধি হয়।

এই চারি প্রকার লয়যোগের আরও সহজ কৌশল সিদ্ধযোগিগণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা লয়যোগের মধ্যে নাদানুসন্ধান, আত্মজ্যোতিঃ দর্শন ও কুণ্ডলিনী উত্থাপন এই তিন প্রকার প্রক্রিয়া শ্রেষ্ঠ ও সুখসাধ্য বলিয়া ব্যক্ত করেন। ইহার মধ্যে কুণ্ডলিনী উত্থাপন কিছু কঠিন কার্য্য। ক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক মূলাধার সঙ্কোচ করিয়া জাগরিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপন করিতে হয়। চিনে জোঁক যেমন একটি তৃণ হইতে অপর একটী তৃণ অবলম্বন করে, তদ্রূপ কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে ক্রমে

ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠাইয়া শেষে সহস্রারে লইয়া পরমশিবের সহিত সংযোগ করাইতে হয়। কিন্তু কিরূপে মূলাধার সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং কিরূপেই বা অতীব কঠিন গ্রন্থিত্রয় ভেদ করিতে হইবে, তাহা হাতে হাতে দেখাইয়া না দিলে, লিখিয়া বুঝাইবার মত ভাষা নাই। সুতরাং অকারণ কুণ্ডলিনী উত্থাপন ক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। যদি কাহারও তাহার ক্রম জানিবার ইচ্ছা হয়, আমার নিকট আসিলে সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।* কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট কদাচ প্রকাশ করিব না।

লয়যোগের মধ্যে নাদানুসন্ধান ও আত্মজ্যোতিঃ দর্শন ক্রিয়া অতি সহজ ও সুখসাধ্য। এই দুই ক্রিয়ার সাধনকৌশল প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের উপকার সাধনই এই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

সাধুসন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থগণের মধ্যে পশ্চাদুক্ত সঙ্কেত অতি অল্প লোকেও জানেন কিনা সন্দেহ। নাদানুসন্ধান ও আত্মজ্যোতির্দ্দর্শন এই দুইটী ক্রিয়ার মধ্যে এক একটীর দুই তিন প্রকার কৌশল লিখিত হইল। যেটী যাঁহার মনোমত ও সহজ বলিয়া বোধ হইবে, সেইটী তিনি অনুষ্ঠান করিতে পারেন। সদ্যঃ প্রত্যক্ষফলপ্রদ ও যাহাতে আমি ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই "সাধনকল্পে" বর্ণিত হইল। ইহার যে কোন একটী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ মনে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেন আত্মারও মুক্তি হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের লোকের যে অবস্থা, তাহাতে প্রাগুক্ত ক্রিয়ার অভ্যাসও অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে সন্দেহ নাই; সেইজন্য তাঁহাদের জন্য সাধনকল্পের প্রথমেই লয়-সঙ্কেত লিখিলাম। যে কয়টী

* মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে কুণ্ডলিনী উত্থাপনের সাধনোপায় বর্ণিত হইয়াছে।

লয়-সঙ্কেত লিখিত হইল, তাহার মধ্যে কোন এক প্রকার অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত লয় হয়। সাধকগণের মধ্যে যাঁহার যেরূপ সুবিধা হইবে, তিনি সেইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া মনোলয় করিবেন।

জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ।

জপ অপেক্ষা ধ্যানে শতগুণ অধিক ফল। ধ্যানাপেক্ষা শতগুণ অধিক লয়যোগে। অতএব জপাদি অপেক্ষা সকলেরই কোন প্রকার লয়যোগ সাধন কর্ত্তব্য।

যোগাভ্যাসে আত্মার মুক্তি ব্যতীত অনেক আশ্চর্য্য ও অমানুষী ক্ষমতা লাভ হয়। কিন্তু বিভূতিলাভ যোগ-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, সেইজন্য আমিও এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা করিলাম না। বিনা চেষ্টায় বিভূতি আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইবেন। বিভূতিতে মুগ্ধ হইলে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

আজি ইউরোপখণ্ডে এই যোগ সাধনা লইয়া বিশেষ আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। পাশ্চাত্য নরনারীগণ আর্য্যশাস্ত্রোক্ত যোগযোগাঙ্গ শিক্ষা করিয়া থিয়সফিষ্ট নাম ধারণ করিতেছেন। মেস্‌মেরিজম্, হিপ্‌নোটিজম্, ক্লেয়ারভয়েন্স, সাইকোপ্যাথি ও মেণ্টাল্ টেলিগ্রাফী প্রভৃতি বিদ্যা শিখিয়া জগতের নরনারীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়া দিতেছেন। আমরা আমাদের ঘরের পুঁথি রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করতঃ ঘরে তুলিয়া ইন্দুর, আরশুলা ও কীটাদির আহার-বিহারের সুবন্দোবস্ত ও "আমাদের অনেক আছে" বলিয়া গৌরব করিতেছি। কিন্তু কি আছে, তাহায় অনুসন্ধান করি না বা সাধন করিয়া খাটাইয়া দেখি না। দোষ নিতান্ত আমাদের নহে। শাস্ত্রে যোগ-যোগাঙ্গের যে সকল বিষয় ও নিয়ম উক্ত

আছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও জটিল। কেহ জানিলেও তাহা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহা অতি

গুহ্যবিষয়
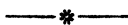
যোগ জটিল বা গুহ্য বিষয় নহে। টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ, আকাশের চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ পরিদর্শন, ফনোগ্রাফে সঙ্গীত শ্রবণ যেমন বাহ্য বিজ্ঞানের কাজ—যোগও সেইরূপ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কাজ। তবে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া প্রকাশ করেন না কেন? শাস্ত্রের নিষেধ আছে, যথা—

বেদান্তশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র সকল প্রকাশ্য সামান্য বেশ্যার ন্যায়; কিন্তু শিবোক্ত শাম্ভবী বিদ্যা কুলবধূতুল্য। অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহা গোপন রাখিবে—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই।

ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যোঽপ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ।

—শিববাক্যম্

পরশিষ্য, বিশেষতঃ অভক্ত জনের নিকট এই শাস্ত্র কদাচ প্রকাশ করিবে না। আরও কথিত আছে যে—

ইদং যোগরহস্যঞ্চ না বাচ্যং মূর্খসন্নিধৌ।

— যোগস্বরোদয়

যোগরহস্য মূর্খ সন্নিধানে বলিবে না। নিন্দুক, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, খল, তুষ্কৃতাচারী ও তামসিক ব্যক্তিগণের নিকট যোগরহস্য প্রকাশ করিতে নাই।

অভক্তে বঞ্চকে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে।
মনসাপি ন বক্তব্যং গুরুগুহ্যং কদাচন॥

ভক্তিহীন, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, পাষণ্ড ও নাস্তিক, এই সকল হেতুবাদীকে গুরু-কথিত গুহ্যবিষয় কখনও বলিবে না। এই সকল কারণে শাস্ত্রজ্ঞ যোগিগণ সাধারণের নিকট আত্ম-তত্ত্ব বিদ্যা প্রকাশ না করিয়া "গুহ্যবিষয়" বলিয়া গোপন করেন। কাহাকেও শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বিশেষরূপে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ নিষেধ সত্ত্বে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য এবং সকলের করণীয়, তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম। এতদনুসারে কার্য্য করলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। এখন সুধী সাধকগণ

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ

ওঁ শান্তিঃ
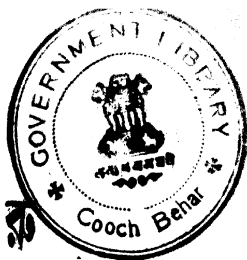
দ্বিতীয় অংশ

সাধন-কল্প

যোগীগুরু

দ্বিতীয় অংশ—সাধন-কল্প

সাধকগণের প্রতি উপদেশ

দুর্গাদেবি জগন্মাত র্জগদানন্দদায়িনি।
মহিষাসুরসংহন্ত্রি প্রণমামি নিরন্তরম্ ॥

মদন-মদ-দমন-মনোমোহিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভবানীর মৃত্যুপতিলাঞ্ছিত নরামরবাঞ্ছিত পদপঙ্কজে প্রণতিপুরঃসর সাধনকল্প আরম্ভ করিলাম।

যোগাভ্যাসকালে সাধকগণকে কতকগুলি নিয়ম সংযমের অধীন হইতে হয়। সাধারণ মানুষের মত চলিলে সাধন হয় না। যোগকল্পে অষ্টাঙ্গ যোগ বর্ণনাকালে যম ও নিয়মে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গৃহ-সংসারে সে নিয়ম পালন করা যায় না। পারিলেও গুণধর গ্রামবাসীর গুণে অচিরেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হইবে। সুতরাং ঘরকন্না করিতে হইলে, শিবত্ব ছাড়িয়া বাহে ষোল আনা জীবত্ব বজায় না রাখিলে চলে না। এরূপ অবস্থায় উপায় কি? ফোঁস ফোঁস কর, কামড়াইও না।

একটী রাস্তার পার্শ্বে একটী কুলাপানা চক্রধারী ভীষণ কেউটে সর্প বাস করিত। রাস্তা দিয়া লোক যাইতে দেখিলেই গর্জ্জন করিতে করিতে সবেগে ধাবিত হইয়া দংশন করিত। যাহাকে দংশন করিত, সে সেইখানেই পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। ক্রমশঃ সর্পের কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। কেহ সে রাস্তা দিয়া ভয়ে গমন করিত না। এইরূপে সেই রাস্তায় লোক যাতায়াত বন্ধ হইল।

একদিন একটী মহাপুরুষ ঐ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন; তাঁহাকে সর্পের কথা জানাইয়া ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে অনেকে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিতে লাগিলেন। সর্পের নিকটস্থ হইবা মাত্র সর্প গর্জ্জন করিতে করিতে দংশন মানসে ধাবিত হইল। মহাপুরুষ দণ্ডায়মান হইলেন; সর্প নিকটে আসিলে এক মুষ্টি ধূলা তদীয় গাত্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র সর্প শির নত করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন মহাপুরুষ জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বেটা! পূর্ব্বজন্মে এই হিংসার কারণে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিস্, তবুও হিংসা পরিত্যাগ করিতে পারিলি না?"

এই বাক্যে সর্পের দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল, সে নম্র ভাবে বলিল "প্রভো! আমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হইয়াছে; এখন উদ্ধারের উপায় কি?"

"সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ কর্" এই বলিয়া মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি সর্প শান্তভাব ধারণ করিল। দুই এক জন করিয়া সকলেই এ কথা জানিল। প্রথমতঃ ভয়ে ভয়ে সাবধানের সহিত লোকজন চলিতে লাগিল; বাস্তবিক সাপ আর কাহারও হিংসা করে না—পথে পড়িয়াই থাকে, পার্শ্ব দিয়া কেহ গমন করিলেও মাথা তুলিয়া দেখে না। সকলেরই সাহস হইল তখন কেহ প্রহার করে, কেহ লাঠি দ্বারা

দূরে ফেলিয়া দিয়া যায়। বালক বালিকাগণ লাঙ্গুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেড়ায়। তথাপি সর্প আর কাহাকেও হিংসা করে না। কিন্তু লোকের এইরূপ অত্যাচারে সে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ ফিরিলেন, সর্পকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এরূপ অবস্থা কেন ?" সর্প উত্তর করিল, "আপনার উপদেশে হিংসা ছাড়িয়া এ দশা ঘটিয়াছে।"

মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোকে হিংসা পরিত্যাগ করতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু গর্জ্জন করিতে নিষেধ করি নাই। তোমার প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে আসিলে সর্পের স্বভাবানুযায়ী ফোঁস্ ফোঁস্ করিও, কিন্তু কামড়াইও না।"

মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি নিকটে লোক দেখিলে পূর্ব্বভাব ধারণ করিত, কিন্তু কাহাকেও দংশন করিত না। পুনরায় পূর্ব্ব তেজ দর্শন করিয়া কেহ আর তাহার নিকটে ঘেঁসিত না।

আমিও তাই বলিতেছি, বাহিরে ষোল আনা জীবত্ব বজায় রাখ। কিন্তু মনে যেন ঠিক থাকে, কাহারও অনিষ্ট করিব না। মন পবিত্র থাকিলে বাহিরের কার্য্যে কিছু যাইবে আসিবে না।

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ ;
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈ র্ন চ পাতকৈঃ ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৪৫

অতএব মনকে দৃঢ় করিয়া সকল কার্য্য করা উচিত। যেন মনে থাকে, কেহ আমাকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করিলে, কেহ আমার কোন দ্রব্য চুরি করিলে, কেহ দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া আমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে আমার যেমন কষ্ট হয়, কাহারও প্রতি আমার দ্বারা

ঐ সকল কার্য্য হইলে সে ব্যক্তিও এইরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে। নিজ হৃদয়ের বেদনা অনুভব করিয়া পরের প্রতি ব্যবহার করিবে। যখন গলিতপত্র এবং বন্যজাত কটু-কষায় কন্দমূলফল খাইয়াও মানুষ জীবিত থাকে, তখন পরের প্রাণে কষ্ট দিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া উদরসাৎ করা কেন? প্রতিদিন যা' কিছু উপায়ে সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। ধনীর সঙ্গে অবস্থা তুলনা করিতে গিয়া কষ্ট পাই কেন? দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না। নির্ধন ব্যক্তি অনাহারীর কথা ভাবিয়া দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত থাকিবে, নিরাশ্রয় লোক দেখিয়া ভগ্ন-কুটিরে ছিন্ন মাদুরীতে শান্তিলাভ করিবে, শীতকালে জুতা সংগ্রহে অক্ষম হইলে আপনাকে ধিক্কার না দিয়া খঞ্জ ব্যক্তিকে স্মরণ করতঃ স্বীয় সবল পদের দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক নিজকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিবে। পুত্রহীন ব্যক্তি অসৎ পুত্রের পিতার দুর্দ্দশা মনে করিয়া সুখী হইবে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য করিয়া থাকেন। পুত্র নিধনে শোকে মুহ্যমান না হইয়া, গৃহ-দগ্ধ হইলে জ্ঞানশূন্য না হইয়া, বিষয়বিচ্যুত হইলে কাতরতা প্রকাশ না করিয়া ভাবা উচিত—ঐ পুত্র জীবিত থাকিলে হয়ত তাহার অসদ্ব্যবহারে আজীবন মর্ম্মপীড়া পাইতে হইত; গৃহ থাকিলে হয়ত গৃহস্থিত সর্প-দংশনে জীবন ত্যাগ করিতে হইত; বিষয় থাকিলে হয়ত ঐ বিষয় লোভে কেহ হত্যা করিত; যখন যে অবস্থায় থাকা যায়, তাহাতেই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করা কর্ত্তব্য। ক'দিনের জন্য ভবের বৈভব? যখন শৈশবের বিমল জোৎস্না দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যায়, যৌবনের বল বিক্রম জোয়ারের জল, প্রৌঢ়াবস্থা তিন দিনের খেলা সংসার পাতিতে না পাতিতে ফুরাইয়া যায়, "এ পর্য্যন্ত উচিত অবস্থায় জীবন কাটান হয় নাই" "এর মনে কষ্ট দিয়াছি," "তার সহিত এরূপ করা ভাল হয় নাই," যখন এই আক্ষেপ করিতে করিতে বার্দ্ধক্য কাটিয়া

যায়, তখন দু'দিনের জন্য আসক্তি কেন ? অন্যের প্রতি বলপ্রকাশ কেন ? দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করা কেন ? পরনিন্দায় এত স্ফূর্ত্তি কেন ? পার্থিব পদার্থের জন্য অনুশোচনা কেন ? কিন্তু কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম।

হাঁ, মনে ভিন্ন বাহিরের কার্য্য দেখিয়া সদসৎ ধার্য্য করা যায় না ; একজন বিপুল সমারোহে দোল দুর্গোৎসব করিতেছে, কাঙ্গাল গরীবকে ভোজন করাইতেছে ; কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কারের সঞ্চার হইলেই সব মাটি —নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে। একই কার্য্য মনের বিভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে। সর্ব্বশ্রেণীর লোকই গাত্র মার্জ্জনা করিয়া থাকে। কিন্তু অসৎ-চিত্ত-কলুষিত নরনারীগণ গাত্র-মার্জ্জন কালে নিজ দেহের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক "কষিতকাঞ্চন বর্ণ দেখিয়া নরনারীগণ মুগ্ধ হইবে, কত জনই আমার মিলন কামনা করিবে" এই ভাবিয়া সমধিক পাট করিতেছে। তাহার ফলে নরকের পথ পরিস্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। সৎজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেহকে ভগবানের ভোগমন্দির ভাবিয়া পরিষ্কার করতঃ হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল লাভ করিতেছে। আর বিবেকিগণের দেহ মার্জ্জনা করিতে করিতে দেহের উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে। নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ, রক্ত-ক্লেদ মলমূত্র ফেণাদি দ্বারা দুর্গন্ধীকৃত ; ইহাকে সর্ব্বদা পরিষ্কার না করিলে যখন ইহা অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় তখন ইহার প্রতি এত আসক্তি কেন ? তাহা হইলে আর রমণীর কবি কল্পনা-সম্ভূত স্বর্ণ-কান্তি, আকর্ণবিশ্রান্ত পটলচেরা নয়ন, রক্তাভ গণ্ড, তরুণ-অরুণ-ভাতি অধরোষ্ঠ, ক্ষীণ কটির প্রতি চিত্ত ধাবিত হইবে না। অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। এক অবস্থায় যাহা পাপজনক, অবস্থান্তরে তাহাই পুণ্যজনক। পুরাণে কথিত আছে,— "বলাক নামক ব্যাধ প্রাণীহিংসা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিল, কৌশিক নামক ব্রাহ্মণ সত্য কথা দ্বারা নরকে গমন করিয়াছিলেন।" সুতরাং

বাহ্য কার্য্যে ভালমন্দ নাই ; মন সংলিপ্ত না হইলে তাহার ফলাফল ভোগ করিতে হয় না, মানবের মনই বন্ধনের কারণ, যথা—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥

—অন্যমনস্কগীতা, ৫৫

মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ, যেহেতু মন বিষয়াসক্ত হইলেই বন্ধনের হেতু হয় এবং বিষয়েতে বৈরাগ্য জন্মিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

বন্ধো হি কো ? যো বিষয়ানুরাগঃ।
কো বা বিমুক্তি ? বিষয়ে বিরক্তিঃ ॥

—মণিরত্নমালা

বন্ধন কাহাকে বলে ? বিষয় ভোগে মনের যে অনুরাগ, তাহার নাম বন্ধন। আর মুক্তি কাহাকে বলে ? বিষয়-বাসনা রহিত বা বিষয়ে বিরক্তি হওয়ার নাম মুক্তি। সুতরাং আসক্তি-পরিশূন্য হইতে পারিলে কিছুতেই দোষ নাই। কার্য্যের আসক্তিই দোষ,—

ন মদ্যভক্ষণে দোষো ন মাংসে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ ॥

—মনুসংহিতা

মদ্য পানে, মাংস ভক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই, ভূতগণের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মহাফল। অর্থাৎ আসক্তিশূন্য যে কার্য্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ। সৎপথে থাকিয়া যত অর্থ উপার্জ্জন করুন, কিন্তু ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাকুলতাই আসক্তি। যেন মনে থাকে, সমস্তই ভগবানের

আমরা কেবল অনির্দ্দিষ্ট সময়ের দু'দণ্ডের প্রহরী। পুত্র, কলত্র, বান্ধব, টাকা-কড়ি, গৃহ-আসবাব এই সকলের উপর যেন "আমার" মার্কা জোরে বসান না হয়। আমাদের শিয়রে করাল মৃত্যু নৃত্য করিতেছে। কর্ম্মসূত্রের পরিচ্ছেদে এই সংসার; এই বিষয়-সম্পত্তি পড়িয়া থাকিবে—অনাদি অনন্তকাল হইতেই ইহা পড়িয়া আছে, আমার মত কতজন,—আমারই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি এই বাড়ীর উপরে—ঐ জমিজমার উপরে—ঐ পুকুর বাগানের উপরে দু'দিনের জন্য দানবী দীপ্তির চাহনি চাহিয়া, বাসনা-বিবশের আলিঙ্গন বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে, কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন; যাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারের জিনিষ তাঁহারই ভাণ্ডারে পড়িয়া আছে। আমি তাঁহার ভৃত্য মাত্র, ইহ সংসারের মৃত্যুরূপ জবাবপত্র পাইলেই সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ভৃত্য যেমন প্রভুর বাড়ীতে কার্য্য করিয়া, প্রভুর ধনদৌলত সমস্তই রক্ষণাবেক্ষণে সমধিক যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু অবশ্যই তাহার জ্ঞান আছে, সে মনে মনে অবগত আছে, "আমি চাকরি করিতে আসিয়াছি, এই দ্রব্যজাত আমার নহে প্রভু জবাব দিলেই চলিয়া যাইতে হইবে।" আমাদেরও সেইরূপ মনে করা উচিত। নতুবা ধনদৌলতে আসক্তি জন্মিলেই এই পৃথিবী-রাজ্যে প্রেতযোনি ধারণ করিয়া কত দীর্ঘ কাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির উপরে মায়াও ঐরূপ জ্ঞানে সম্বন্ধ রাখা উচিত। ভগবান্ আমার উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ভারার্পণ করিয়াছেন, তাই সযত্নে লালন-পালন করিতেছি। তাহাদের দ্বারা ভাবী সুখের আশা করিলেই আসক্তির আগুণে দগ্ধ হইতে হইবে। পুত্র বা কন্যার বিয়োগে মুহ্যমান না হইয়া, ভগবানের গুরুতর ভার

হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি ভাবিয়া প্রফুল্ল হওয়া উচিত। আত্মসুখের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই বন্ধনের কারণ, আর ঈশ্বরপ্রেমে অনুগত হইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, তাহাতে পদ্মপত্রের জলের ন্যায় আসক্তি বা পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল॥

চৈতন্য-চরিতামৃত

আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে কাম বলে। আর কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বরেন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য যাহা করা যায়, তাহাকে প্রেম বলে। সমস্ত কার্য্য নিজ সম্ভোগস্বরূপে প্রয়োগ না করিয়া কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যে প্রয়োগ করিলে তাহাকে আর ফলাফল ভোগ করিতে হইবে না। কাহারও পরের উপকার করিলে আনন্দ হয়, তাই সে পরোপকারী ; একজন দুঃখীকে খাওয়াইলে সুখ হয়, তাই সে দাতা ; একজন খুব নাম যশ হইলে সুখী হয়, তাই সে যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-উপবাসাদি করিয়া থাকে ; ইহাদের মধ্যে কাহারও কার্য্য কামগন্ধশূন্য নহে ; সকলেরই মূলে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা রহিয়াছে, কেননা ঐরূপ করিলে আমার সুখ হয়, তাই আমি করি। ভগবান সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁহারই প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা, তাঁহার সেবায় আনন্দ পাই, তাই তাঁহারই সুখের জন্য কাজ করি। তিনি রূপ ভালবাসেন, আমরা রূপের উৎকর্ষ সাধন না করিব কেন? তিনি চন্দন চুয়া ভালবাসেন, আমরা লেভেণ্ডার

অডিকোলন ব্যবহার করিব না কেন ? তিনি ফুল মালা ভালবাসেন, আমরা চেন আংটী পরিলে দোষ কি ? তাঁহার আনন্দই যে আমার আনন্দ। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, কাণা, খোঁড়া, রোগী, ভোগী ইহাদের উপকার করিয়া তাহাদের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের প্রতিঘাতই আমার আনন্দ। পৃথক আনন্দ আর কি ? ইহারই নাম ঈশ্বরানন্দ, ভগবানকে সৌন্দর্য্য উপভোগ করাইয়া, ভগবানের সেবা করিয়া যে আনন্দের পূর্ণতম ভাব, তাহাই প্রেম। ধর্ম্ম-জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন লিখিয়াছেন,

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব॥
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটী গুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ প'ড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান॥

—চৈতন্য-চরিতামৃত

গোপীগণের কৃষ্ণদরশনে সুখের বাঞ্ছা নাই, কিন্তু কোটী গুণ সুখের উদয় হয়। বড়ই কঠিন কথা ! ইহার ভাব অনুভব করা পাণ্ডিত্য-বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। গোপীগণকে দেখিয়া কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহা হইতে গোপীদের কোটী গুণ আনন্দ হয়। কেন ?—গোপীদিগের সুখ যে কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত। কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া গোপীগণের সুখ,

অর্থাৎ তাঁহাদের স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদির সুখ নাই, কৃষ্ণসুখই সুখ। আহা কি মধুর ভাব !! এই জন্য গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি এই নির্ম্মল ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া, কদর্য্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

তাই বলিতেছিলাম, কৃষ্ণময় সর্ব্বভূতের সুখে সুখী হইতে হইবে ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইতে হইবে না, আমার কার্যো বিশ্বরূপ ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও সুখ। স্ত্রী, পুত্র, দেশের দশের ও সমাজের সেবা করিয়া তাহাদের যে আনন্দ, তাহাই আমার আনন্দ। সমুদয় ভূতের—সমুদয় বিশ্বের প্রীতি-ইচ্ছা সাধনই প্রেম। ভোজন, বলসংগ্রহ, সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণ, বসন-ভূষন পরিধান সমস্তই বিশ্বের সর্ব্বভূতের আয়োজনের জন্য। যখন যে কাজে যাহা লাগিবে, তাহাই লাগাইতে হইবে। সে সকল করিতে হইবে, না করিলে সর্ব্বভূতের কাজ করিব কি প্রকারে? বিশ্বের কাজে লাগিবে বলিয়াই দেহের এত যত্ন। কিন্তু আসক্তির ছায়া পড়িলেই আর প্রেম হইল না, আসক্তিই কাম।

অতএব ফলাশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের তুষ্টি সম্পাদনোদ্দেশে যে কার্য্য করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। পুত্রকলত্র বল বিষয় বিভব বল দান-ধ্যান, যাগযজ্ঞ বল, সমস্তই ভগবানের, কিছুই আমার নহে; যেমন ভৃত্য প্রভূর সংসারে থাকিয়া এ সকল করে, কিন্তু তাহার ফল তাহার নহে, তাহার প্রভুর। তদ্রূপ আমরাও ভগবানের এই বিরাট গৃহের এক কোণে পড়িয়া তাঁহারই কার্য্য করিতেছি। ইহাতে আমাদের শোক-দুঃখ ভাল-মন্দ-আনন্দের কি আছে!

এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিতে শিখিলে আর আসক্তির দাগ লাগিবে না। কিন্তু একটি তৃণেও যদি আসক্তি থাকে, তবে তাহার জন্য কত জন্ম ঘুরিতে হইবে কে জানে? সর্ব্বস্বত্যাগী পরম যোগী রাজা ভরত সসাগরা

বসুন্ধরার মায়া ত্যাগ করিয়াও তুচ্ছ হরিণশিশুর আসক্তিতে কতবার জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য বলি ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য কর, যেন ব্যাকুলতা না জন্মে,—প্রাণে বাসনা-কামনার দাগ না লাগে। পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যাকুল না হইয়া, যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, ধৈর্য্যের সহিত সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। জীবের চিন্তা বিফল, সুতরাং বৃথা চিন্তা বা আশার হার না গাথিয়া পরমপিতার পদে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক উপস্থিত কার্য্য করিয়া যাইবে।

যা চিন্তা ভুবি পুত্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপার-সম্ভাষণে
যা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ-যশসাং লাভে সদা জায়তে।
সা চিন্তা যদি নন্দ-নন্দন-পাদ-দ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং
কা চিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বারপ্রয়াণে প্রভো॥

মর্ত্ত্যভূমে আসিয়া, আপনহারা হইয়া, পুত্র পৌত্রাদির ভরণ-পোষণ-ব্যাপারে যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, যেরূপ চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ-যশ প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য ব্যয়িত করিয়া থাকি, সেই চিন্তা যদি ক্ষণকালের জন্যও নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলারবিন্দে নিয়োজিত করিতে পারি, তবে যমরাজের ভীম ভবনের দ্বারে প্রয়াণে কি একটুকুও ভয় হয়? অতএব বৃথা চিন্তা বা দুরাশার দাস না হইয়া ফলাফল ভগবানে অর্পণ করতঃ অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাও। সাধকাগ্রগণ্য তুলসীদাস আপন মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

'তুলসী, ঐসা ধেয়ান ধর,
জৈসী ব্যান কী গাঈ।
মুহমেঁ তৃণ চনা টূটে
চেৎ রক্‌খে বছাই।

"তুলসী—এই ধ্যান ধর, যেমন বিয়ানো গাই, নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ ছোলা প্রভৃতি ভক্ষণ করে, কিন্তু চিত্ত বাছুরের উপর ফেলিয়া রাখে, তেমনি সংসারের কাজ কর, চিত্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া রাখ।"

আর এক কথা, সর্ব্বদা সর্ব্ব অবস্থায় যেন মনে থাকে, আমাকে মরিতে হইবে। আমাদের মস্তকের উপর যমের ভীমদণ্ড নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। কোন্ মুহূর্ত্তে মরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কখন কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে অলক্ষিতে আসিয়া গ্রাস করিবে—কে জানে? ভাল মন্দ যে কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে "আমাকে একদিন মরিতে হইবে" এই ভাবিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। মরণের কথা মনে থাকিলে আর মরজগতে মদন-মরণের অভিনয়ে মন অগ্রসর হইবে না।

মৃত্যুই জগৎপিতা জগদীশ্বরের পরম কারুণিক ব্যবস্থা। মৃত্যু নিয়ম-নির্দ্ধারিত না থাকিলে পৃথিবী ঘোর অশান্তিনিলয় হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-কর্ম্মের মর্ম্ম কেহই মর্ম্মে স্থান দিত না। সতীর সতীত্ব, দুর্ব্বলের ধন, নির্ধনীর মান রক্ষা করা কঠিন হইত। মানব মৃত্যুর ভয় করিয়া পরকালের কথা ভাবিয়াই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নতুবা স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন আপন বলবীর্য্য-ধনসম্পদের গৌরবে নিরাশ্রয় দুর্ব্বলগণকে পদদলিত করিত। দুর্ব্বল-দরিদ্রগণ প্রবলের অত্যাচার-উৎপীড়নে লণ্ডভণ্ড হইয়া চক্ষুজলে গণ্ড ভাসাইত; আর গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার বা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিধির বিষম বিধানের নিন্দা করিত। মৃত্যু আছে বলিয়াই আমাদের মনুষ্যত্ব বজায় রহিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই অনিশ্চিত, কোন বিষয়ের স্থিরতা নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী, মৃত্যুও তেমনি দেহীর সঙ্গী; শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি,—

"অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।"

আজ হউক, কাল হউক বা দু'দশ বৎসর পরেই হউক, একদিন সকলকেই সেই সর্ব্বগ্রাসী শমন-সদনে যাইতে হইবে। অগণ্য সৈন্য-সমাবৃত লোক-সংহারকারী শস্ত্রসমন্বিত সম্রাট হইতে বৃক্ষতলবাসী ছিন্নকন্থাসম্বল ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মৃত্যু অনিবার্য্য, মৃত্যু বয়সের অপেক্ষা করে না, সাংসারিক কার্য্যসম্পাদনের অসম্পূর্ণতা ভাবে না, মৃত্যুর মায়ামমতা নাই, কালাকাল বিচার নাই। মৃত্যু কাহারও উপরোধ-অনুরোধ শুনে না,—কাহারও সুবিধা-অসুবিধা দেখে না,—কাহারও সুখ-দুঃখ বুঝে না, ভাল-মন্দ ভাবে না; কাহারও পূজা-অর্চ্চনা চাহে না,—কাহারও তোষামোদ বা প্রলোভনে ভুলে না,—কাহারও রূপ-গুণ-কুল-মান মানে না, কাহারও ধনগৌরবের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। কত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারথী এই ভারতে জন্মগ্রহণ করতঃ আপন আপন বলবীর্য্যে সসাগরা বসুন্ধরা প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই জীবিত নাই, সকলেই করাল মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন। বাস্তবিক মনুষ্যের এমন কোন সাধ্য নাই, যদ্দ্বারা ভীষণ বিভীষিকাময় মৃত্যুর গতিরোধ করা যায়। শারীরিক বলবীর্য্য, ধনজন, সম্পদ্, মান, গৌরব, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, প্রভুত্ব প্রভৃতি সর্ব্ব গর্ব্ব মৃত্যুর নিকট খর্ব্ব হইবে। এই মৃত্যুর কথা ভাবিয়াই মহাদস্যু রত্নাকর সর্ব্ব মায়া পরিত্যাগ পুরঃসর ধর্ম্মজগতের মহাজন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্মশানে শবদাহ করিতে গিয়া নশ্বর দেহের পরিণাম দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য অনেকের মনে শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

এই কারণে বলিতেছি, সর্ব্বদা মৃত্যু চিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে হৃদয়ে পাপপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে না—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে চিত্ত ধাবিত হইবে না—বিষয়-বিভব, আত্মীয়-স্বজনের মায়া শতবাহু সৃজন করিয়া আসক্তি-শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারিবে না। যেন মনে থাকে, আমাদিগের

মত কত জন এই সংসারে আসিয়াছিলেন ; এই ধনৈশ্বর্য্য, এই ঘর বাড়ী "আমার আমার" বলিয়াছিলেন, আমাদের মত স্ত্রী পুত্র কন্যাগণকে স্নেহের শতবাহু সৃজন করিয়া জড়াইয়া ধরিতেন,—কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায় ? যে অজানা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। যেন মনে থাকে, ধন সম্পদের অহঙ্কার, বল বিক্রমের অহঙ্কার, রূপ যৌবনের অহঙ্কার, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার বা কুলমানের অহঙ্কারের সকলি বৃথা। এক দিন সকল অহঙ্কার—অহঙ্কারের অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হইবে। যেন মনে থাকে, আজি পার্থিব পদার্থের অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া একজন নিরাশ্রয় দুর্ব্বলকে পদাঘাত করিতেছি ; কিন্তু একদিন এমন দিন হইবে যে, শ্মশানে শবাকারে শয়ন করিলে শৃগাল কুকুরে পদদলিত করিবে, পিশাচ-প্রেতে বুকে চড়িয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবে। সেদিন নীরবে সহ্য করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিলে ক্রমশঃ পার্থিব পদার্থের অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আসক্তির বন্ধন ঢিলা হইয়া যাইবে।

আজ কাল অনেকে শিক্ষার দোষে, সংসর্গের গুণে, বয়সের চাপল্যে পরকাল ও কর্ম্মগুণে জন্ম-কর্ম্ম-অদৃষ্ট স্বীকার করেন না ; কিন্তু পরিণামে একদিন নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিলেও জীবন চিরস্থায়ী নহে ; এক দিন মরিতে হইবেই, ধনজন গৃহ-রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তখন দু'দিনের জন্য মায়া কেন ? বৃথা আসক্তি কেন ? মৃত্যু চিন্তায়, সেই সুদূর অতীতের সুস্থূল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি পতিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে। পাঠক ! আমিও যতদিন মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া না পড়ি, ততদিন মৃত্যু-চিন্তা জাগ্রত রাখিব বলিয়াই মরণের মহাক্ষেত্র মহাশ্মশান আমার বাসস্থান, মানবাস্থির দগ্ধাবশেষ চিতাভস্ম আমার অঙ্গের ভূষণ, নরকপাল আমার জলপাত্র, আমি মরণের পথের পথিক ; দিবানিশি মরণের কোলে বসিয়া আছি।

সিদ্ধ যোগিগণ উপদেশ দিয়া থাকেন, অপরের সুখ, দুঃখ, পাপ ও পুণ্য দেখিলে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্ষ্যা করিও না। পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার ঈর্ষ্যানল দূরীভূত হইবে। তুমি যেমন সর্ব্বদা আত্মদুঃখ নিবারণের ইচ্ছা কর, পরের দুঃখ দেখিলেও ঠিক সেইরূপ ইচ্ছা করিও। আপনার পুণ্যে বা শুভানুষ্ঠানে যেমন হৃষ্ট হও, পরের পুণ্য বা শুভানুষ্ঠানে সেইরূপ হৃষ্ট হইও। পরের পাপে বিদ্বেষ করিও না, ঘৃণা করিও না, ভাল মন্দ কিছুই আন্দোলন করিও না। সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিও। ঐরূপ থাকিলে আমাদের চিত্তের অমর্ষমল নিবারিত হইবে। চিত্তের বৃত্তিসকল অনুশীলন-সাপেক্ষ ; বাস্তবিক প্রত্যেক অসদ্‌বৃত্তির পরিবর্ত্তে সদ্‌বৃত্তি অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ চিত্তমল বিদূরিত হয়। ক্রোধের বিপরীত দয়া, কামের বিপরীত ভক্তি, এইরূপে প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে সাত্ত্বিক বৃত্তি সকল উদিত করিতে করিতে চিত্ত অল্পে অল্পে নির্ম্মল হইয়া উত্তমরূপ একাগ্রতা-শক্তিসম্পন্ন হইবে। যাঁহার চিত্ত যত নির্ম্মল, ভগবান্ তাঁহার তত নিকট, আর যাঁহার চিত্ত পাপতমসাচ্ছন্ন, তিনি ভগবান্ হইতে তত দূরে অবস্থিত। আরও এক কথা, পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইবে বলিয়া কর্ম্মী হও, যতদূর সম্ভব যত্ন ও চেষ্টা কর ; কিন্তু তাই বলিয়া কদাপি যেন পাপে মগ্ন হইবে না। অসৎপথে অর্থোপার্জ্জন করিলে তাহার ফল আমিই ভোগ করিব, আর কেহই সে পাপের অংশ গ্রহণ করিবে না। পোষ্যবর্গ সমাজের উপযোগী আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি না পাইলে মুখ ম্লান করিবে সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কি করিব ?

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

—স্মৃতি

কৃতকর্ম্ম শুভ বা অশুভ হউক, অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

পোষ্যবর্গের মধ্যে যে যেরূপ অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে,—আমি শত চেষ্টাতে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। কেবল অহঙ্কারের আগুন বুকে লইয়া ছুটাছুটী করিয়া জন্মজন্মের তাপ সংগ্রহ করিব কেন? অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাসনাবহ্নিতে দগ্ধ হইব কেন? ক'দিনের জন্য জন্মজন্মান্তরের কষ্টের আগুন সৃষ্টি করিয়া আসক্তির দানবী-নিঃশ্বাসে দগ্ধ হইব কেন? আর যদি পুত্রকন্যার মলিন মুখ দেখিতে না পারিব, তবে ত্যাগী হইব কিরূপে? কিন্তু কর্ম্ম করিব না, কর্ম্মে সংসিদ্ধিলাভ করিব; ইহা তো জড়ের কথা! তবে অসৎ পথে যাইব না—কাহারও প্রাণে ব্যথা দিব না, যেন এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় থাকে। সৎপথে থাকিয়া যেমন ভাবে চলে চলুক। বৃক্ষের ফল ও নদীর জল ইহার ত আর অভাব হইবে না। আর সকলেরই ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা করা উচিত। তিনি কাহাকেও অভুক্ত রাখেন না। আমাদের জন্মগ্রহণের কত পূর্ব্বে ভগবান মায়ের বক্ষে স্তনের সৃষ্টি করিয়া রাখেন, জন্মমাত্রেই সেই স্তন্যপান করিয়া আমরা পরিপুষ্ট হই। যাঁহার এমন ব্যবস্থা, এমন শৃঙ্খলা, এমন দয়া, আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া, তাঁহার কার্য্য-শৃঙ্খলা ভুলিয়া, কেন ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরি?

আর একটী কথা বলিয়া এই বিষয় উপসংহার করিব। সেই কথাটী এই, যাহাতে জগজ্জীব অত্যাকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহা রমণীর মোহিনী মোহ। যোগসাধন কালে সকলেরই

উৰ্দ্ধরেতা

হওয়া কর্ত্তব্য। যোগাভ্যাস কালে স্ত্রীসঙ্গাদি নিবন্ধন কোন কারণে শুক্র নষ্ট হইলে আত্মক্ষয় হয়। যথা—

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥

—দত্তাত্রেয়

যদি স্ত্রী-সঙ্গ করে তবে বিন্দুনাশ হয়। বিন্দুনাশ হইলে আত্মক্ষয় ও সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে। অতএব

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষ্যো বিন্দুর্হি যোগিনা।

— দত্তাত্রেয়

এই জন্য যোগাভ্যাসকারী যত্নের সহিত বিন্দুরক্ষা করিবেন। শুক্র নষ্ট হইলে ওজোধাতু বিনষ্ট হইয়া থাকে, কারণ শুক্রই ওজঃস্বরূপ অষ্টম ধাতুর আশ্রয় স্থল। বীর্য্যই ব্রহ্মতেজ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার অভাব হইলে মানুষের সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। শুক্র নষ্ট হইলে যক্ষ্মা, প্রমেহ, শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে হয়। নতুবা অস্বাভাবিক আলস্য জন্মিয়া সর্ব্বকার্য্যে উদাসীন করিবে, তখন জড়ের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে। এই জন্য সকলেরই সযত্নে বীর্য্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই কঠিন কথা

পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ।

ভর্ত্তৃহরি

মোহময়ী প্রমোদরূপ মদ্যপান করিয়া এই অনন্ত জগৎ উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে। যে কোন জীবই হউক, তাহার পুরুষকে তাহার স্ত্রীজাতি মোহাকর্ষণে টানিয়া রাখিয়াছে। সকলেই রিপুর উত্তেজনায়, অজ্ঞানতার তাড়নায় নরকবহ্নিতে ঝাঁপ দিতেছেন। বিদ্যালয়ের বালক হইতে বুড়ো মিন্‌সে পর্য্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য শুক্রক্ষয় করিয়া জীবনের সুখ বিনষ্ট করতঃ বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। তাহাদের উৎপাদিত সন্তানগণ আরও নির্ব্বীর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দুর্জ্জয় রোগগ্রস্ত হইয়া সংসার অশান্তি-নিলয় করিতেছে। এইরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইলে নরনারীগণের হৃদ্‌বৃত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; বস্তুগত্যা জ্ঞান থাকে না। কেবল আমরা নহি, দেবতাগণও প্রমোদমদিরায় উন্মত্ত, তাহা মহামুনি দত্তাত্রেয় প্রকাশ করিয়াছেন—

ভগেন চর্ম্মকুণ্ডেন দুর্গন্ধেন ব্রণেন চ।
খণ্ডিতং হি জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

— অবধূতগীতা ৮।১৯

এই আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি? অভ্যাস ও সংযমে সকলই হয়। তত্ত্বজ্ঞানে ও সংযম অভ্যাসে ইহা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিতে হইবে, যাহা নরকের কারণ—রোগের কারণ—আত্মার অবনতির কারণ—সে কার্য্য কেন করিব? যাহার জন্য কর্ত্তব্য-পন্থা হইতে বিচলিত হইতেছি, সে স্ত্রী কি?

কৌটিল্যদম্ভসংযুক্তা সত্যশৌচবিবর্জ্জিতা।
কেনাপি নির্ম্মিতা নারী বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্॥

— অবধূত গীতা ৮।১৪

অতএব বিবেচনা করা উচিত—কি দেখিয়া আমাদের প্রাণভরা পিপাসা—কিসের জন্য এই পাশব বাসনার আগুন?—দৈহিক সৌন্দর্য্য! কিন্তু দেহ কি? পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি অবস্থা ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। যাহার বিকাশ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া—যাহা বিশ্বের সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাহার জন্য একটী সীমাবদ্ধ স্থানে আকর্ষণ কেন? বিশেষতঃ রূপ-যৌবন কয় মুহূর্ত্তের জন্য? সে বাল্যকালে কি ছিল,—যৌবনে কি হইয়াছে—আবার প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্যেই বা কি হইবে,—এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল দেহের পরিণাম কি, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ যে জীর্ণা শীর্ণা বৃদ্ধা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াছে, ঐ বৃদ্ধাও অবশ্য একদিন যুবতী ছিল; কিন্তু এখন কি হইয়াছে? আবার যৌবনেও রোগোৎপত্তি হইয়া এই সুন্দর দেহকে পচাইয়া ধসাইয়া প্রেতের অধম করিয়া দিতে পারে, তাহার জন্য আসক্তি কেন? যেন মনে থাকে—

ভগাদিকুচপর্য্যন্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্।
যে রমন্তে পুনস্তত্র তরন্তি নরকং কথম্॥*

—অবধূতগীতা, ৮।১৭

* এই শ্লোক কয়টীর জন্য ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাগণ ও জগন্মাতার অংশসম্ভূত ভারতমাতাগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন। গুরুর কৃপায় ঐরূপ জ্ঞান আমার হৃদয়ে সংবদ্ধ নাই। আমি জানি, স্ত্রী ও পুরুষ চৈতন্যেরই বিকাশ—আধারভেদে গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র। সুতরাং ঐরূপ বিবেচনা আমি অসঙ্গত মনে করিব। আমি জানি,—

নৈব স্ত্রী ন পুমানমেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫ অঃ

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১ অঃ

আমি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা বোধ করি না।

আরও এক কথা—স্ত্রী-সহবাসে আনন্দ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু তত্ত্ববিচার করিয়া দেখা উচিত, সে আনন্দ কাহার নিকট ? ব্রহ্মবস্তু বীর্য্য আমাদের নিকট বলিয়াই আনন্দ, নতুবা রমণীদেহে কিছুই নাই। বালকগণ রমণীর রমণীয় দেহ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া মাতার ক্রোড়ে থাকিতে ভালবাসে কেন ? খোজাগণের নিকট বালা, যুবতী বা বৃদ্ধা সবই সমান। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

পল্লীবাসী ব্যক্তিগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, পল্লীর পালিত কুকুর গ্রাম মধ্যে আহার না পাইলে গো-ভাগাড়ে যাইয়া বহু দিনের পুরাতন গবাস্থি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইসে ; পরে কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সেই শুষ্ক নীরস অস্থি ক্ষুধার জ্বালায় কামড়াইতে থাকে। কিন্তু অস্থিতে কি আছে—শুষ্ক কঠিন অস্থির আঘাতে তাহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধির নির্গত হয়। নিজ রক্ত রসনায় লাগিয়া স্বাদ অনুভূত হয় ; তখন আরও যত্নে ও আগ্রহের সহিত সেই শুষ্ক অস্থি কামড়াইতে থাকে। পরে যখন নিজ মুখ জ্বালা করিতে থাকে, সেই সময় বুঝিতে পারে, আপন রক্তে রসনা পরিতৃপ্ত করিতেছি। কাজেই তখন অস্থি ফেলিয়া অন্য চেষ্টায় গমন করে। আমরাও তদ্রূপ আনন্দ-প্রদ বস্তু নিজ শরীরাভ্যন্তরে রহিয়াছে, কিন্তু তাহা বুঝিতে না পারিয়া রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণিক আনন্দের জন্য সেই বস্তু নষ্ট করিতেছি। সুখের আশায় প্রধাবিত হইয়া শেষে প্রাণভরা অনুতাপ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছি। সুখ যে আমাদের নিকট, তাহা উপলব্ধি করিতেছি না। পতঙ্গের ন্যায় রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। যে জিনিষ শরীর হইতে বহির্গমনকালে ক্ষণকালের জন্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিয়া যায়, না জানি তাহাকে সযত্নে শরীরে রক্ষা করিলে কতই অননুভবনীয় আনন্দ প্রদান করে। আমরা এমনি অজ্ঞ, সেই পদার্থ বৃথা নষ্ট করিতে আপনার জীবন ও মন উৎসর্গ করিতেছি।

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে মনকে দৃঢ় করিয়া যিনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ মানুষ নামে দেবতা। মহাদেব বলিয়াছেন—

ন তপস্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্য ধারণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই মানুষ নামে প্রকৃত দেবতা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন, বীরত্ব তাঁহার করায়ত্ত। শুক্রের ঊর্দ্ধগমনে অতুল আনন্দ লাভ হয়।*

বীর্য্য ধারণ না করিলে যোগ সাধন বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং যোগাভ্যাসকারিগণ যত্নের সহিত বীর্য্য রক্ষা করিবে।

যোগিনস্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ।

সতত বিন্দু ধারণ করিলে যোগিগণের সিদ্ধিলাভ হয়। বীর্য্য সঞ্চিত হইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চয় হয়,—এই মহতী শক্তির বলে একাগ্রতা সাধন সহজ হয়। যাঁহারা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা একেবারে ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারিবেন না। কারণ ঋতুরক্ষা না করিলে শাস্ত্রানুসারে পাপ হয়। সুতরাং পুত্রকামনায়, বংশ-রক্ষার্থে, ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহ বজায় রাখিবার জন্য যোগমার্গানুগামী সাধক সংযতচিত্তে প্রত্যেক মাসে একদিন মাত্র স্বীয় স্ত্রীর ঋতুরক্ষা করিবে।

---

* যোগে এমন কার্য্য আছে, যাহাতে কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত করা যায়, অথচ বীর্য্যক্ষয় হয় না। যোগ শাস্ত্রে তাহা অত্যন্ত গোপনীয়। আনন্দপ্রদ কার্য্য হইলেও তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি হয়। মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" পুস্তকে তাহা বর্ণিত এবং মৎপ্রণীত "ব্রহ্মচর্য্যসাধন" পুস্তকে বীর্য্যধারণের সাধন ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। মৎপ্রণীত "প্রেমিক গুরু" পুস্তকে এই বিষয়ের উচ্চাঙ্গের আলোচনা আছে।

প্রাগুক্ত নিয়মে চিত্ত সুসংযত করিয়া যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই অচিরে সাফল্য লাভ করিবে। নতুবা পার্থিব পদার্থের আসক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করতঃ ঈশ্বর ধ্যানে নিযুক্ত হইলে অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখা যাইবে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা নিতান্ত সহজ নয়। যেখানে-সেখানে বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান স্বতন্ত্র বস্তু। ত্যাগই ইহার প্রধান কার্য্য। ত্যাগের সাধনা না করিলে ব্রহ্মচিন্তা নিষ্ফল।

পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববিচারে আসক্তি-পরিশূন্য হইতে না পারিলে, শুধু কেশে বেশে, কি দেশে দেশে ভেসে বেড়ালে কিছু হবে না। ভবের ভাবে না থাকিয়া, ভাবের ভাবে ডুবিয়া থাকিলে সকলই সফল হয়। এরূপ ভাবে বাটীতে বসিয়াও বনিতা ও বেটাবেটী ঘটিবাটী লইয়া—বিষয়বিভবের মধ্যে থাকিয়াও খাঁটিরূপে খাটিতে পারিলে ফলও খাঁটি। এ-তীর্থ ও-তীর্থ ছুটিতে, সন্ন্যাসীর দলে জুটিতে বা ভণ্ডামীর সাজ সাজিতে হয় না। প্রত্যুত ভস্ম বা মাটি মাখিতে—জটাজূট রাখিতে—রঙ্গিন বসন পরিতে—উপবাস করিয়া মরিতে—সংসার ধর্ম্ম ছাড়িতে—নানা কর্ম্ম করিতে—নানা পন্থা ধরিতে—নানা শাস্ত্র খুঁজিতে—নানা কথা বুঝিতে—পরিণামে রম্ভা চুষিতে হয় না।

শুধু মালা-ঝোলা লইয়া হরিবোলা হইলে—মাটি মাখিয়া চৈতন-চুটকী রাখিয়া গোপীবল্লভ রব ছাড়িলে—জটাজূট ভস্ম মাখিয়া বোম্ বোম্ রবে হরদম্ গাঁজায় দম মারিলে—কালী কালী বলিয়া গাঙ্গের বালিতে পড়িয়া মদ খাইলে মদনমোহনের চরণ পাওয়া যায় না। নিশ্চয় জানিবেন, বনবাসে হয় না, মনোবশে হয়—তীর্থবাসে হয় না, ঘরে ব'সে হয়; রোষে রস মিলে না—লোভ থাকিলে ক্ষোভ হয়—অভিমান থাকিলে পাপ অপরিমাণ—পাপ থাকিলে তাপ—কপটতা থাকিলে অপটুতা হয়—মায়া

থাকিলে কান্না ছাড়ে না—বাসনা থাকিলে সাধনা হয় না—আশা থাকিলে পিপাসা বৃদ্ধি—গৌরব জ্ঞানে রৌরব নরক—প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করিলে ইষ্টচিন্তা হয় না—গুরুত্ব জ্ঞানে গুরুকৃপা হয় না—গুরু না ধরিলে গুরুতর ভোগ—বাঞ্ছা থাকিলে বাঞ্ছাকল্পতরুর বাঞ্ছা করা বৃথা—অহংজ্ঞানে সোহং হইবে না। কেবল ভণ্ডামিতে সকল পণ্ড—অবশেষে দণ্ডধারীর প্রচণ্ড প্রতাপে লণ্ডভণ্ড হইয়া দণ্ডভোগ করিতে করিতে চোখের জলে গণ্ড ভাসাইতে হইবে। অতএব যদি খাঁটি মানুষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মাটির দেহে অভিমান মাটি করিয়া—মাটি হইয়া—মাটি চাটিয়া—মাটিতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে সব খাঁটি—মাটির দেহও খাঁটি। অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে সব মাটি করিয়া যদি মাটির মানুষ হইতে না পারি, তবে সাধন-ভজন মাটি—মাটির দেহও মাটি—গোটা মানব জীবনটাই মাটী হইবে।

কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, সংসারে থাকিয়া সাধন ভজন হয় না। কেন ?—সংসারী ধর্ম্ম বা সাধন কিংবা সদ্গতি লাভ করিবে না, তাহার কারণ কি ? সংসার তো ভগবানের। তুমি সংসারে 'সং' ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর। দুরাশার আসারে ডুবিয়া অসার-রূপে সং না সাজিয়া 'সার' হইয়া অসার সংসারে আশার সুসার কর এবং সংসারে সার প্রসার করিয়া পসার কর। কেবল সাংসারিক গোলমালের ভিতর পড়িয়া ঘোর রোলে গণ্ডগোল না করিয়া, গোলমালের গোল ছাড়িয়া দিয়া মাল বাছিয়া লইতে পারিলে সর্ব্বদা সামাল সামাল করিয়াও গোটা মানব জীবনটাকে পয়মাল করিতে হইবে না। প্রত্যুত সারাংসারের সার ভগবানের সৃষ্ট সংসারের সারে সারী হইয়া আশার অধিক সুসার ও অপার আনন্দ ভোগ করিবে। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক মনের সহিত ভগবানকে ডাকার মত ডাকিতে

ও ভাবার মত ভাবিতে পারিলে সংসার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াও পরমাগতি লাভ করা যায়।

কেহ কেহ আবার সময়ের আপত্তি ক রয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "পরিবারাদি পালনের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমস্ত দিন যায়, সাধন ভজন কখন করিব !" অর্থ উপার্জ্জন ও সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে যদি সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়, তবে নিত্য রাত্রে যতক্ষণ নিদ্রা সুখ উপভোগ করি, তদপেক্ষা এক ঘণ্টা কম ঘুমাইয়া সেই ঘণ্টা নিশ্চিন্ত চিত্তে নিত্য-নিরঞ্জনের আরাধনা করিলে তাহাতেই আশাতীত ফল পাইব। কাহারও আবার অর্থাভাবে পরমার্থ চিন্তা হয় না। অর্থ হইলে হয়তঃ খুব চা'ল-কলা চিনি-সন্দেশ সংগ্রহ করিয়া, রসে রসিয়া রোশনাই করিয়া মেষ-মহিষ বলি দিয়া, ধূমধামের সহিত ঢাক ঢোল বাজাইয়া লোক মজাইতে পারে যায় ; অর্থাভাবে সেইটা হয় না। কিন্তু পূজার যে সমস্ত উপকরণ, সকলই তো তাঁহার। সুতরাং তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে দিলে আমাদের আর বাহাদুরী কি ? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রকারে চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার ভক্তের মত ভাষায়—তাঁহার ভক্তের মত প্রেম-করুণ কণ্ঠে ডাকিয়া বলি—

"রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীরবামনয়নাহৃতমানসায়
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ॥"

হে যদুপতি ! রত্ন সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্তম, অতএব তোমাকে দিবার কি আছে ? শুনিয়াছি নাকি আভীরতনয়া

বামনয়না প্রেমময়ী রমণীগণ তোমার মন হরণ করিয়া লইয়াছেন। তাহা হইলে কেবল তোমার মনের অভাব। অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ করিতেছি—হে প্রেমবশ্য গোপীবল্লভ, তুমি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ কর। এই তো তোমাদের সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হইল। ফলে এই সব কিছুই নহে। আমার বিশ্বাস—যাঁহার প্রাণ সেই প্রেমময়ের পাদপদ্মে প্রধাবিত হয়, কোন সাংসারিক ওজরে তাঁহাকে জোর করিয়া বাঁধিতে পারে না। দেখুন, শিশু প্রহ্লাদ বিষ্ণুদ্বেষী পিতার পুত্র, দিক্‌হস্তি-পদতলে, অপার জলধিজলে, হুতাশনের তীব্র দহনে ও কালসর্পের তীক্ষ্ণ দংশনেও হরিনাম গাহিত, আর কত পাষণ্ড ধর্ম্মসমাজে লালিত হইয়া, উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের নাম উচ্চারণে বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণা অনুভব করে। বুদ্ধদেব অতুল সাম্রাজ্য, অগণন বৈভব, বৃদ্ধ পিতামাতার বিমল স্নেহ, প্রেমময়ী পতিব্রতা প্রণয়িনীর অনন্ত প্রেম ও শিশু-সন্তানের সুললিত কণ্ঠের আধ আধ ভাষা সমস্তই উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন; আর আমরা অশেষ প্রকার নিরাশায় নিপীড়িত হইয়াও ভগ্ন কুটীরের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারি না। কেহ ঈশ্বরসৃষ্ট জগতে কেবল বাক্‌ছল অর্থবিন্যাসের উপাদান দেখে; কেহ সেই জগতে চিন্ময়ী মহাশক্তির বৈচিত্র্যময়ী ক্রীড়া দেখেন। কোল্‌রিজ্‌ সাহেব কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলিতেন, "Poetry has given me the habit of wishing to discover the *good* and the *beautiful* in all that meets and surrounds me." আবার আর এক জন প্রতিভাপরায়ণ সাহেব সেই কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলেন, "The end of Poetry is the elevation of the soul * * * the improvement and elevation of the moral and spiritual nature of man"—ইহার কারণ কি? বলা বাহুল্য, ইন্দ্রিয় শক্তির তারতম্য ফলে এইরূপ ঘটিয়া

থাকে। যিনি যেমন প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তের গতি সেইরূপে ধাবিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব নানারূপ ওজর আপত্তি দর্শাইয়া স্ব স্ব স্বভাব গুপ্ত করতঃ সাধারণের চক্ষে ধূলা-নিক্ষেপ, করিতে গেলে পরিণামে আক্ষেপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

অনেক ফুলষ্টকিংধারী ফুলবাবু "ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার বয়স হইলে করা যাইবে" বলিয়া শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গে স্বীয় যুক্তি যোজনা করতঃ মুক্তি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সবল থাকিতে দুশো রগড় লুটিয়া মদন-মরণের অভিনয় করিয়া লই, তৎপরে ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইলে অক্ষমতা-নিবন্ধন হরিনামে মত্ত হওয়া যাইবে। ধর্ম্মের কি আর একটা বয়স নির্দ্দিষ্ট আছে? মরজগতে আসিবার সময় মরণের কর্ত্তার নিকট হইতে মৌরসী মকররি পাট্টা প্রাপ্ত হইলে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই প্রমাণে নিশ্চিন্ত থাকা যাইত। কিন্তু ভাবী মুহূর্ত্তের চিত্রপটে কি অঙ্কিত আছে, তাহা যখন লোক-লোচনের গোচরীভূত নহে, তখন পঞ্চাশের আশা দুরাশা মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইলে যখন সামান্য সাংসারিক কার্য্যে সক্ষম হইবে না, তখন সেই অনন্তের অনন্ত ভাব ধারণা করিবে কি প্রকারে? সদ্যোবিকশিত কুসুমকলিকা যেমন সুগন্ধি বিকীর্ণ করে, বাসিফুলে সে সুবাস সুদূরপরাহত। বিশেষতঃ যৌবনের অপ্রতিহত প্রভাবে চিত্ত একবার যথেচ্ছাচারী হইলে পুনরায় তাহাকে স্ববশে আনা সাধ্যাতীত। এ সম্বন্ধে একটী গল্প বলি।

এক ব্যক্তি আজীবন চুরি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু চোরের পুত্রটী স্বীয় কর্ম্মফলে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। ছেলে মোটা মাহিনার চাকুরী করেন, সংসারে কোন অভাব নাই; তবু সে স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সাধারণে সর্ব্বদা এই বিষয় আন্দোলন-

আলোচনা করে। চোরকে একদিন তাহার পুত্র বলিলেন "বাবা, তুমি খেতে পরতে পাও না, তাই আজিও চুরি কর? তোমার জন্য লোক-সমাজে লজ্জায় আমি মুখ দেখাইতে পারি না।"

উপযুক্ত পুত্রের তাড়নায় তদীয় সমক্ষে "আর চুরি করিব না" ব লয়া চোর অঙ্গীকার করিল।

সেই দিন হইতে সে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি করিয়া বাটী আনয়ন করে না বটে, কিন্তু একজনের দ্রব্য অন্য একজনের বাটীতে, আবার তাহার কোন দ্রব্য অপর এক জনের বাটী রাখিয়া আইসে। কিছুদিন পরে এ কথাও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাহার পুত্র শুনিলেন, পিতাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া ঐরূপ করার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

চোর উত্তর করিল, "আমি এখন চুরি করি না। চুরি না করিলে রাত্রে আমার নিদ্রা হয় না, কোনরূপ শান্তি পাই না—তাই চুরি না করিয়া একজনের দ্রব্য অপরের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াও কতকটা তৃপ্তিলাভ করি।"

অতএব যৌবনের প্রারম্ভে যখন চিত্তবৃত্তি সকল বিকশিত হয়, তখন দৃঢ় অভ্যাসে তাহাদের সংযম না করিলে পরিশেষে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলগতি রোধ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে তুলসীদাস-বিল্বমঙ্গলের সামান্য কর্ম্ম-আবরণে প্রতিভা আবৃত ছিল। উন্মুক্ত মাত্র সতেজে ধাবিত হইয়া ধর্ম্ম-মহাজন পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কয়জন সেইরূপ ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! অতএব—

অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতাঃ।
রোগী চ দেবভক্তঃ স্যাৎ বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী॥

ঐরূপ না হইয়া সময়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা অন্তর বিষয়-

চিন্তা, কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, দ্বেষ ও অহংভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের অক্ষমতা নিবন্ধন মালা-ঝোলা লইয়া লোক-দেখান বৈড়ালিক ব্রত অবলম্বন করিলে অন্তরের ধন অন্তর্য্যামী পুরুষের সাক্ষাৎ-লাভ করা যায় না।

প্রাগুক্ত নির্লিপ্তভাবে সংসার-ধর্ম্ম করিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিলে গৃহত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়। কারণ আমরা দু' কূল বজায় রাখিতে পারি নাই ;—সংসার ধর্ম্ম ছাড়িয়া, আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এক কূল অবলম্বন করিয়াছি। যাহারা এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া এবং সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ও চরণ ধ্যান করিতে পারে, তাহাদের সোণায় সোহাগা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু লিখিতে পড়িতে বা বলিতে শুনিতে যত সহজ বলিয়া বোধ হয়, নিয়ম পালন করা তত সহজ নহে। যাহা হউক, যোগ সাধন করিতে করিতে এক দৃঢ় অভ্যাসের সহিত অনুশীলন করিতে করিতে সাংসারিক আসক্তি দূরীভূত হইবে। তবে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিতে হইলে মোটামুটি কতকগুলি

বিশেষ নিয়ম

পালন করিতে হইবে ; নতুবা যোগ সাধন হয় না। প্রথমতঃ আহার। খাদ্যের সঙ্গে শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ ; আবার শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধন ভজন হয় না। এই জন্য শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ।

—যোগশাস্ত্র

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে শরীর রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। শরীর পীড়াগ্রস্ত বা অকর্ম্মণ্য হইলে সাধনই হয় না। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যাহা দেহ ও মনের উন্নতিকর এবং হিতজনক, তাহাই প্রশস্ত খাদ্য। যাহা উদরস্থ হইলে দেহে কোন প্রকার রোগ না হয়, অথচ শরীর বলিষ্ঠ হয়, চিত্তের প্রসন্নতা সংসাধিত হয়, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সম্প্রসারণ হয়, শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহার্য্যই প্রশস্ত। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর খাদ্য ভক্ষণ করা আহারের চরম উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ইহ-পরকালের সুখ হয়, ইহকালে অরোগী এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিকাশ হয় তাহাই আহার করিলে পরজীবনে সুখী হইতে পারা যাইবে। ফল কথা, আহারীয়ের গুণানুসারে মানুষের গুণের তারতম্য হয়। অতএব আহার্য্য বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি এই—

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলাভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিত স্মৃতিলাভ হয় এবং স্মৃতিলাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে। অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আহারশুদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। সত্ত্ব-গুণই সকলের চরম লক্ষ্যস্থানীয়, সুতরাং সাধকগণ রজস্তমোগুণবিশিষ্ট খাদ্য কদাপি ভোজন করিবে না। শালি আতপ তণ্ডুল, পাকা কলা, ইক্ষু-চিনি, দুগ্ধ ও ঘৃত যোগিগণের প্রধান খাদ্য।

অতিশয় লবণ, অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয়

তীক্ষ্ণ, অতিশয় রুক্ষ, বিদাহী দ্রব্য, পেঁয়াজ, রসুন, হিং, শাক-শব্জি, দধি, ঘোল প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। পরিষ্কৃত, সুরস, স্নেহযুক্ত ও কোমল দ্রব্য দ্বারা উদরের তিনভাগ পূর্ণ করিয়া বাকি অংশ বায়ু চালনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে।

শাকের মধ্যে বালশাক, কালশাক, পলতা, বেতুয়া ও হিঞ্চা এই পঞ্চ-বিধ শাক যোগীর ভক্ষ্য। লঙ্কার ঝাল খাওয়া উচিত নহে। প্রতিদিন পরি-মিত পরিমাণে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি তেজস্কর দ্রব্য ভক্ষণ করিবে।

যোগসাধন সময়ে অগ্নিসেবা, নারীসঙ্গ, অধিক পথপর্য্যটন, সূর্য্য দর্শন, প্রাতঃস্নান, উপবাস কিম্বা গুরুভোজন এবং ভারবহনাদি কোন প্রকার কায়ক্লেশ করা কর্ত্তব্য নহে।

সুরাপান বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন বিধেয় নহে। আহার করিয়া বা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া, পরিশ্রান্ত বা চিন্তা-যুক্ত হইয়া যোগভ্যাস করিবে না। ক্রিয়ার পর পরিশ্রম-জনিত ঘর্ম্ম দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন করা উচিত। নতুবা শরীরের সমস্ত ধাতু নষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রথম বায়ু-ধারণা অভ্যাসকালে খুব অল্পে অল্পে ধারণ করিবে, যেন রেচনের পর হাঁপাইতে না হয়। যোগ সাধনকালে মন্ত্র-জপাদি বিধেয় নহে। উৎসাহ, ধৈর্য্য, নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান, সাহস এবং লোকসঙ্গ পরিত্যাগ এই ছয়টী যোগসিদ্ধির কারণ।

আলস্য যোগসাধনের একটী প্রধান বিঘ্ন ; নিরলস হইয়া সাধন-কার্য্য করা আবশ্যক। যোগশাস্ত্র পাঠ কিম্বা যোগের কথা অনুশীলন করিলে যোগসিদ্ধি হয় না। ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ। পরিশ্রম না করিলে কোন কার্য্যই সফল হয় না। মহাজন-বাক্য এই যে—

"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।"

মানুষ চেষ্টা না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। এক একটী বিষয় সুসিদ্ধ

করিবার জন্য মানবের কত যত্ন, কত ক্লেশ, কত অনুষ্ঠান করিতে হয়, কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা কার্য্যকারক ব্যক্তিমাত্রেরই অবগত আছেন। অতএব সর্ব্বদা আলস্য ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করা চাই। সাধন কার্য্যে না খাটিলে ফল হয় না। একাগ্রচিত্তে নিত্য নিয়মিতরূপে পশ্চাদুক্ত যে কোন ক্রিয়া যথানিয়মে অভ্যাস করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

যোগভ্যাস-কালে অন্যায়পূর্ব্বক পরধন হরণ, প্রাণিহিংসা ও পীড়ন, লোকদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, অসত্যভাষণ এবং সংসারে অত্যাসক্তি অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়। অপর ধর্ম্মের নিন্দা করিতে নাই। গোঁড়ামি ভাল নহে—ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামিতে মহাপাতক হয়। ধর্ম্মের নিন্দা নরকের কারণ। সকলের ভাবা উচিত, যিনি যে নামে ডাকুন, যে ভাবে ডাকুন, যেরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান করুন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? কেহ অবশ্য ভগবান ব্যতীত আমার বা তোমার উপাসনা করিতেছে না, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নীচতা নাই; যিনি স্ব-ধর্ম্মে থাকিয়া স্ব-ধর্ম্মোচিত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব গীতার ভগবদুক্তি—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

এই বাক্য দৃঢ় রাখ, কিন্তু কদাচ অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করিও না। মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥

সকলের সহিত বৈস, সকলের সহিত আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ

কর, সকলকেই হাঁ মহাশয়—হাঁ মহাশয় বল, কিন্তু আপনার ঠাঁই বসিয়া রহিও অর্থাৎ আপনার ভাব দৃঢ় রাখিও।

যোগিগণের শাস্ত্র লইয়া বাদানুবাদ করা উচিত নয়। এ শাস্ত্র ও শাস্ত্র করিয়া কতকগুলি পুঁথি পড়াও ভাল নহে। কারণ শাস্ত্র অনন্ত, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের ও সর্ব্বপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এক এবং ফলও এক। গুরুকৃপায় প্রকৃত জ্ঞান না হইলে শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা বুঝা যায় না। শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেবল বিরাট্ তর্কজাল বিস্তারপূর্ব্বক বৃথা কচ্‌কচি করিয়া বেড়ান। এইরূপ পল্লবগ্রাহী কখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যোগ শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্।
জ্ঞানানাং বহুতা সেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা॥

সাধনা পথের সারভূত ও কার্য্য-সাধনোপযোগী জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। , তদ্ব্যতীত জ্ঞানিসমাজে বিজ্ঞ সাজিবার জন্য পল্লবগ্রাহিতা যোগবিঘ্নকারী হয়। অতএব—

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

এই মহাজনবাক্যানুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। এই জন্য বলি—হিন্দু-শাস্ত্র অনন্ত, মুনিঋষিও অনন্ত, কিন্তু আমাদের আয়ুঃ অতি অল্প; সর্ব্বদা সাংসারিক কার্য্যের ঝঞ্ঝাট; সুতরাং একজনের জীবনে সমস্ত শাস্ত্র অধীত হওয়া এবং প্রকৃত ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া খিঁচুড়ী না পাকাইয়া সর্ব্ব জাতির আদরণীয়, মানবজীবনের

উপদেষ্টা একমাত্র ধর্ম্মজ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ করা কর্ত্তব্য। যদিও গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার মত লোক সমাজে সুলভ নহে, তথাপি বারম্বার গীতা পাঠ এবং ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। লোকদেখান ভণ্ডামী—লোক-ভুলানো ভোগলামী না করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়ম পালন করিয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে ক্রমশঃ সংসারাসক্তি নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত লয় হইবে। মনোলয় হইলে আর চাই কি ? অতুল জ্ঞানী তুলসীদাস বলিয়াছেন—

রাজা করৈ রাজ্যবশ, যোদ্ধা করৈ রণজয় ;
আপন মন্‌কো বশ করৈ জো, সব্‌কা সেরা রহ ॥

বাস্তবিক আপনার মনোজয় পূর্ব্বক বশীভূত করা বড়ই কঠিন ; যিনি মনোজয় করিয়াছেন, তাঁহারই মানব-জীবন সার্থক। মহাত্মা কবীর সাহ বলিয়াছেন,—

তন্‌থির মন্‌থির বচন্‌থির সুরত নিরত থির্ হোয়।
কহে কবীর ইস্ পলক্ কো কলপ না পারে কোঈ ॥”

অতএব সাধকগণ যোগ সাধনকালে এই নিয়মগুলি পালন করিতে উপেক্ষা করিবে না। আরও এক কথা, যে যে-ভাবে সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে সর্ব্বপ্রকারে তাহা গোপন রাখিবে। অনেকের এরূপ স্বভাব আছে যে নিজের বাহাদুরী জানাইয়া লোক-সমাজে বাহবা পাইবার জন্য এবং নাম যশ ও মান লাভের জন্য নিজের সাধনকথা সাধারণের সমক্ষে গল্প করে। কেহ বা সাধন ফল কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেই লোকসমক্ষে প্রকাশ করে। ইহা নিতান্ত বোকামী, সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে সাধকের বিশেষ ক্ষতি হয়। যোগেশ্বর মহাদেব বলিয়াছেন,—

যোগবিদ্যা পরা গোপ্যা যোগিনাং সিদ্ধিমিচ্ছতাং।
সেযা বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্বীর্য্যা চ প্রকাশিতা॥

—যোগশাস্ত্র

যে যোগী যোগসিদ্ধির বাসনা করে, সে অতি গোপনে সাধনকার্য্য সম্পাদন করিবে। ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া গুপ্তভাবে রাখিলে বীর্য্যবতী হয়; আর প্রকাশ করিলে নির্বীর্য্য ও নিষ্ফল হয়। এজন্য যে যেভাবে সাধন করুক, কিম্বা সাধন-ফল কিছু কিছু অনুভূত হউক, প্রাণান্তেও প্রকাশ করিবে না। আর ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করতঃ সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—গীতা, ১৮।৬৬

অতএব সর্ব্বতোভাবে সেই কৃষ্ণচরণে* শরণাপন্ন হইয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই সুফল প্রাপ্ত হইবে। কারণ তাঁহার চিন্ময় তাঁহার ভাস্কর জ্যোতিঃ হৃদয়ে আপতিত হইয়া দিব্যজ্ঞানের উদয়ে মুক্তিপথ সুগম হইবে। যেন স্মরণ থাকে, পুনরায় বলি,—

---

* কৃষ্ণের নাম নির্দ্দিষ্ট বলিয়া কেহ যেন সাম্প্রদায়িকতা ভাব আনিয়া কোন প্রকার কুসংস্কারের বশীভূত হইবেন না। আমি নিম্নলিখিত অর্থে কৃষ্ণশব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। যথা,—

কৃষি ভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ কিম্বা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ কালরূপেণ যঃ স কৃষ্ণঃ। কিম্বা কৃষিশ্চ পরমানন্দো ণশ্চ তদ্দাস্য কর্ম্মাণি ইতি কৃষ্ণঃ। আর একটী কথা মনে রাখুন—

কালী বলো কৃষ্ণ বলো কিছুতেই ক্ষতি নাই
চিত্ত পরিষ্কার রেখে এক মনে ডাকা চাই

ব্রহ্মচারী মিতাহারী ত্যাগী যোগপরায়ণঃ
অব্দাদূর্দ্ধং ভবেৎ সিদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

—গোরক্ষসংহিতা ৪

যোগিগণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন করিবে, মিতাহারী অর্থাৎ অপরিমিত আহার করিবে না, ত্যাগী অর্থাৎ কিছুতেই স্পৃহা রাখিবে না। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করিলে এক বৎসরে সিদ্ধি লাভ হয়।

কেশভস্মতুষাঙ্গারকীকসাদিপ্রদূষিতে
নাভ্যসেৎ পূতিগন্ধাদৌ ন স্থানে জনসঙ্কুলে।
ন তোয়বহ্নিসামীপ্যে ন জীর্ণারণ্যগোষ্ঠয়োঃ
ন দংশমশকাকীর্ণে ন চৈত্যে ন চ চত্বরে ॥

—স্কন্দ-পুরাণ

অতএব ঐরূপ যোগবিঘ্ন স্থান পরিত্যাগ করতঃ যতদূর সম্ভব গোপনীয় স্থানে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত ও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয়, এরূপ স্থানে পরিষ্কার টাট্‌কা গোময় দ্বার মার্জ্জনা করতঃ কুশাসন, কম্বলাসন কিম্বা ব্যাঘ্র-মৃগাদির চর্ম্মে উত্তর কিম্বা পূর্ব্ব মুখে উপবিষ্ট হইয়া, পুষ্প, চন্দন ও ধূপাদির গন্ধে আমোদিত করিয়া, অনন্যমনে নিশ্চিন্তচিত্তে যোগাভ্যাস করিবে।

আসন সাধন

—※—

স্থিরভাবে উপবেশন করার নাম আসন। যোগশাস্ত্রে চতুরশীতি লক্ষ আসন রহিয়াছে; তন্মধ্যে পদ্মাসন শ্রেষ্ঠ। যথা—

আসনং পদ্মকমুক্তম্।

—গারুড়, ৪৯

পদ্মাসন—

বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্তথা
দক্ষোরূপরি তথৈব বন্ধনবিধিং কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং।
তৎপৃষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ
এতদ্ব্যাধিবিকারনাশনকরং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে॥

—গোরক্ষ-সংহিতা

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ সংস্থাপন করিয়া উভয় হস্ত পৃষ্ঠদিক্ দিয়া বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাঙ্গুষ্ঠ ও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেন এবং হৃদ্দেশে চিবুক সংস্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন করার নাম **পদ্মাসন**।

পদ্মাসন দুইপ্রকার; যথা—মুক্ত ও বদ্ধ পদ্মাসন। প্রোক্ত নিয়মে উপবেশন করাকে **বদ্ধ পদ্মাসন** বলে, আর হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদিক দিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ না ধরিয়া উরু দুইটীর উপর হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া উপবেশনের নাম **মুক্ত পদ্মাসন**।

পদ্মাসন করিলে নিদ্রা, আলস্য ও জড়তা প্রভৃতি দেহের গ্লানি দূরীভূত

হয়। পদ্মাসন প্রভাবে কুণ্ডলিনী চৈতন্ত হয় এবং দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মাসনে বসিয়া দন্তমূলে জিহ্বাগ্র ধারণ করিলে সর্ব্বব্যাধি নাশ হয়।

সিদ্ধাসন—

যোনিস্থানকমঙ্ঘ্রিমূলঘটিতং কৃত্বা দৃঢ়ং বিন্যসেৎ
মেঢ়্রে পাদমথৈকমেব হৃদয়ে ধৃত্বা সমং বিগ্রহম্।
স্থাণুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োঽখিলদৃশা পশ্যন্ ভ্রুবোরন্তরং
চৈতন্যাখ্যকপাটভেদজনকং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে॥

—গোরক্ষসংহিতা

যোনিস্থানকে বাম পদের মূলদেশের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আর এক চরণ মেঢ়্রদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া এবং হৃদয়ে চিবুক বিন্যস্ত করতঃ দেহটীকে সমভাবে সংস্থাপন করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক অর্থাৎ শিবনেত্র হইয়া নিশ্চলভাবে উপবেশন করাকে **সিদ্ধাসন** বলে।

সিদ্ধাসন সিদ্ধিলাভের পক্ষে সহজ ও সরল আসন। সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে অতি শীঘ্র যোগ-নিষ্পত্তি লাভ হয়। তাহার কারণ এই যে, লিঙ্গমূলে জীব ও কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। সিদ্ধাসনের দ্বারা বায়ুর পথ সরল ও সহজগম্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্নায়ুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরের তড়িৎ শক্তি চলাচলের সুবিধা হয়। যোগশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে, সিদ্ধাসন মুক্তিদ্বারের কপাট ভেদ করে এবং সিদ্ধাসন দ্বারা আনন্দকরী উন্মনীদশা প্রাপ্ত হয়।

স্বস্তিকাসন—

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

জানু ও উরু এই উভয়ের মধ্যস্থলে পাদতলদ্বয়কে সম্যক্ প্রকারে

সংস্থাপনপূর্ব্বক সমকায়বিশিষ্ট হইয়া সুখে উপবেশন করাকে স্বস্তিকা-সন বলে। স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া বায়ু-সাধন করিলে সাধক অল্প সময়ের মধ্যেই বায়ুসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং বায়ুসাধনজনিত ব্যভি-চারেও কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।

এই তিন প্রকার আসন ব্যতীত ভদ্রাসন, উগ্রাসন, বীরাসন, মণ্ডূকা-সন, কূর্ম্মাসন, কুক্কুটাসন, গুপ্তাসন, যোগাসন, শবাসন, সিংহাসন ও ময়ূ-রাসন প্রভৃতি বহুবিধ আসন প্রচলিত আছে। নানাবিধ আসন অভ্যাস করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই; প্রাগুক্ত তিন আসনের মধ্যে যাহার যেটী সুবিধা হয়, সেই আসন অবলম্বন করিয়া যোগসাধন করিবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদীপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আসনের নামে হাসিয়া অস্থির হয়। তাহারা বলে,—"ঐরূপ ভাবে না বসিলে কি সাধন হয় না? আপন ইচ্ছামত বসিয়া সাধন করিবে, এত গণ্ডগোলে দরকার কি?" ইহার মধ্যে কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসিলে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-বৃত্তির ঐকান্তিকতা জন্মে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, দুঃখের চিন্তা বা নিরাশয় লোকে গণ্ডে হাত দিয়া উপবেশন করিয়া থাকে। সেই সময় ঐরূপ অবস্থায় উপবেশন যেন স্বাভাবিক এবং সেই চিন্তার উপযোগী। সিদ্ধ যোগিগণ বলেন, বিভিন্ন সাধনায় বিভিন্ন আসনে শরীর মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আরও এক কথা এই যে, যোগসাধনকালে দীর্ঘকাল একভাবে বসা যোগাভ্যাসের একটী প্রধানতম কার্য্য; কিন্তু এমনি তাহা ঘটিয়া উঠে না, এই জন্য আসনের প্রয়োজন। যোগাভ্যাসকালে যোগীর যে দৈহিক নূতন ক্রিয়া বা স্নায়ু-প্রবাহও নূতন পথে চালিত হয়, তাহা মেরু-দণ্ডের মধ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং মেরুদণ্ডকে যে ভাবে ও যে অবস্থায় রাখিলে ঐ ক্রিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই আসনপ্রণালীতে বিধিবদ্ধ আছে। মেরুদণ্ড, বক্ষোদেশ, গ্রীবা, মস্তক ও পঞ্জরাস্থি এই

সকলগুলি যে ভাবে রাখা আবশ্যক, তাহা ঐ আসনের বসিবার প্রণালীতেই ঠিক করা আছে। আসন করিলে সেজন্য আর অন্য কিছু শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। বিশেষতঃ আসন সিদ্ধি এমন কঠিন ত কিছু নহে। যত্নপূর্ব্বক কয়েকদিন মাত্র অভ্যাস করিলেই উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে।

প্রাগুক্ত তিন প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যেরূপ আসনে বসিলে কোন প্রকার কষ্টানুভব না হয়, সে সেই প্রকার আসনই অভ্যাস করিবে। আসন করিয়া বসিলে যখন শরীরে বেদনা বা কোনরূপ কষ্ট অনুভূত না হইয়া একরূপ আনন্দের উদয় হইবে, তখনই জানিবে সিদ্ধি হইয়াছে। উত্তমরূপে আসন অভ্যাস হইলে যোগসাধন আরম্ভ করিবে।

তত্ত্ব-বিজ্ঞান

একমাত্র দেবদেব মহেশ্বর নিরাকার নিরঞ্জন। তাঁহা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হয়। তৎপরে সেই আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই পাঁচটী মহাভূত পঞ্চতত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তিত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, আবার তাহা হইতেই পুনরুৎপন্ন হইয়া থাকে ; যথা—

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্॥

—ব্রহ্মজ্ঞান-তন্ত্র

পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই তত্ত্বেই তাহা লয়প্রাপ্ত হইবে। পঞ্চতত্ত্বের পর যে পরমতত্ত্ব, তিনিই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন। মানব-শরীর পঞ্চতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মৃত্তিকা হইতে অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক ও লোম এই পাঁচটী উৎপন্ন হইয়াছে। জল হইতে শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই পাঁচটী; বায়ু হইতে ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পাঁচটী; অগ্নি হইতে নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য এই পাঁচটি এবং আকাশ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ। ইহাদের মধ্যে আবার আকাশ—শব্দ এই একগুণ বিশিষ্ট; বায়ু—শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ যুক্ত; অগ্নি—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ত্রিগুণবিশিষ্ট; জল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ যুক্ত এবং পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ সমন্বিত। আকাশের গুণ কর্ণদ্বারা, বায়ুর গুণ ত্বক দ্বারা, অগ্নির গুণ চক্ষুদ্বারা, জলের গুণ জিহ্বাদ্বারা এবং পৃথিবীর গুণ নাসিকাদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরি।
সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তন্তে জ্ঞায়ন্তে তত্ত্বযোগিভিঃ॥

—পবন-বিজয় স্বরোদয়

এই পঞ্চতত্ত্বময় দেহে পঞ্চতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। তত্ত্ববিৎ যোগিগণ তৎসমস্ত অবগত আছেন। গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রটী পৃথিবী-তত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রটী জলতত্ত্বের স্থান, নাভিমূলে মণিপুর চক্রটী অগ্নিতত্ত্বের স্থান, হৃদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ুতত্ত্বের স্থান এবং কণ্ঠ-দেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশ তত্ত্বের। সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে যথাক্রমে

আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসাপুটে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। বাম বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহনকালে যথাক্রমে এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। তত্ত্ববিৎ যোগিগণ তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন।

তত্ত্ব-লক্ষণ

পঞ্চতত্ত্বের আট প্রকার লক্ষণ স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে। প্রথমে তত্ত্ব সংখ্যা, দ্বিতীয়ে শ্বাসসন্ধি, তৃতীয়ে স্বরচিহ্ন, চতুর্থে স্থান, পঞ্চমে তত্ত্বের বর্ণ, ষষ্ঠে পরিমাণ, সপ্তমে স্বাদ এবং অষ্টমে গতি।

মধ্যে পৃথ্বী হ্যধশ্চাপশ্চোর্দ্ধং বহতি চানলঃ।
তির্য্যগ্ বায়ুপ্রচারশ্চ নভো বহতি সংক্রমে॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

যদি নাসাপুটের মধ্যস্থান দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবী-তত্ত্বের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঐরূপ নাসাপুটের অধোভাগ দিয়া নিঃশ্বাস বহিলে জল-তত্ত্বের, ঊর্দ্ধভাগ দিয়া বহিলে অগ্নিতত্ত্বের, পার্শ্ব-দেশ দিয়া বহিলে বায়ুতত্ত্বের এবং নাসিকারন্ধ্রের সর্ব্বস্থান স্পর্শ করতঃ ঘূর্ণিতভাবে নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইলে আকাশ-তত্ত্বের উদয় হয় জানিবে।

মাহেয়ং মধুরং স্বাদু কষায়ং জলমেব চ।
তিক্তং তেজো বায়ুরম্ল আকাশঃ কটুকস্তথা॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

যদি মুখে মিষ্টস্বাদ অনুভূত হয়, তবে পৃথিবী-তত্ত্বের, কষায় স্বাদে জল তত্ত্বের, তিক্তস্বাদে অগ্নি-তত্ত্বের, অম্লস্বাদে বায়ু-তত্ত্বের এবং কটু আস্বাদে আকাশ-তত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে।

অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুরঙ্গুলম্।
দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুলং বারুণম্ ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র।

যখন বায়ু-তত্ত্বের উদয় হয়, তখন নিঃশ্বাসবায়ুর পরিমাণ অষ্ট অঙ্গুলি হইয়া থাকে। অগ্নি-তত্ত্বে চারি অঙ্গুলি, পৃথিবী-তত্ত্বে দ্বাদশ অঙ্গুলি, জল-তত্ত্বে ষোড়শ অঙ্গুলি এবং আকাশ-তত্ত্বে বিশ অঙ্গুলি শ্বাসবায়ুর পরিমাণ হইয়া থাকে।

আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ পীতা রক্তবর্ণো হুতাশনঃ।
মারুতো নীলজীমূত আকাশো ভূরিবর্ণকঃ ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

পৃথিবী-তত্ত্ব পীতবর্ণ, জল-তত্ত্ব শ্বেতবর্ণ, অগ্নি-তত্ত্ব লোহিতবর্ণ বায়ুতত্ত্ব নীল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং আকাশ-তত্ত্ব নানা প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চতুরস্রং চার্দ্ধচন্দ্রং ত্রিকোণং বর্ত্তুলং স্মৃতম্।
বিন্দুভিস্তু নভো জ্ঞেয়মাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণম্ ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

দর্পণোপরি শ্বাস পরিত্যাগ করিলে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহার আকার চতুষ্কোণ হইলে পৃথিবী-তত্ত্বের, অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় হইলে জল-তত্ত্বের, ত্রিকোণ

হইলে অগ্নি তত্ত্বের, গোলাকৃতি হইলে বায়ু-তত্ত্বের এবং বিন্দু বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে।

মানবদেহের যখন যে নাসিকায় শ্বাসবহন হয়, তখন উপরোক্ত পঞ্চতত্ত্ব ক্রমান্বয়ে উদয় হইয়া থাকে। কখন কোন তত্ত্বের উদয় হয় এবং তত্ত্বের গুণাদি বুঝিয়া তত্ত্বানুকূলে গমন, মোকদ্দমা ও ব্যবসাদি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু ভগবদ্দত্ত এমন সহজ উপায় আমরা জানি না বলিয়া আমাদের কার্য্যনাশ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়। কোন্ তত্ত্বের উদয়ে কিরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যয়ে, তদ্বিবরণ প্রকাশ করা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে; সুতরাং বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

এই পঞ্চতত্ত্ব সাধন করিলে সর্ব্বপ্রকার সাধন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হয়। স্থূল কথা, তত্ত্বসাধনে কৃতকার্য্য হইলে শারীরিক বৈষয়িক ও পারমার্থিক সকল কার্য্যেই সুখ ও সুসিদ্ধি হয়।

তত্ত্ব-সাধন

হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিযুগল দ্বারা দুই কর্ণকুহর, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা নাসারন্ধ্র যুগল, অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা মুখবিবর এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা চক্ষুযুগল আচ্ছাদিত করিলে যদি পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন পৃথিবী-তত্ত্বের, শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইলে জল-তত্ত্বের, লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নি-তত্ত্বের, শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ু-তত্ত্বের এবং বিন্দু বিন্দু নানাবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্ত্বের উদয় জানিতে হইবে।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতে মাটিতে দুই পা পশ্চাদ্দিকে মুড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া উপবেশন করিবে। পরে দুই হাত উল্টাইয়া দুই উরুতে স্থাপন করিবে অর্থাৎ উরুর উপর হাত দুইখানি চিৎ করিয়া রাখিবে, যেন অঙ্গুল্যগ্র পেটের দিকে থাকে। এইরূপ ভাবে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া একমনে ক্রমান্বয়ে পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

পৃথ্বী-তত্ত্বের ধ্যান—

লংবীজাং ধরণীং ধ্যায়েৎ চতুরস্রাং সুপীতাভাম্।
সুগন্ধাং স্বর্ণবর্ণত্বমারোগ্যং দেহলাঘবম্॥

লং বীজ পৃথ্বী-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক এইরূপে পৃথিবীর ধ্যান করিতে হইবে; যথা—এই তত্ত্ব উত্তম হরিদ্রাবর্ণ, হিরণ্য লাবণ্য-সংযুক্ত, চতুষ্কোণবিশিষ্ট, উত্তম গন্ধযুক্ত এবং আরোগ্য ও দেহের লঘুতাকরণ শক্তিসম্পন্ন।

জল-তত্ত্বের ধ্যান—

বংবীজং বারুণং ধ্যায়েদর্দ্ধচন্দ্রং শশিপ্রভং।
ক্ষুৎপিপাসাসহিষ্ণুত্বং জলমধ্যেষু মজ্জনম্॥

বং বীজ জল-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক এইরূপে জল-তত্ত্বের ধ্যান করিতে হইবে; যথা—এই তত্ত্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং ক্ষুৎপিপাসা সহন ও জলমজ্জন শক্তি-সমন্বিত।

অগ্নি-তত্ত্বের ধ্যান—

রংবীজং শিখিনং ধ্যায়েৎ ত্রিকোণমরুণপ্রভম্।
বহ্বন্নপানভোক্তৃত্বমাতপাগ্নিসহিষ্ণুতা॥

রং বীজ অগ্নি-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে—এই তত্ত্ব ত্রিকোণবিশিষ্ট, অরুণবর্ণ, বহু অন্নপান-ভোজন শক্তিসংযুক্ত এবং রৌদ্র ও আগ্নতেজ-সহনশক্তি-সমন্বিত।

বায়ুতত্ত্বের ধ্যান—

যং বীজং পবনং ধ্যায়েদ্বর্ত্তুলং শ্যামলপ্রভম্।
আকাশগমনাদ্যঞ্চ পক্ষিবদ্গমনং তথা॥

যং বীজ বায়ু-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে—এই তত্ত্ব গোলাকার শ্যামলবর্ণবিশিষ্ট এবং পক্ষিগণের ন্যায় গগনমার্গে গমনাগমন শক্তি-সমন্বিত।

আকাশ-তত্ত্বের ধ্যান—

হং বীজং গগনং ধ্যায়েৎ নিরাকারং বহুপ্রভম্।
জ্ঞানং ত্রিকালবিষয়মৈশ্বর্য্যমণিমাদিকম্॥

হং বীজ আকাশ-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে ;—এই তত্ত্ব নিরাকার, বিবিধ বর্ণসংযুক্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত।

প্রত্যহ একপ্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া মাটিতে বসিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ধ্যান করিলে ছয়মাসে নিশ্চয়ই তত্ত্বসিদ্ধি হইবে। তখন দিবারাত্রের মধ্যে নিজ শরীরে কখন কোন্ তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা যখন তখন অতি সহজে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এবং শরীর সুস্থ রাখা ও সাংসারিক বৈষয়িক কার্য্যে সুফল লাভ করা যায়। তত্ত্বসিদ্ধি হইলে লয়যোগ এবং অন্যান্য যোগ সাধন বিশেষ সহজ এবং সুগম হয়। আকাশ-তত্ত্বের উদয়ে সাংসারিক কার্য্যাদি না করিয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয়।

তত্ত্বসাধন করিবার সময় কোন প্রকার যোগ সাধনও করা যায়। অতএব তত্ত্ব-সাধন করিবার সময় বসিয়া না থাকিয়া কোন প্রকার যোগ-সাধন করাও কর্ত্তব্য।

তস্য রূপং গতিঃ স্বাদো মণ্ডলং লক্ষণন্ত্বিদম্।
যো বেত্তি বৈ নরো লোকে স তু শূদ্রোঽপি যোগবিৎ॥

—পবন-বিজয় স্বরোদয়

এইরূপে যিনি তত্ত্বসকলের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল ও লক্ষণসকল অবগত হন, তিনি শূদ্র হইলেও যোগী বলিয়া অভিহিত হয়েন।

নাড়ী-শোধন

শরীরস্থ নাড়ী সকল মলাদিতে দূষিত থাকে; নাড়ী শোধন না করিলে বায়ু ধারণ করা যায় না। সুতরাং যোগসাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নাড়ী শোধন করিতে হয়। হঠযোগে ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীর শোধনের ব্যবস্থা আছে। যথা—

ধৌতির্ব্বস্তিস্তথা নেতি লৌলিকিস্ত্রাটকস্তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥

—গোরক্ষ-সংহিতা, ৪র্থ অঃ

ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ছয় প্রকার বহিঃক্রিয়ার দ্বারা শরীর শোধনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে সকল গৃহত্যাগী

সাধু সন্ন্যাসীরই সাজে, সাধারণের পক্ষে তাহা বড় দুষ্কর। বিশেষতঃ ইহা উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা। পরমযোগী শঙ্করাচার্য্য আন্তর প্রয়োগ দ্বারা যেরূপ নাড়ী শোধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রকরণ লিখিত হইল। ইহাই সকলের পক্ষে সুলভ।

আগে আসন অভ্যাস করিতে হয়, আসন সিদ্ধি হইলে, তারপরে নাড়ী-শোধন করিতে হয়।

স্থিরভাবে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট অল্প চাপিয়া বাম নাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু টানিয়া লইবে এবং বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসিকা বন্ধ করতঃ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ছাড়িয়া দিবে; আবার দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসিকা দ্বারা ঐ বায়ু গ্রহণ করিবে, কিন্তু গ্রহণ করা সমাপ্ত হইলে রেচন করিতে বিন্দুমাত্র কালও বিলম্ব করা উচিত নহে। প্রথম অভ্যাসকালে প্রতিবারে এইরূপ যে একবার, তাহার তিনবার করিতে হইবে। তার পরে তিনবার সুন্দর-রূপ অভ্যাস হইলে পাঁচবার, তারপরে সাতবার করিতে হয়।

সমস্ত দিবারাত্রের মধ্যে এই প্রকার একবার ঊষাকালে, একবার মধ্যাহ্নকালে, একবার সায়াহ্ন সময়ে এবং একবার নিশীথ সময়ে এই চারিবার ঐ ক্রিয়া করিতে হইবে। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে চারি সময়ে যত্নের সহিত অভ্যাস করিতে পারিলে এক মাসের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ হইবে। কাহারও কাহারও দেড় দুই মাস সময়ও লাগিতে পারে।

নাড়ী শোধনে সিদ্ধিলাভ করিলে দেহ খুব হাল্‌কা বোধ হইবে। আলস্য, জড়তা প্রভৃতি দূরীভূত হইবে। মধ্যে মধ্যে আনন্দে মন পূরিয়া উঠিবে এবং সময় সময় সুগন্ধে নাসিকা পূর্ণ হইবে। এই সকল লক্ষণ

প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে, নাড়ী-শোধন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পশ্চাদুক্ত যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

মনঃ স্থির করিবার উপায়

মনঃ স্থির না হইলে কোন কাজই হয় না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও ভূচরী, খেচরী মুদ্রাদি যত কিছু অনুষ্ঠান, সকলেরই চিত্ত-বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক মনোজয় উদ্দেশ্য। মদমত্ত মাতঙ্গ সদৃশ প্রমত্ত মনকে বশীভূত করা সুকঠিন; কিন্তু উপায় আছে।

যাহার যে আসন অভ্যাস আছে, সে সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া স্বীয় শরীরকে সোজা করিয়া বসিবে। পরে নাভিমণ্ডলে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ নিমেষোন্মেষ-বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে। নাভিস্থানে দৃষ্টি ও মন রাখিলে নিশ্বাস ক্রমে যত ছোট হইবে, মনও তত স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে। এই ভাবে নাভির প্রতি দৃষ্টি ও মন রাখিয়া বসিলে কিছুক্ষণ পরে মনঃ স্থির হইবে। মনঃ স্থির করিবার এমন কৌশল আর নাই। অপিচ—

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা॥

—ত্রিপঞ্চাঙ্গ যোগ

ইষ্টদেবের চিন্তা বা কোন ধ্যান-ধারণায় মন নিযুক্ত করিবার সময়ে মন যদি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে মন যে বিষয়ে

থাকিত হইবে, সেই বিষয় আত্মানুভবে সমরস বোধে সর্ব্বত্র ইষ্টদেব অথবা ব্রহ্মময় ভাবিয়া চিত্ত ধারণা করিবে। এইরূপ করিলে বিষয় ও ইষ্টদেবতা কিম্বা বিষয় ও ব্রহ্ম অভিন্ন—একবোধে চিত্তের ধারণা বৃদ্ধি পাইয়া অতি সত্বরেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। এই উপায় ব্যতীত চিত্ত জয় করিবার সুগম পন্থা ও সহজ উপায় আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি আপনাকে ও জগতের সমস্ত পদার্থ ইষ্টদেব হইতে অভিন্ন ভাবে এবং তাঁহাকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করে, মুক্তি তাহার করতলগত। এই দুই উপায় ব্যতীত—

ত্রাটক যোগ

অভ্যাস করিলে সহজেই মনঃস্থির হয় এবং নানাবিধ শক্তি লাভ হইয়া থাকে; অভ্যাস করাও সহজ। যথা—

নিমেষোন্মেষকং ত্যক্ত্বা সূক্ষ্মলক্ষ্যং নিরীক্ষয়েৎ।
যাবদশ্রুনিপাতঞ্চ ত্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

স্থিরভাবে সুখে উপবিষ্ট হইয়া ধাতু কিম্বা প্রস্তরনির্ম্মিত কোন সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে। ঐরূপ চাহিয়া থাকিবার সময় শরীর না পড়ে, মন কোন প্রকার বিচলিত না হয়—এই রূপে যতক্ষণ চক্ষু দিয়া জল না পড়ে, ততক্ষণ চাহিয়া থাকিবে। অভ্যাস ক্রমে বহু সময় ঐরূপ চাহিয়া থাকিবার শক্তি জন্মিবে।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ বন্দুকেন্দ্রে দৃষ্টিপূর্ব্বক একাগ্র হইয়া যতক্ষণ চক্ষুতে জল না আইসে, ততক্ষণ থাকিতে থাকিতে ক্রমে দৃষ্টি ঐস্থলে আবদ্ধ হয়। এরূপ হইলে ত্রাটক সিদ্ধ হইয়া থাকে।
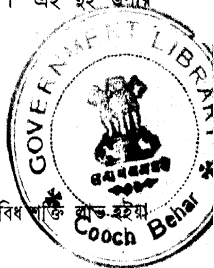
ত্রাটক সিদ্ধ হইলে, চক্ষুর দোষ নষ্ট হয়, নিদ্রা তন্দ্রাদি আয়ত্তীভূত হয় ও চক্ষুর রশ্মিনির্গম প্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে মেস্‌মেরিজম্ (Mesmerism) তাহা ত্রাটকযোগেরই একটু আভাস মাত্র। ত্রাটকযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, মেস্‌মেরাইজ অতি সহজে করা যায়। তবে পাশ্চাত্য মেস্‌মেরিজম্ আর ত্রাটকযোগে অনেক ব্যবধান। কেননা, মেস্‌মেরিজম্‌কারী জানে না যে কি দিয়া কি হইতেছে, কিন্তু ত্রাটকযোগী মোহিষ্ণুর এবং নিজের সকল সংবাদই রাখে। ত্রাটক সিদ্ধ হইলে হিংস্র জন্তুগণ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে।

একদা আমার যোগশিক্ষাদাতা মহাপুরুষের সহিত পার্ব্বত্য বনভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম ; সহসা একটা ব্যাঘ্র আমাদের সম্মুখীন হইল। আমি তো ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম. মহাপুরুষ আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার চক্ষুযুগলকে ব্যাঘ্রের চক্ষুর্দ্বয়ের অভিমুখে ঠিক সমসূত্রপাত-ক্রমে স্থাপিত করিয়া আপনার নেত্ররশ্মি সংযত করিলেন। ব্যাঘ্রের একপদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হইল না; সে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল, মহাপুরুষ যতক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেন, ব্যাঘ্রটী ততক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার চক্ষু হইতে স্বীয় দৃষ্টি অপসৃত করিবামাত্র ব্যাঘ্রটী দ্রুত বনমধ্যে প্রবেশ করিল, আর আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। পরে মহাপুরুষ আমাকে ত্রাটকযোগের শক্তিসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ত্রাটকযোগ অভ্যাস করিতে পারিলে সহজে লোককে নিদ্রিত, বশীভূত ও ইচ্ছামত কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

কুণ্ডলিনী চৈতন্যের কৌশল

কুণ্ডলিনী তন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, কুণ্ডলিনী চৈতন্য না হইলে তপ-জপ ও সাধন-ভজন বৃথা। কুণ্ডলিনী অচৈতন্য থাকিতে মানবের কখনই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে না। মানবজীবনে প্রধান কার্য্য ও যোগসিদ্ধির উপায় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন। যতগুলি সাধন আছে, সকলই কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিবার জন্য। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে যত্নের সহিত কুণ্ডলিনী চৈতন্য করা কর্ত্তব্য। মূলাধারপদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া সর্পিণীর আকারে নিদ্রিতা আছেন। যাবৎ তিনি দেহে নিদ্রিতা থাকেন, তাবৎ মানব পশুবৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে, তাবৎ কোটি কোটি যোগাভ্যাস দ্বারাও জ্ঞান জন্মে না। যেমন চাবি দ্বারা কুলুপ খুলিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটিত করা যায়, তেমনি কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া মূর্দ্ধাদেশে সহস্রার পদ্মে আনীত করিলেই ব্রহ্মদ্বার ভেদ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথ উন্মুক্ত হয়। ইহাতেই মানবের দিব্য জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

বামপায়ের গোড়ালী দ্বারা যোনিদেশ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া দক্ষিণ পদ ঠিক সোজা ও সরলভাবে ছড়াইয়া বসিবে, তৎপর ঐ দক্ষিণ পদ দুই হাত দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিবে এবং কণ্ঠে চিবুক স্থাপিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু রোধ করিবে। পরে প্রাণায়ামের প্রণালী ক্রমে ধীরে ধীরে ঐ বায়ু রেচন করিবে। দণ্ডাহত সর্প যেমন সরলভাব ধারণ করে, তেমনি এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কুণ্ডলিনীশক্তি ঋজু আকার ধারণ করিবেন।

বিঘতপ্রমাণ দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত, কোমল, শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টিত করিয়া কটিসূত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে ভস্ম-

দ্বারা গাত্র লেপন করতঃ গোপনীয় গৃহমধ্যে সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসাপুট দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক অপান বায়ুতে যুক্ত করিবে এবং যে পর্য্যন্ত সুষুম্না বিবরে বায়ু গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অশ্বিনীমুদ্রা দ্বারা গুহ্যদেশকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে। এইরূপ বদ্ধশ্বাস হইয়া কুম্ভক যোগদ্বারা বায়ুরোধ করিলে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইয়া সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধে গমন করিবেন।

ঐরূপ ক্রিয়ায় কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে যোনিমুদ্রাযোগে উত্থাপন করাইতে হয়। মূলাধার হইতে ক্রমে সমস্ত চক্রগুলি ভেদ করতঃ সহস্র-দলপথে উঠিয়া পরমশিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহাদের সামরস্য-সম্ভূত অমৃত দ্বারা শরীর প্লাবিত হইতে থাকে। সেই সময় সাধক সমস্ত জগৎ বিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় অপার আনন্দে মগ্ন হয়, তাহা নিজে অনুভব ভিন্ন লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। স্ত্রীসংসর্গে শরীর ও মনে যেরূপ অনির্দ্দেশ্য আনন্দ অনুভব হয়, তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক আনন্দ হইয়া থাকে। সে অব্যক্ত ভাব ব্যক্ত করিবার মত ভাষা নাই।*

কুণ্ডলিনী শক্তিকে কিরূপে উত্থাপন করিতে হয়, তাহা মুখে বলিয়া না দেখাইয়া দিলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই, সুতরাং সে গুহ্য বিষয় অকারণ সাধারণ্যে প্রকাশ করা বৃথা। সাধক কেবলমাত্র কুণ্ডলিনী শক্তিকে চৈতন্য করার জন্য প্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে। কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিবার আর একটী সহজ উপায় আছে। তাহা এই—

সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে দৃঢ়রূপে চিবুক স্থাপন করিবে, পরে

*কিরূপে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিতে হয়, তাহার ক্রিয়া মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হাত দুইটি সম্পুটিত করিয়া দুই হাতের কনুই (অর্থাৎ বাহু মধ্যভাগ) হৃদয়ে দৃঢ়রূপে রাখিয়া নাভিদেশে বায়ু ধারণ করিবে এবং গুহ্যদেশকে অশ্বিনী মুদ্রা দ্বারা সঙ্কুচিত-প্রসারিত করিতে থাকিবে। এইরূপ নিত্য অভ্যাসে কুণ্ডলিনী শীঘ্রই চৈতন্য হইবে।

কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইয়া সুষুম্না নাল মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধক স্পষ্টানুভব করিতে পারে। সেই সময় পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ড মধ্যে পিপীলিকা পরিভ্রমণের ন্যায় সির্ সির্ করিবে।

লয়যোগ সাধন

যাহাদের সময় অল্প এবং যোগের নিয়ম পালনে অক্ষম তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিয়া পশ্চাল্লিখিত যে কোন লয়যোগ সাধন করিলেই চিত্ত লয় হইবে। বাহুল্য ভয়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিতে পারিলাম না। তবে যে কয়টী লয়সঙ্কেত লিখিলাম, ইহার মধ্যে যে কোন এক প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া মনোলয় করিবে। ইহা অতি সহজ, স্বল্পায়াসসাধ্য এবং শীঘ্র ফলপ্রদ।

১। মূলাধার চক্র ভগাকৃতি; এই চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গে তেজোরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া অধিষ্ঠিতা আছেন। ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিকে জীবরূপে ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও মুক্তি হইয়া থাকে।

২। স্বাধিষ্ঠান চক্রে প্রবালাঙ্কুর সদৃশ উড্ডীয়ান নামক পীঠোপরি কুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করিলে মনোলয় হয় এবং জগৎ আকর্ষণের শক্তি জন্মে।

৩। মণিপুর চক্রে পঞ্চাবর্ত্তবিশিষ্ট বিদ্যুদ্বরণী চিৎস্বরূপা ভুজগী শক্তির ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সর্ব্ব সিদ্ধিভাজন হয়।

৪। অনাহত চক্রে জ্যোতিঃস্বরূপ হংসকে ধ্যান করিলে, চিত্তলয় ও জগৎ বশীভূত হয়।

৫। বিশুদ্ধচক্রে নির্ম্মল জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

৬। তালুমূলে ললনাচক্রকে ঘন্টিকাস্থান ও দশমদ্বার মার্গ কহে। এই চক্রে ধ্যান করিলে মুক্তি হয়।

৭। আজ্ঞাচক্রে বর্ত্তুলাকার জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। ব্রহ্মরন্ধ্রে অষ্টম চক্রস্থিত সূচিকার অগ্রতুল্য ধূম্রাকার জালন্ধর নামক স্থানে ধ্যান দ্বারা চিত্তলয় করিলে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়।

৯। সোমচক্রে পূর্ণা সচ্চিদ্রূপা অর্দ্ধশক্তিকে ধ্যান করিলে মনোলয় ও মোক্ষপদ লাভ হয়।

এই নবচক্রের মধ্যে এক একটী চক্রের ধ্যানকারী সাধকগণের সিদ্ধি ও মুক্তি করতলগত। কারণ তাঁহারা জ্ঞাননেত্র দ্বারা কোদণ্ডদ্বয় মধ্যে কদম্বতুল্য গোলাকার ব্রহ্মলোক দর্শন এবং অন্তে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি ঋষিগণ নবচক্রে লয়যোগ সাধন করিয়া যমদণ্ড-খণ্ডন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। যথা—

> কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতো লয়সংজ্ঞিতঃ।
> নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ॥
>
> —যোগশাস্ত্র

অর্থাৎ বেদব্যাসাদি মহাত্মগণ নবচক্রে মনোলয় করিয়া লয়যোগ সাধন

করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও বহুবিধ লয় ও লক্ষ্যযোগসঙ্কেত শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা—

১০। পরম আনন্দের সহিত স্বীয় হৃদয় মধ্যে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিলে আত্মলীন হয়।

১১। নির্জ্জনস্থানে শববৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া একাগ্রচিত্তে নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া ধ্যান করিলে শীঘ্রই চিত্ত লয় হয়। ইহা চিত্ত লয় করিবার প্রধান ও সহজ উপায়।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে, অনেক লোককে 'মুখচাপায়' ধরে। তখন বোধ হয়, যেন বুকের উপর কেহ চাপিয়া বসিয়া আছে, শরীর ভারী বোধ হয়, ভয়ে চীৎকার করিতে গেলে স্পষ্ট কথা বাহির না হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করে। ইহাতেই লয় যোগের আভাস পাওয়া যায়।

১২। জিহ্বাকে তালুমূলে সংলগ্ন করিয়া ঊর্দ্ধগত করিয়া রাখিবে। ইহাতে চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমপদে লীন হয়।

১৩। নাসিকোপরি দৃষ্টি স্থির করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি পীতবর্ণ কিম্বা অষ্টাঙ্গুল রক্তবর্ণ জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও বায়ুস্থির হয়।

১৪। ললাটোপরি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে মনোলয় ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

১৫। দেহ মধ্যে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপকলিকার ন্যায় অষ্টাঙ্গুল জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে জীব মুক্ত হয়।

১৬। ভ্রূদ্বয় মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ ধ্যান করিলে ঈশ্বর সন্দর্শন লাভ হয়।

ইহার মধ্যে যাহার যেরূপ ক্রিয়াটী সুবিধা বোধ হয়, সে সেইরূপে মনোলয় করিবে।

শব্দশক্তি ও নাদ সাধন

—✻—

শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃত-পুরুষমূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতিঃ মাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভকালে সেই সর্ব্বব্যাপী জ্যোতিঃ আত্মা অভেদ-ভাবে নাদবিন্দুরূপে প্রকাশমান হন। বিন্দু পরম শিব আর কুণ্ডলিনী নির্ব্বাণকলারূপা ভগবতী ত্রিপুরা দেবী স্বয়ং নাদরূপা, যথা—

আসীদ্বিন্দুস্ততো নাদো. নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা।
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমা কলা॥

—বায়বী সংহিতা

আদি প্রকৃতি দেবীর নাম পরা প্রকৃতি; সুতরাং পরা প্রকৃতি আদ্যা-শক্তিই নাদরূপা। এই প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়। প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশের গুণ শব্দ, অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ হইতে ক্রমে অন্যান্য মহাভূত এবং এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হয়। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ "নাদাত্মকং জগৎ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবেই দেখ, শব্দ কি প্রকার ক্ষমতাশালী। যোগবলশালী ঋষিগণের হৃদয় হইতে শব্দ গ্রথিত ও মন্ত্ররূপে উত্থিত হইয়া এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বীর্য্যশালী হইয়াছে। শব্দ দ্বারা না হয় কি? একজন বয়স্যগণের সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছে, এমন সময় যদি অদূরে করুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয়, তবে কখনও স্থিরচিত্তে আমোদে মত্ত থাকিতে সক্ষম হইবে না। আমি একজনকে ভালবাসি না, সে যদি কাতরে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে আমার স্তব করে, নিশ্চয়ই আমার কঠিন হৃদয় দ্রব হইবে। শব্দেই সকলে পরস্পর আবদ্ধ। কোকিলের কুহু শব্দ শুনিলে, ভ্রমরের গুণ্ গুণ ধ্বনি

কর্ণগোচর হইলে মনে কোন এক অজানা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের পুরাতন কাহিনী মনে আইসে। আবার মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন, ময়ূরের কেকারব, ইহা শ্রবণে অন্য প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়; মন কোন্ অমূর্ত্ত প্রতিমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ফেলে। শব্দই সঙ্গীতের প্রাণ; তাই গান শুনিয়া লোক আত্মহারা—পাগলপারা হইয়া যায়। শব্দে জীব মোহিত হয়, শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত; হরি এবং হরও নাদ হইতে অভিন্ন নহেন।

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরো হরিঃ॥

নাদের অন্ত নাই, অসীম, অপার। তাই হিন্দু-শাস্ত্রকর্ত্তা বলিয়াছেন—

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥

কথাটী প্রকৃত বটে। নাদানুসন্ধানকারী তত্ত্বজ্ঞানী যোগী এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন। নাদরূপ সমুদ্রের পরপার যখন সরস্বতীর অজ্ঞাত, তখন মৎসদৃশ সামান্য ব্যক্তির নাদের স্বরূপ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

নাদের অন্য নাম পরা। এই পরা মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী, হৃদয়ে মধ্যমা এবং মুখে বৈখরী।

আন্তেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥

—বাক্যপদীয়

সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান, স্বীয় রূপের অভিব্যক্ত্যর্থ

শব্দরূপে বৈখরী অবস্থায় নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে যে আন্তরজ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, মনের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হইলে সেই অব্যক্ত আন্তরজ্ঞান প্রব্যক্ত হইয়া বৈখরী অবস্থায় মুখে প্রকাশ পায়।

মূলাধার পদ্ম হইতে প্রথম উদিত নাদরূপ বর্ণ উত্থিত হইয়া হৃদয়গামী হইয়াছে। যথা—

স্বয়ং প্রকাশ্যা পশ্যন্তী সুষুম্নাম শ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী॥"

হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে এই নাদ স্বতঃই উত্থিত হইতেছে। অন+আহত=অনাহত; অর্থাৎ বিনা আঘাতে ধ্বনি হয়, এই বলিয়া হৃদয়স্থিত জীবাধার পদ্মের অনাহত নাম হইয়াছে। সদ্‌গুরু অভাবে এবং নিজের মন অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন বিষয়বিমূঢ় বিধায় ঐ নাদধ্বনি উপলব্ধি করিতে পারে না। সুকৃতিবান্ সাধকগণ লিখিত কৌশল অবলম্বনে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে স্বতঃ উত্থিত অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসামান্য অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় অতি সহজে ও শীঘ্রই মনোলয় করা যায় এবং মুক্তিপদ লাভ হয়।

যত প্রকার লয়যোগ আছে, তন্মধ্যে এই নাদসাধন প্রধান। ক্রিয়াও অতি সহজ এবং সুখসাধ্য। শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

নাদানুসন্ধানং সমাধিমেকং মন্যামহে অন্যতমং লয়ো নাম।

যথা নিয়মে সাধন করিলে নাদধ্বনি সাধকের শ্রুতিগোচর হয়, এবং সমাধিভাবে পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে। এই নাদতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত যোগী গুরু। যথা—

যো বা পরাঞ্চ পশ্যন্তাং মধ্যমামপি বৈখরীম্ ।
চতুষ্টয়ীং বিজানাতি স গুরুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

—নবচক্রেশ্বর

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী প্রভৃতি নাদতত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। এইরূপ গুরুর নিকট যোগোপদেশ লইয়া সাধন করিবে ; নতুবা ভড়ং-ভাড়ং দেখিয়া বা রচন-বচন শুনিয়া ভুলিলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে।

নাদতত্ত্বের যেটুকু আভাস দিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিলে পারিবে যে, নাদই আদ্যাশক্তি। পূর্ব্বেও অন্যান্য শীর্ষকে বলিয়াছি, তপ জপ বা সাধন-ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য কুণ্ডলিনী-শক্তির চৈতন্য সম্পাদন। অতএব শৈব, বৈষ্ণব বা গাণপত্য প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায় গোঁড়ামী করিয়া যতই বড়াই করুক, প্রকারান্তরে সকলেই শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে। 'শক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই'—এই প্রবাদবাক্য তাহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কয়টি লোক জানে ? জানিলে আর গোঁড়ামী করিয়া নরকের পথ পরিষ্কৃত করিত না। আমি জানি, বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকে শক্তি মূর্ত্তিকে প্রণাম এবং তৎনিবেদিত প্রসাদাদি গ্রহণ করেন না। কি মূর্খতা ! প্রকৃতি পুরুষ এক। সুতরাং ভগবান এবং দুর্গা-কালী প্রভৃতি সকলেই অভিন্ন—এক। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গাদি সকলকেই অভেদভাবে এক জ্ঞান না করিলে সাধনার ধারেও যাইবার উপায় নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

নানাভাবে মনো যস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে।

যাহার মন ভেদজ্ঞানযুক্ত তাঁহার মুক্তি হয় না। আবার দেখুন,—

নানা তন্ত্রে পৃথক্ চেষ্টা ময়োক্তা গিরিনন্দিনি।
ঐক্যজ্ঞানং যদা দেবী তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াঃ ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৬ পঃ

হে গিরিনন্দিনি, নানাতন্ত্রে আমি পৃথক্ পৃথক্ বলিয়াছি ; যে ব্যক্তি তাহা এক ভাবিয়া অভিন্ন জ্ঞান করিবে, তাহার সিদ্ধি লাভ হইবে। মহাদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন,

শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।

হে দেবি! শক্তিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-কামনা হাস্যজনক ও বৃথা। এই শক্তি বৈরাগীদিগের মহিমান্বিতা মাতাজী মহাশয়ারা নহে ; সেই নির্ব্বাণ-পদ-বিধায়িনী আদ্যাশক্তি ভগবতী কুণ্ডলিনী। ইহার স্বরূপ তত্ত্ব বর্ণনা সাধ্যাতীত।

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥

—চণ্ডী

জগতে সদসৎ যে কোন বস্তুর শক্তিই সেই আদ্যাশক্তির শক্তি-স্বরূপা। সুতরাং সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা ব্রহ্মজ্ঞান-বিনোদিনী কুলকুঠারঘাতিনী কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির স্বরূপশক্তি বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। অতএব পাঠকগণের মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া সেই চতুর্ব্বর্ণস্বরূপা, খেচরীবায়ুরূপা, সর্ব্বশক্তীশ্বরী, মহাবুদ্ধি-প্রদায়িনী, মুক্তিদায়িনী, প্রসুপ্তা ভুজগাকারা কুণ্ডলিনী-শক্তির আরাধনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পরাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিই নাদরূপা। সুতরাং হৃদ্দেশে জীবাধার পদ্ম হইতে স্বত-উত্থিত অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাধকগণ পরমানন্দ ভোগ ও মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে। শাস্ত্রকারগণ বলেন—

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ।
ম রুতস্য লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাশ্রিতঃ॥

—হঠযোগপ্রদীপিকা

মনই ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা, কারণ মনঃসংযোগ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্যক্ষম হয় না। মন প্রাণবায়ুর অধীন। এজন্য বায়ু বশীভূত হইলেই মন লয় প্রাপ্ত হয়। মন লয় হইয়া নাদে অবস্থিতি করে। নাদ অর্থে অনাহত ধ্বনি। যে পর্য্যন্ত না জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত অনাহত ধ্বনির নিবৃত্তি হয় না। যোগের চরম সীমায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা একীভূত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে ঐ অনাহতধ্বনি পরব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে।

শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তি র্ন সংশয়ঃ।"

—যোগতারাবলী

অতএব অশ্রুতপূর্ব্ব অনাহত নাদ শ্রবণ করিলে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, পাঠকগণ এই সকল অবগত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নাদ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। নাদসাধনের সহজ উপায় এই—

পূর্ব্বোক্ত যে কোন কৌশলে কুণ্ডলিনী চৈতন্য ও ব্রহ্মমার্গ পরিষ্কার হইলে নাদ সাধন আরম্ভ করিবে।

প্রথমতঃ ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু আকর্ষণ করিয়া ফুসফুসে বায়ু পূর্ণ করিতে হইবে। ঐ সময়েই স্নায়ুপ্রভাবে মনঃ-সংযোগ করিয়া ভাবিতে হইবে, যেন ঐ স্নায়ুপ্রবাহটী ইড়ানাড়ীর ভিতর দিয়া নিম্নদিকে নামিয়া কুণ্ডলিনী-শক্তির আধারভূত মূলাধার-পদ্মের সেই ত্রিকোণপীঠের উপর দৃঢ়রূপে আঘাত করিতেছে। এইরূপ করিয়া ঐ

স্নায়ুপ্রবাহকে কিয়ৎক্ষণের জন্য ঐ স্থানেই ধারণ কর। তদনন্তর চিন্তা কর যে, সেই সমস্ত স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহকে শ্বাসের সহিত অপর দিকে টানিয়া লইতেছে। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া প্রত্যহ ঊষাকালে একবার, মধ্যাহ্নকালে একবার এবং সায়ংকালে একবার করিতে হইবে। আর অর্দ্ধ রাত্রিকালে ঐরূপে ফুস্‌ফুসে বায়ু পূর্ণ করিয়া লইয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণরন্ধ্রযুগল বন্ধ করিয়া বায়ু ধারণ করিবে। যথাশক্তি ধারণ করিয়া অল্পে অল্পে রেচন করিবে। পুনঃ পুনঃ ধারণ করিতে করিতে ক্রমাভ্যাসে দক্ষিণ কর্ণে শরীরাভ্যন্তরস্থ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে।

যে কুণ্ডলিনী চৈতন্য বা ঐ সকল ক্রিয়া গোলযোগ মনে করে, তাহার পক্ষে আরও সহজ উপায় আছে। যথা—

নাভ্যাধারো ভবেৎ যষ্ঠস্তত্র প্রাণং সমভ্যসেৎ।
স্বয়মুৎপদ্যতে নাদো নাদতো মুক্তিরন্ততঃ॥

—যোগস্বরোদয়

যোগসাধনোপযোগী স্থানে যে কোন আসনে মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড সোজা করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ও নিশ্চিন্ত মনে নাভির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। এইরূপ নাভিস্থানে দৃষ্টি ও মন রাখিলে ক্রমে নিঃশ্বাস ছোট হইয়া কুম্ভক হইবে। প্রত্যহ যত্নের সহিত দিবারাত্রির মধ্যে তিন চারিবার ঐরূপ অভ্যাস করিলে কিছুদিন পরে স্বয়ং নাদ উত্থিত হইবে। অল্পে অল্পে বায়ু ধারণা করিলে নাদধ্বনি অতি শীঘ্রই শ্রুতিগোচর হয়।

এই দুই রকম কৌশলের যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই কৃতকার্য্য হইবে। প্রথমে ঝিল্লীরব অর্থাৎ ঝি ঝি পোকা যেমন ভাবে ডাকে,

সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইবে। তৎপরে ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে একে একে বংশীরব, মেঘগর্জ্জন, ঝাঁঝরী বাদ্যের ধ্বনি, ভ্রমর গুঞ্জন, ঘণ্টা কাংস্য, তূরী. ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইতে থাকে।

এইরূপ শব্দ শুনিতে শুনিতে কখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কোন শব্দ শুনিলে মাথা ঘুরিতে থাকে; কোন সময় কণ্ঠকূপ জলপূর্ণ হয়; কিন্তু সাধক কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন কার্য্য করিতে থাকিবে। মধুপানার্থী মধুকর যেমন প্রথমে মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মধুপান করিবার সময় মধুর স্বাদে এরূপ নিমগ্ন হয় যে তখন তাহার আর গন্ধের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। তদ্রূপ সাধকও নাদধ্বনিতে মোহিত না হইয়া শব্দ শুনিতে শুনিতে চিত্ত লয় করিবে।

ঐরূপ আরও অভ্যাসে হৃদয়াভ্যন্তর হইতে অভূতপূর্ব্ব শব্দ ও তাহা হইতে ঐ দ্রুত প্রতিশব্দ শ্রুতিগোচর হইবে। তখন সাধক নয়ন নিমীলিত করিয়া অনাহত পদ্মস্থিত বাণলিঙ্গ শিবের মস্তকে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় জ্যোতিঃ ধ্যান করিবে। ঐরূপ ধ্যান করিতে করিতে অনাহত পদ্মস্থ প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিবে।

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ॥
—গোরক্ষ সংহিতা

সেই দীপকলিকাকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে সাধকের মন সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরম পদে লীন হইবে। তখন শব্দ রহিত এবং মন আত্মতত্ত্বে মগ্ন হইবে। সাধক সর্ব্বব্যাধিবিমুক্ত ও তেজোযুক্ত হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে। সেই সময়ের ভাব অনির্ব্বচনীয়! অবর্ণনীয়!! অলেখনীয়!!!

—*—

আত্মজ্যোতিঃ দর্শন

জ্যোতিই ব্রহ্ম।, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র জ্যোতিঃ ছিল। পরে সৃষ্টি আরম্ভ হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ঐ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন হয়।

স ব্রহ্মা স শিবো বিষ্ণুঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
সর্ব্বে ক্রীড়ন্তি তত্রৈতে তৎসর্ব্বেন্দ্রিয়সম্ভবম্॥

সেই স্বপ্রকাশরূপী অক্ষর পরম জ্যোতিঃই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বাচ্য। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই জ্যোতির্ম্মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন। এই জ্যোতিই আত্মারূপে মানব-দেহের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। আত্মা ব্রহ্মরূপ হইয়াও মায়া-প্রভাবে বিষয়াসক্ত বলিয়া নিজকে নিজে জানেন না। পরম ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বদেহেই বিরাজ করিতেছেন। যথা—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
—শ্রুতি

একদেব পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ় অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতাধিবাস সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল ও নির্গুণ। যেমন দুগ্ধমধ্যে মাখন, পুষ্পের অভ্যন্তরে সুগন্ধ এবং কাষ্ঠে অগ্নি নিহিত থাকে, তদ্রূপ দেহমধ্যে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন।

সকল মানবেরই প্রকাশ্য দুই চক্ষু ভিন্ন আর একটী গুপ্ত নেত্র আছে।

সেই তৃতীয় নেত্রের নাম গুরুনেত্র। যোগসাধন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও স্থির হইলে ঐ গুরুনেত্র প্রকাশিত হয়, তখন ভূত ভবিষ্যৎ এবং বহুদূর দূরান্তরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ গুরুনেত্র বা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে নিরালম্ব পুরীতে ঈশ্বর দর্শন বা ইষ্টদেব দর্শন কিম্বা কুণ্ডলিনীর স্বরূপরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই জ্ঞাননেত্র দ্বারাই দেহস্থিত ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্যোতঃ দর্শন করা যায়। যথা—

চিদাত্মা সর্ব্বদেহেষু জ্যোতীরূপেণ ব্যাপকঃ।
তজ্জ্যোতিশ্চক্ষুরগ্রেষু গুরুনেত্রেণ দৃশ্যতে॥

—যোগশাস্ত্র

চিদাত্মা জ্যোতীরূপে সকল দেহেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন; গুরুনেত্র দ্বারা চক্ষুর অগ্রভাগে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই আত্মজ্যোতিঃ সর্ব্বথা শান্ত, নিশ্চল, নির্ম্মল, নিরাধার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প দীপ্তিমান। দুগ্ধ মন্থন করিয়া যেমন নবনীত উত্তোলন করা যায়, সেইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান দ্বারা আত্ম দর্শন হইলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে আত্মদর্শন করা কর্ত্তব্য; শাস্ত্রবাক্য এই—

আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।

অর্থাৎ আত্মদর্শন মাত্রে মানব নিচয় নিশ্চয় জীবন্মুক্ত হয়। অতএব সকলেরই আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা উচিত। অন্যান্য প্রকার যোগসাধন অপেক্ষা আত্মজ্যোতিঃ দর্শনক্রিয়া সহজ ও সুখসাধ্য। সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্যোতিঃ দর্শনের উপায় এই—

যোগ-সাধনোপযোগী স্থানে, সাধক স্থিরচিত্তে যথানিয়মে আসনে (যাহার যে আসন উত্তমরূপে অভ্যাস আছে) উপবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত

শুক্লাজে গুরুর ধ্যানান্তর প্রণাম করিবে। গুরুকৃপা ব্যতীত জ্যোতীরূপ আত্মদর্শন হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে,—

অনেকজন্মসংস্কারাৎ সদ্‌গুরুঃ সেব্যতে বুধৈঃ।
সন্তুষ্টঃ শ্রীগুরুদেব আত্মরূপং প্রদর্শয়েৎ ॥

—যোগশাস্ত্র

বহুজন্মজন্মান্তরের সংস্কার বশতঃ পণ্ডিত ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্তোষ সাধন করিলে, গুরুকৃপায় আত্মরূপ দর্শন করিয়া থাকে। অতএব গুরুধ্যান প্রণামান্তর মনঃস্থির পূর্ব্বক মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া স্বীয় শরীরকে সোজা করিয়া উপবেশন করিবে। পরে নাভিমণ্ডলে স্থির-দৃষ্টি রাখিয়া, উড্ডীয়ানবন্ধ সাধন করিবে। অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত অপান বায়ুকে গুহ্যদেশ হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক নাভিদেশে কুম্ভক দ্বারা ধারণ করিবে। যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ করিতে হইবে।

ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—১৩পঃ

ঐরূপ মানস যোগ ত্রিসন্ধ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে এই তিন সময়ে ঐরূপে নাভিদেশে বায়ু ধারণ করিবে। যাবৎ নাভিস্থিত অগ্নিকে জয় করিতে পারা না যায়, তাবৎ অনন্যমনে ঐরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

নাভিকমল হইতে তিনটী নাড়ী তিন দিকে গমন করিয়াছে। একটী উর্দ্ধমুখে সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত, আর একটী অধোমুখে আধার পদ্ম পর্য্যন্ত, অন্য একটী মণিপুর পদ্মের নাল স্বরূপ। এই নাড়ী সুষুম্নামধ্যস্থিত মণিপুর পদ্মের সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত যে, মণিপুর পদ্মনালে নাভিপদ্ম অবস্থিত। এই জন্য সর্ব্বপ্রকার যোগসাধনের সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা নাভিপদ্ম। নাভিদেশ

হইতে সাধন আরম্ভ করিলে শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। নাভিস্থানে বায়ু ধারণ করিলে প্রাণ ও অপান বায়ুর একত্ব হয় এবং কুণ্ডলিনী সুষম্নাদ্বার পরিত্যাগ করেন, তখন প্রাণবায়ু সুষম্না মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

প্রথম ক্রিয়া নাভিস্থান হইলে আরম্ভ না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। অনেকে প্রথম হইতে একদম আজ্ঞাচক্রে ধ্যান লাগাইতে উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল। আমি যোগক্রিয়া আলোচনায় যে ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি—"ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার ন্যায়" একেবারে ঐরূপ করিতে যাইলে কখনই মনঃ স্থির, চিত্তের একাগ্রতা কিম্বা কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইবে না। যাহারা প্রকৃত সাধনাভিলাষী, তাহারা নাভি কার্য্য আরম্ভ করিবে; তাহা হইলে ফলও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিতে পারিবে।

নিত্য নিয়মিতরূপে ঐরূপ নাভিস্থানে বায়ু ধারণ করিলে প্রাণবায়ু অগ্নিস্থানে গমন করিবে। তখন অপান বায়ুদ্বারা শরীরস্থ অগ্নি ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। ঐরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে আট দশ মাসের মধ্যেই নানাবিধ লক্ষণ অনুভূত হইবে। নাদের অভিব্যক্তি, দেহের লঘুতা, মলমূত্রের হ্রস্বতা এবং জঠরাগ্নির দীপ্তি ইত্যাদি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ হয়। নিয়মিতরূপে প্রত্যহ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে তিন চারি মাসের মধ্যেও উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

উপরোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইলেও নাভিস্থানে কুম্ভক করিয়া প্রসুপ্ত নাগেন্দ্রের ন্যায় পঞ্চাবর্ত্তা বিদ্যুদ্বরণা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। ঐরূপ বায়ু ধারণ ও কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলে, কুণ্ডলিনী অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তাপিত বায়ুদ্বারা প্রসারিত হইয়া ফণা বিস্তারপূর্ব্বক জাগরিত হইয়া উঠিবেন। যতদিন মন সম্পূর্ণভাবে নাভিস্থানে সংলীন না হয়, তাবৎ এইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চালিত হইলে প্রাণবায়ু সুষুম্না-ভিতরে গমন করিবে এবং সমস্ত বায়ু মিলিত হইয়া অগ্নির সহিত সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করিতে থাকিবেন। যোগিগণ এই অবস্থাকে "মনোন্মনী" সিদ্ধি বলেন। এই সময় নিশ্চয়ই সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট ও শরীরে বলবৃদ্ধি এবং কখন কখন সমুজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে। ঐরূপ লক্ষণ অনুভূত হইলে তখন নাভিস্থল ত্যাগ করিয়া অনাহত-পদ্মে কার্য্য আরম্ভ করিবে। এখানেও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা যথানিয়মে আসনে উপবিষ্ট হইয়া মূলবন্ধ সাধন করিবে। অর্থাৎ মলাধার সঙ্কোচপূর্ব্বক অপান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া প্রাণবায়ুর সহিত ঐক্য করিয়া কুম্ভক করিবে। প্রাণবায়ু হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ হইলে পদ্মসমুদয় ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। অনাহত পদ্মে বায়ু ধারণা অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণবায়ু অনাহতপদ্মে প্রবিষ্ট ও সংস্থিত হইবে। সেই সময় ভ্রূ-যুগলের মধ্য স্থান পর্য্যন্ত সুষুম্না-বিবরে নবজলদজাল সৌদামিনীর ন্যায় জ্যোতিঃ সর্ব্বদা প্রকাশ হইতে থাকিবে। সাধনের নয়ন নিমীলিত বা উন্মীলিত, সর্ব্বাবস্থায় অন্তরে ও বাহিরে নির্ব্বাত দীপকলিকার ন্যায় জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হইবে।

উক্ত লক্ষণ এবং অন্যান্য লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলে, বীজমন্ত্র (ব্রাহ্মণগণ প্রণব উচ্চারণ করিলেও পারেন) উচ্চারণ করিতে করিতে সাগ্নি প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে আরোপিত করিয়া আত্মাকে ধ্যান করিবে। আজ্ঞাচক্রে বায়ু নিরোধপূর্ব্বক এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত একেবারে লয়প্রাপ্ত হইবে। এই সময় সহস্রারবিগলিত অমৃতধারায় সাধকের কণ্ঠকূপ পূর্ণ হইবে—ললাটে বিদ্যুৎ-সদৃশ সমুজ্জ্বল আত্মদর্শন লাভ হইবে। তখন দেবতা, দেবোদ্যান, মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য সাধকের নয়নপথে পতিত হইবে। সাধক অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দে মগ্ন হইবে। ফলে—গুরুকৃপায়

এই সময়ের ভাব যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, সে অব্যক্ত ভাব লেখনী সাহায্যে ব্যক্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভুক্তভোগী ভিন্ন সে ভাব অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

যে পর্য্যন্ত কোদণ্ড মধ্যে চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংলীন না হয়, তাবৎ যথা-নিয়মে পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ ও ললাট মধ্যে বীজমন্ত্ররূপ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আত্মজ্যোতিঃ ধ্যান করিবে। ক্রমশঃ উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সাধক কামকলার ত্রিবিন্দুর সহিত মিশিয়া যাইবে এবং ললাটস্থিত ঊর্দ্ধবিন্দু বিকশিত হইবে। আর চাই কি ?—মানবজীবন ধারণ সার্থক ! জ্ঞান উপার্জ্জন সার্থক !! সাধন ভজন সার্থক !!!

যাহাদের মস্তিষ্ক সবল এবং মস্তিষ্ক ও চক্ষুর কোন পীড়া নাই, তাহারা আরও সহজ উপায়ে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পার। রাত্রিকাল গৃহের ভিতরে নির্ব্বাত স্থানে সোজা হইয়া উপবেশন করিয়া আপন আপন চক্ষুর সম-সূত্রপাতে (যে কোন উচ্চ আধারে) মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রদীপ, সর্ষপ কিম্বা রেড়ীর তৈল দ্বারা জ্বালিয়া রাখিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরুর ধ্যান প্রণামান্তর ঐ দীপালোক স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবে, যতক্ষণ চক্ষুতে জল না আইসে, ততক্ষণ চাহিয়া রহিবে। ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন দৃষ্টি দৃঢ় হইবে, তখন একটী মটর-সদৃশ নীল বর্ণের জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে ঐ দীপালোক হইতে দৃষ্টি অপসৃত করিয়া যেদিকে চাহিবে, দৃষ্টির অগ্রে ঐ নীল জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে। তখন সাধক নয়ন মুদ্রিত করিয়াও ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। ক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মনঃস্থিরের জন্য কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নাভিস্থানে চাহিয়া থাকিতে হয়।

ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন অন্তরে ও বাহিরে নীলবর্ণের জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে, তখন অনন্যমনে ঐ দৃষ্টি হৃদ্দেশে আনিবে। তথ

হইতে নাসাগ্রে, তৎপর ভ্রূর মধ্যস্থলে আনিবে। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির হইলে শিবনেত্র করিবে। শিবনেত্র করিয়া যখন চক্ষুর তারা কতকাংশ কিম্বা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া যাইবে, তখন তড়িৎসদৃশ দীপকলিকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। চক্ষুর তারা উল্টাইতে প্রথম কিছু অন্ধকার দৃষ্ট হইবে, কিন্তু সাধক তাহাতে বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে কিছুক্ষণ পরেই ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। পরমাত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া শান্ত চিত্ত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। জলমধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পানে দৃষ্টি সাধন করিয়াও ঐরূপ আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা যায়। যদি কেহ—

ইষ্টদেবতা দর্শন

করিতে ইচ্ছা করে, তবে সামান্য চেষ্টাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। সাধনপ্রণালী অন্য কিছুই নহে, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপ্ত চিত্ত-বৃত্তিকে যদি যত্ন ও অভ্যাসের দ্বারা, পথ রোধের দ্বারা একত্র করা যায়, ক্রম-সঙ্কোচ প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত চিত্তবৃত্তির অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু, সমস্তই তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য হইবে। এইরূপে যে কোন বস্তুতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিলে তাহা ধ্যায়াকারে পরিণত হইয়া হৃদয়ে উদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্যোতিঃ দর্শন-প্রণালীর যে কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া কৃতকার্য্য হইলে, যখন ভ্রূর মাঝারে জ্যোতিঃশিখা দেখিতে পাইবে এবং চিত্ত শান্ত হইবে, তখন গুরূপদিষ্ট ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে আত্মা ধ্যেয়ানুরূপ মূর্ত্তিতে জ্যোতিঃ

মধ্যে প্রকাশিত হইবেন। এইরূপে কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, শিব, গণপতি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গার যুগলরূপ প্রভৃতি ঐ জ্যোতির মধ্যে দর্শন করিতে পারা যায়।

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যেও ইষ্টদেব কিম্বা অপর দেবদেবী দর্শন হইয়া থাকে। কারণ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে আমাদের ভজনীয় পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। যথা—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।

ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সরসিজ আসনে আমাদের ধ্যেয় নারায়ণ অবস্থিতি করেন। আমরা গায়ত্রী দ্বারাও তাঁহাকে সবিতৃমণ্ডল-মধ্যস্থ বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকি। ঋগ্বেদেও এই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্য অনেক আলোচনা হইয়াছে। যথা ;—

ইহ ব্রবীতু য ইমং গাং বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ॥

—ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত.

অর্থাৎ যে উন্নত আদিত্যে রশ্মিসমূহ বারি বর্ষণ করে এবং যিনি তাঁহার রূপ বিস্তার করিয়া রশ্মিদ্বারা উদক পান করেন, সেই আদিত্যের অন্তর্গত ভজনীয় পুরুষের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন, তিনি আমাকে শীঘ্র তাহা বলুন।

তবেই দেখ, সকলেরই ধ্যেয় পুরুষ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থিত আছেন। চেষ্টা করিলেই সাধক তাহা দর্শন করিতে পারিবে। দর্শনের উপায় এই ;—

অগ্রে সাধক একদৃষ্টে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যাস করিবে।

প্রথম প্রথম কষ্ট হইতে পারে ; অভ্যাসে দৃষ্টি দৃঢ় হইলে নির্ম্মল ও নিশ্চল জ্যোতিঃ নয়নে প্রতিভাত হইবে। তখন গুরূপদিষ্ট আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যের জ্যোতিঃ মধ্যে ইষ্টদেবতার দর্শন পাইবে।

যাহাদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল কিম্বা চক্ষুর কোন পীড়া আছে, তাহাদের সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টিসাধন করিতে নিষেধ করি। তাহারা প্রথমোক্ত প্রকারে ইষ্টদেব দর্শন করিবে।

অন্যান্য দেবতার দর্শন পাইতে যেরূপ সাধনার প্রয়োজন তাহা হইতে অনেক কম চেষ্টাতেই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন হইয়া থাকে। কারণ ভাব কৃষ্ণ ও প্রাণ রাধা ; ইঁহারা সর্ব্বদাই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অবস্থিত। সুতরাং ভাব ও প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিলে, ভাব ও প্রাণ যুগলরূপে হৃদয়ে উদিত হয়েন। আবার কালীসাধনায় আরও অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য লাভ করা যায়। কারণ কালীদেবী আমাদের সর্ব্বাঙ্গে জড়িত।

অজ্ঞলোক হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারে না বলিয়াই হিন্দুকে জড়োপাসক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া থাকে। তাহাদের দৃষ্টি, চিরপ্ররূঢ় সংস্কারের শাসনে স্থূল-গঠিত জড়-প্রাচীরের পরপারে যাইতে অনিচ্ছুক—জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাব ও দেবদেবীর নিগূঢ় তত্ত্ব হিন্দু যাহা বুঝে, তাহার ত্রিসীমানায় পঁহুছিতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে। হিন্দু জড়োপাসক, হিন্দু পৌত্তলিক কেন, তাহা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শী হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইতে পার। হিন্দুগণ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রিয়-সম্ভব যাহা কিছু, তৎসমস্তেই ভগবানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন—তাই মৃত্তিকা, প্রস্তর, বৃক্ষ, পশ্বাদি পূজার আয়োজন করিয়াও ভগবানের বিরাট্ বিভূতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হিন্দু যে

ভাবে বিভোর, জড়বাদীর তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। হিন্দুধর্ম্মের গভীর জ্ঞানাব্ধির উত্তাল তরঙ্গ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-গোষ্পদে প্রবাহিত করা যায় না ; বিশেষতঃ তাহা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে।*

—— * ——

আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন

সাধক ! ইচ্ছা করিলে আপনার ভৌতিক দেহের জ্যোতির্ম্ময় প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পার। তৎসাধন-প্রণালীও অতি সহজ এবং সাধারণের করণীয়। আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনের উপায় এই—

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমীশ্বরঃ
নিরীক্ষ্য বিস্ফারিতলোচনদ্বয়ম্।
যদাঽঙ্গনে পশ্যতি স্বপ্রতীকং,
নভোঽঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি॥

যখন আকাশ নির্ম্মল ও পরিষ্কার থাকিবে, সেই সময় বাহিরে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে আত্ম-প্রতিবিম্ব (ছায়া) নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিমেষোন্মেষ বর্জ্জিত হইয়া আকাশে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিবে। তাহা হইলে আকাশগাত্রে শুক্লজ্যোতির্বিশিষ্ট নিজের ছায়া দৃষ্টিগোচর হইবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে চত্বরেও আত্মপ্রতীক দৃষ্ট হইবে। তখন ক্রমশঃ

* মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের সবিশেষ গূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

আশেপাশে চতুর্দ্দিকে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে সাধক গগনচর সিদ্ধ পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া থাকে।

রাত্রিতে চন্দ্রালোকেও এই ক্রিয়া সাধন করা যায়। যোগিগণ ইহাকে "ছায়া-পুরুষ-সাধন" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিয়া সাধক নিজের শুভাশুভ ও মৃত্যুসময় সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারি. .!

—※—
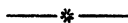
দেবলোক দর্শন

সাধক ইচ্ছা করিলে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ব্রহ্মলোক, সূর্য্যলোক, ইন্দ্রলোক প্রভৃতি দেবলোক এবং দেবতাগণের গতলীলাও দর্শন করিতে পারে। ক্ষুদ্রহৃদয় অল্পজ্ঞানিগণ হয়তঃ একথা শুনিয়া উচ্চহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিবে ;—"যাহা শাস্ত্র-গ্রন্থে লিপিবিদ্ধ, সাধু-সন্ন্যাসী কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কণ্ঠে অবস্থিত, তাহা দর্শন করা যায় কি প্রকারে ? ইহা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র।"

অনভিজ্ঞতা বশতঃ যে যাহাই বল, আমি জানি তাহা দর্শন করা যায়। দেবদেবীগণের লীলাকথা শাস্ত্রে পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে মানবের চিত্তে তাহার সৌন্দর্য্যগ্রাহিতার ফল অনুযায়ী দেবমূর্ত্তির রূপ নিবদ্ধ হইয়া যায়। তখন সে সেই দেবতার লীলাকাহিনী অতি তন্ময়ভাবে শ্রবণ করিয়া থাকে। শ্রবণ করিতে করিতে সেই সকল বিষয় স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। তারপর জাগ্রৎ অবস্থাতেও সে বিষয় তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। আর এক

কথা,—যাহা একবার হইয়াছে তাহা কখনও লুপ্ত হয় না, তাহার সংস্কার জগৎ আপন বক্ষে কত যুগ-যুগান্তর ধারণ করিয়া রাখে। তবে কথা এই যে, যে কার্য্য যত শক্তিশালী, তাহার সংস্কার তত প্রস্ফুট অবস্থায় থাকিয়া যায়। সাধনার বলে সেই সংস্কারকে জাগাইয়া দিলে আবার তাহা লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে।

সাধনায় চিত্তকে একমুখী করিতে পারিলে হৃদয়ে যে কম্পন উৎপাদিত হয়, সেই কম্পন ভাবের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, ভাব প্রস্ফুট হইয়া তাহার ক্রিয়াকে মূর্ত্তিমতী করিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত করে। অতএব আপন চিত্ত অনুযায়ী যে কোন দেবলোকের প্রতি মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহা দর্শন করা যায়।

যোগসাধনে যাহাদের চিত্ত স্থির ও নির্ম্মল হইয়া জ্ঞাননেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন বিষয়াসক্ত চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির দেবলোক বা গতলীলা দর্শন করা সহজসাধ্য নহে। দিব্যচক্ষু ব্যতীত ভগবানের ঐশ্বর্য্য কেহ দর্শন করিতে পারে না। গীতায় উক্ত আছে—নানাবিধ যোগোপদেশেও যখন অর্জ্জুনের ভ্রম দূরীভূত হইল না, তখন ভগবান্ বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার বিরাট্ মূর্ত্তি অর্জ্জুনের নয়ন-পথে পতিত হইল না। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

> ন তু মাং শক্যসি দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
> দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥
>
> —গীতা ১১।৮

তবেই দেখ, শ্রীভগবানের প্রিয়সখা হইয়াও অর্জ্জুন তাঁহার বিরাট্ বিভূতি দেখিতে পান নাই, অন্য পরে কথা কি? পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন করিয়া চিত্ত নির্ম্মল ও একাগ্রতা সাধিত হইলে দেবলোক বা গতলীলা দর্শনের চেষ্টা করিতে হয়। দেবলোক দর্শনের উপায় এই—

"আত্মজ্যোতিঃ-দর্শন" প্রণালীমতে সাধন করতঃ যখন চিত্ত লয় এবং ললাটে বিদ্যুৎসদৃশ সমুজ্জ্বল আত্মজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, সেই সময় ঐ জ্যোতি-র্মধ্যে চিত্ত-অনুযায়ী যে কোন দেবলোক চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা অনুযায়ী স্থান মূর্ত্তিমৎ হইয়া আত্মজ্যোতির্মধ্যে প্রতিভাত হইবে।

সাধারণের জন্য আরও উপায় আছে—

এক খণ্ড ধাতু বা প্রস্তর সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি মনঃ-সংযোগপূর্ব্বক নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে এবং চিত্ত-অনুযায়ী দর্শনীয় স্থান চিন্তা করিবে। প্রথম প্রথম এক মিনিট, দুই মিনিট করিয়া ক্রমে সময়ের দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে। ক্রমে দেখিবে, চিত্তের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হই-বার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান চিন্তানুযায়ী স্থানের ন্যায় সর্ব্বশোভায় শোভান্বিত হইয়াছে।

চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে জগতে তাহার অপ্রাপ্য ও দুষ্ক্রিয় কিছুই থাকে না। অনন্তমনা মন অনন্তদিকে বিক্ষিপ্ত, সেই গতি রোধ করিয়া একদিকে চালিত করিতে পারিলে অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। ন্যায়ের মতে ইচ্ছা আত্মার গুণ। যথা—

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি।

—ন্যায়-দর্শন

অতএব চিত্তকে একাগ্র করিয়া ইচ্ছাশক্তির সাধনবলে জগতে অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে। ভারতীয় মুনি-ঋষিগণ মানবকে পাষাণে, কাঠের নৌকাকে সোণার নৌকায়, মূষিককে ব্যাঘ্রে পরিণত করিতেন; তাহাও এই সাধনবলে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগীর রোগ আরোগ্য হয়, মানব বশীভূত হয়, গগনের গ্রহনক্ষত্রকে ভূতলে আনয়ন করা যায়, জ্যৈষ্ঠের দাবদগ্ধ আকাশে নবীন নীরদমালা সৃষ্টি করা যায়, নবদ্বীপে বসিয়া

বৃন্দাবনের সংবাদ আনান যায়, ফলে সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দেশীয়গণ মেস্‌মেরাইজ, মিডিয়ম, হিপ্‌নোটিজম্‌, মানসিক বার্ত্তা-বিজ্ঞান, সাইকোপ্যাথি, ক্লায়ারভয়েন্স প্রভৃতি অদ্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়া জীবজগৎ মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছেন; তাহাও এই চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির বলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাইওনিয়ার নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক সেনেট সাহেব, থিয়োসোফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিকা ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কি (Madam Blavatsky) চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির সাধন করিয়া কিরূপ অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ডসকল সম্পাদন করতঃ মরজগতের মানবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মানুষ ইচ্ছা করিলে নরদেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, দেবলোক দর্শন আর বেশী কথা কি?

হিন্দুশাস্ত্রে ঐরূপ শত শত উদাহরণ থাকিতে বিদেশীয় উপমা লিপিবদ্ধ করায় কেহ যেন ক্ষুব্ধ হইও না; বর্ত্তমান যুগে এই প্রথা প্রচলিত। দেশীয় জুঁই-চামেলির আদর নাই, কিন্তু সে ফুল বিদেশে যাইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণে এসেন্স হইয়া আসিলে নব্য সভ্যগণ সযত্নে সমাদরে ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেকে মা-বোনের সহিত কথা বলিতেও দু-চারিটি ইংরাজী বুকুনি লাগাইয়া থাকে। আমিও সেই সভ্যসম্মত সনাতন প্রথা বজায় রাখিতে পাশ্চাত্য উদাহরণ সন্নিবেশিত করিলাম। কেহ যেন বিরক্ত হইয়া আরক্ত লোচনে শক্তবাক্য ব্যক্ত করিও না। আশা করি, পাঠকগণ সুসংযত চিত্তে অনন্যমনে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া দেবলোক দর্শনের সত্যতা উপলব্ধি করিবে। একটী বস্তুকে দশজন দশদিক হইতে আকর্ষণ করিলে তাহার গতি সমভাবে থাকে; কিন্তু দশজনে একদিকে আকর্ষণ করিলে তাহার গতি কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তদ্রূপ অনন্ত দিগ্‌গামী মনের গতিরোধ করিয়া সর্ব্বতোভাবে একমুখী করিতে পারিলে জগতে

কিছুই অসম্ভব থাকে না, তবে প্রণালীবদ্ধক্রমে বিচার ও যুক্তি দ্বারা করিতে হয়। বাহ্যবিজ্ঞানেও যে শক্তি, যে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন, ইহাতেও তাহাই। পরিশেষে বক্তব্য এই, সকলেই চিত্তের একাগ্রতা সাধনপূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ বিদূরিত করিয়া জীবনে সুখের বসন্ত আনয়ন করিবে। যেন মনে থাকে, চিত্তের একাগ্রতাসাধনই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মুক্তি

—*—

নিত্যানিত্যবস্তুবিচার দ্বারা নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের সমস্ত সংকল্প যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম মোক্ষ। যথা—

নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যসংসারসমস্তসংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ।

—নিরালম্বোপনিষৎ

সঙ্কল্প বিকল্প মনের ধর্ম্ম ; মন অতিশয় চঞ্চল। চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ হয় না। মনের একাগ্রতা জন্মিলে, সেই মনকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা মৃত বলিয়া থাকেন। এই মৃত মন সাধনের ফলে মোক্ষরূপ হয়। জীবের অন্তঃকরণ যে সময়ে দৃঢ়তর উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে মোক্ষের আবির্ভাব ঘটে ; অতএব মোক্ষের অবধারণ করা কর্ত্তব্য।*

সংসারে আসক্তি ত্যাগ হইলেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং সেই

* মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "প্রেমিক গুরু" গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে।

বৈরাগ্য সাধন দ্বারা পরিপক্কতা লাভ করিলেই মোক্ষ সংঘটন হয়। স্থূল কথায় সংসারে আত্যন্তিক বিরক্তির নাম মুক্তি। সাংসারিক ভোগাভিলাষ পূর্ণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না; ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইলেই সাংসারিক সুখদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া সংসারকার্য্যে বিরাগ, অরুচি বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগের কারণ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখীনতার নিবৃত্তি হইয়া যায়। এরূপ নিবৃত্তি হওয়ার নামই মুক্তি।

ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখতা জন্য সংসারে যে প্রবৃত্তি, তাহারই নাম বন্ধন। সেই বন্ধনের কারণটী কর্ম্ম শব্দে উল্লিখিত হয়। কর্ম্ম নানা, এ কারণ বন্ধনও নানা। এই নানাপ্রকার বন্ধনে জীব বন্দী হইয়া আপনাকে অতিশয় ক্লিষ্ট বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য দুঃখ ভোগ করে। সাংখ্যকারগণ এই দুঃখভোগ করাকেই হেয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যথা—

ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্।

—সাংখ্যদর্শন

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখের নাম হেয়। প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হইলে যে বিষয়জ্ঞান জন্মে, তাহাই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতি কারণ। যথা—

প্রকৃতিপুরুষসংযোগেন চাবিবেকো হেয়হেতুঃ।

—সাংখ্যদর্শন

অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগহেতু যে অবিবেক জন্মে, তাহাই হেয়-হেতু।

তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্।

—সাংখ্যদর্শন

দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে হান অর্থাৎ মুক্তি বলে। সেই

আত্যান্তক দুঃখ নিবৃত্তির উপায়—

বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায়ঃ।

—সাংখ্যদর্শন

বিবেকখ্যাতিই হানোপায়, যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া দুঃখোৎপাদন করে এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ বা পার্থক্য বিবেক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে; সেই বিবেককেই হানোপায় বলে। ফলে বিবেকদ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যথা—

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্ত তদ্ধানৌ হানং।

—সাংখ্যদর্শন

প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকই বন্ধনের হেতু এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকই মোক্ষের কারণ। দেহাদির অভিমান থাকিতে মোক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য যাহাতে পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়, এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন।

যোগাঙ্গীভূত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপাদির পরিক্ষয় হইলে জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া বিবেক জন্মে। বিবেক দ্বারা মোহপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, পাশ ছিন্ন হইলেই মুক্ত হওয়া হইল। কপট বৈরাগ্য দ্বারা, বাক্যাড়ম্বর দ্বারা কিম্বা বলপূর্ব্বক পাশ ছিন্ন হয় না; কেবল সাধন দ্বারা হইয়া থাকে। সেই পাশ অর্থাৎ বন্ধন নানাপ্রকার; তাহার মধ্যে আট প্রকার অত্যন্ত দৃঢ়। তাহাই অষ্টপাশ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা—

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

—ভৈরবযামল

ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও মান এই আটটীকে অষ্টপাশ বলে। যে ব্যক্তি ঘৃণারূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ থাকে, তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। যে শঙ্কারূপ পাশে বদ্ধ, তাহারও ঐরূপ অধোগতি হইয়া থাকে। ভয়রূপ পাশ ছেদন করিতে না পারিলে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। যে লজ্জাপাশে বদ্ধ থাকে, তাহার নিশ্চয়ই অধোগতি হয়। জুগুপ্সারূপ পাশ থাকিলে ধর্ম্মহানি এবং কুলরূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে পুনঃ পুনঃ জঠরে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। শীলরূপ পাশে বদ্ধ ব্যক্তি মোহে অভিভূত হয়। মানরূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে পারত্রিক উন্নতি লাভ সুদূরপরাহত।

ইত্যষ্টপাশাঃ কেবলং বন্ধনরূপা রজ্জবঃ।

এই অষ্টপাশ কেবল জীবের বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ। যে এই অষ্টপাশে বদ্ধ, তাহাকে পশু বলা যায়, আর এই অষ্টপাশ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব। যথা—

এতৈর্ব্বদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ।

—ভৈরবযামল

এই বন্ধনমোচনের উপায় বিবেক। বিবেকই জীবের পাশ ছেদন করিবার খড়্গস্বরূপ। বিবেক-জ্ঞান সহজে উৎপন্ন হয় না। যোগাঙ্গীভূত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বাসনা ও মনোনাশ করিতে পারিলে তবে বিবেকজ্ঞান জন্মে। কারণ অবিবেক-জ্ঞান জন্ম-জন্মান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। যথা—

জন্মান্তরশতাভ্যস্তা মিথ্যা সংসারবাসনা।
সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্বচিৎ॥

—মুক্তিকোনিষৎ, ২।১৫

যে মিথ্যা সংসারবাসনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শত শত জন্ম হইতে চলিয়া

আসিতেছে, তাহা বহুদিন যোগসাধন ব্যতীত আর অন্য কোন উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কঠোর অভ্যাস দ্বারা মন ও বাসনাকে পরিক্ষয় করিতে হয়। দীর্ঘকাল যোগসাধন করিলে পর মন স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া বৃত্তিশূন্য হইয়া যায়। মন বৃত্তিশূন্য হইলে বিজ্ঞান ও বাসনাত্রয় (লোকবাসনা, শাস্ত্র-বাসনা ও দেহ-বাসনা) আপনা হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বাসনাক্ষয় হইলেই নিঃস্পৃহ হওয়া হইল, নিঃস্পৃহ হইলে আর কোনরূপ বন্ধন থাকে না, তখনই মুক্তিলাভ হয়। বাসনাবিহীন অচেতন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যে বাহ্য বিষয়ে সমাকৃষ্ট হয়, জীবের বাসনাই তাহার কারণ।

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নষ্টসর্ব্বেহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ, ২।২০

সমাধি অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হউক বা না হউক, যে ব্যক্তির হৃদয়ে কোনরূপ বাসনা উদিত হয় না, সেই ব্যক্তিই মুক্ত। যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাদি সমুদায় পদার্থের বাহ্য ও অভ্যন্তরে আত্মাকে আধার স্বরূপে সন্দর্শন করতঃ সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তিনিই মুক্ত। কিন্তু বাসনা-কামনা জড়িত কয়জন জীব সে সৌভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? সুতরাং সাধনাদ্বারা বাসনা ক্ষয় করিতে হইবে।

সাধনা নানাবিধ; সুতরাং নানাবিধ উপায়ে মানবের মুক্তি হইয়া থাকে। কেহ বলেন, ভগবানের ভজনা করিলে মুক্তি হয়। কেহ কেহ বলেন, সাংখ্যযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। কেহ বা বলেন, ভক্তিযোগে মুক্তি হয়। কোন মহর্ষি বলেন, বেদান্তবাক্যের অর্থ সমুদয় বিচার করিয়া কার্য্য করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সালোক্যাদিভেদে মুক্তি চারি প্রকার

কথিত আছে। একদা সনৎকুমার তৎপিতা ব্রহ্মাকে মুক্তির প্রকারভেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে লোকপিতামহ বলেন,

মুক্তিস্তু শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধং।
সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপ্যং তৎসমীপতা।
সাযুজ্যং তৎস্বরূপস্থং সার্ষ্টিস্তু ব্রহ্মণো লয়ং।
ইতি চতুর্ব্বিধা মুক্তির্নির্ব্বাণঞ্চ তদুত্তরং॥

—হেমাদ্রৌ ধর্ম্মশাস্ত্রম্

হে পুত্র! আমি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই দেবলোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য। সেই দেবতা-সমীপে বাস করাই সামীপ্য। তৎস্বরূপে অবস্থিতির নাম সাযুজ্য। ব্রহ্মের মূর্ত্তিভেদের লয়ের নাম সার্ষ্টি। এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির পর নির্ব্বাণ মুক্তি।

জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতা।
যা মুক্তিঃ কথিতা সদ্ভিস্তন্নির্ব্বাণং প্রচক্ষতে॥

—হেমাদ্রৌ ধর্ম্মশাস্ত্রম্

জীব পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইলে যে মুক্তি হয়, জ্ঞানীরা তাহাকেই নির্ব্বাণ-মুক্তি বলিয়া থাকেন। নির্ব্বাণ-মুক্তি হইলে আর পুনর্ব্বার জন্মমৃত্যু হয় না। মহেশ্বর রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্টিং সাযুজ্যমেবচ।
কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধা॥

—শিবগীতা, ১৩।৩

হে রাঘব! সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি ও কৈবল্য—মুক্তি এই পঞ্চবিধা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাণ-মুক্তি কৈবল্য-মুক্তির

নামান্তর মাত্র। বাহ্ন ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার ব্রহ্মভাব প্রকাশ করাই যোগের উদ্দেশ্য। সেই ফল লাভই কৈবল্য।

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।

পাতঞ্জল-দর্শন, কৈবল্য-পাদ, ২

প্রকৃতি আপূরণের দ্বারা একজাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়। যথা—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাস্তেন প্রবেশিতঃ॥
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপং হি সংত্যজন্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৯।১১।২২-২৩

দেহী ব্যক্তি স্নেহ, দ্বেষ কিম্বা ভয়বশতঃই হউক, যে যে বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররূপে মন ধারণা করে, তাহার তাদৃশ রূপ প্রাপ্তি হয়। যেরূপ পেশস্কৃত কীট (কাঁচপোকা বা কুমরীকা পোকা) কর্ত্তৃক তৈলপায়িকা (আরশুলা) ধৃত ও গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করতঃ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎসদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। পুরুষ যখন কেবল বা নির্গুণ হন অর্থাৎ যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্ম চৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত না হয়, আত্মা যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকার দর্শন হয় না, ঐরূপে নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়াকেই নির্ব্বাণ বা কৈবল্য মুক্তি বলে। দীর্ঘকাল যোগসাধনায় যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার দেহভঙ্গ হইয়া জীব ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান জন্মিবে, তখন

কেবল একমাত্র নিরুপাধি পরমাত্মাই প্রতীতি হইবে, এইরূপে হৃদয়াকাশে অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভাব হওয়াকেই **কৈবল্যমুক্তি** বলে।

জগতে যত কিছু সাধন ভজনের বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সমস্তই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান উপায়ের জন্য। জ্ঞানোদয় হইলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ মান, অভিমান, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে। তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাওয়া জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি এবং অন্তে নির্ব্বাণ হওয়া বলিয়া কথিত হয়। তদ্ভিন্ন তীর্থে তীর্থে ছুটাছুটী, সাধুসন্ন্যাসীর বা বৈরাগীর দলে জুটাজুটী, কৌপীন, তিলক, মালা ঝোলার আঁটা-আঁটী, সাধন ভজনের কালে কাটা-কাটী করিলে এবং কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যথা—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
যথা লোহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মাভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪।১০৯-১১০

যে পর্য্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শতকল্পেও জীবের মুক্তি হইতে পারে না। যেরূপ লৌহ বা স্বর্ণময় উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ জীবগণ শুভ বা অশুভ দ্বিবিধ কর্ম্মদ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া আমি কর্ম্মকাণ্ডের দোষ দর্শাইতেছি না। অধিকারভেদে কার্য্যের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যাহারা অল্পজ্ঞানী,

তাহারা কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে উচ্চ অধিকারীর কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। নতুবা যাহারা একেবারেই নিরাকার ব্রহ্মলাভে প্রধাবিত হয়, তাহারা সমধিক ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। অধিকার অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
সকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৩ উঃ

এই সংসারে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার মধ্যে যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা মোক্ষপথের অধিকারী; আর যাহারা সকাম, তাহারা কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গলোকাদি গমনপূর্ব্বক নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া, কৃতকর্ম্মের ক্ষয়ে পুনরায় ভূলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা নাই। মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন—

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্ ॥
বায়ুপর্ণকণতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৪ উঃ

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের এই শ্লোক কয়টীতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত বাহ্যাড়ম্বরে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। বাসনা-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোবৃত্তিশূন্য না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্ভব হয় না। ত্যাগী বা সংসারী সকলের পক্ষে একই নিয়ম। সাধু-সন্ন্যাসী কি বৈরাগী হইলেই মুক্তি হয় না; মন পরিষ্কার করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করা চাই। কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি, জমিজমা, গরু-ঘোড়া ও ঘর-বাড়ীতে তিনি গৃহীর ঠাকুরদাদা!—এরূপ বৈরাগী বর্ত্তমান যুগে বিরল নহে।

আকীটব্রহ্মপর্য্যন্তং বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্ ॥

আরও দেখ, অবধূত-লক্ষণে মহাত্মা দত্তাত্রেয় কি বলিয়াছেন—

অ.—আশাপাশাবিনির্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

ব,—বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্ ।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকার স্তস্য লক্ষণম্ ॥
ধূ,—ধূলিধূসরগাত্রাণি ধূতচিত্তো নিরাময়ঃ ।
ধারণাধ্যাননির্ম্মুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥
ত,—তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ ।
তমোঽহংকারনির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

—অবধূত-গীতা, ৮ অঃ

শাস্ত্রে যেরূপ ত্যাগীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এরূপ বৈরাগী নয়নগোচর হওয়া কঠিন। চাষ-আবাদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি গৃহীকে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা ছিল, তবে আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, জাত্যাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া ভেক লওয়া কেন? বিবাহ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘরে বসিয়া কি ধর্ম্ম হয় না?—কৌপীন পরিয়া, বৈষ্ণবীনামা বার-বিলাসিনী গ্রহণ না করিলে কি গোপী-বল্লভের কৃপা হয় না? আজকাল বৈষ্ণব একটা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। যত কুড়ে অকর্ম্মা খেতে না পেয়ে, পেটের দায়ে, বিবাহ অভাবে, রিপুর উত্তেজনায় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে সর্ব্ব অভাব পূরণ করিতেছে। জ্ঞানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি; কিন্তু বাহুদণ্ডে বিশ্ব কম্পিত। এক এক মহাপ্রভু যেন পাকা পাইখানা! পাকা পাইখানার উপরে যেমন চূণকাম করা সাদা ধপ্‌ধপে, ভিতরে মলমূত্র পরিপূর্ণ; তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গ অলকা তিলকা শোভিত করিয়া মালাঝোলা লইয়া নিয়ত মালা ঠক্‌ঠক্ করিতেছেন; কিন্তু অন্তরে বিষয়-চিন্তা এবং কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, হিংসা-দ্বেষ ও অহংভাবে পরিপূর্ণ। এইরূপ বর্ণচোরা ঝুটার ঘটায় ঘটিরামগণ ভুলিয়া মাথা কোটে। গিল্টার কৃত্রিম আবরণ ভাল নয়, এবং অন্তর আবর্জ্জনাপূর্ণ রাখিয়া বাহিরে লোক-ভুলানো সাধুর ঢং কোন

কার্য্যকরী নহে। কেহবা তর্কে মূর্ত্তিমান্, অথচ পেটের ভিতর ডুবুরী নামাইয়া দিলে "ক" পাওয়া যায় না। যিনি জ্ঞানে পাকা, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানিয়াছেন, তিনি কখনই তর্ক করেন না। জ্বলন্ত ঘৃতে লুচি ছাড়িয়া দিলে প্রথমতঃ শব্দ করে ও উপরে ভাসে, কিন্তু যতই রস মরিয়া আইসে, শব্দও তত কমে এবং নিম্নে ডুবিয়া যায়। গবারামগণ তাহা না বুঝিয়া নিজের বুদ্ধি নিজেই প্রকাশ করে। ফলে খাঁটি হইতে বাসনা করিলে মাটি হইতে হইবে। অহংভাবের প্রতিষ্ঠাশা, যশ-গৌরবের প্রত্যাশা বিন্দুমাত্র মনে থাকিলে প্রেম ও ভক্তি আসিতে পারে না। বাসনা বন্ধনের মূল। অহঙ্কারাবধি সর্ব্বাশা ত্যাগ করিলে আর চিরবদ্ধ থাকিতে হয় না, অনায়াসে ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করা যায়। জীব বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগত ভেদসম্পন্ন, সেই বাসনা-কামনার খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়া দূরীভূত করিতে পারিলে মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইয়া থাকে।

অন্যান্য বিষয়ে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। যোগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্তি হয়। সাধক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা কুণ্ডলিনী-শক্তিকে চৈতন্য করাইয়া জীবাত্মার সহিত অনাহত পদ্মে আসিলে সালোক্য প্রাপ্ত হন; বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত উঠিলে সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন; আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে সাযুজ্য লাভ হয়; আজ্ঞাচক্রের উপরে নিরালম্বপুরে আত্মজ্যোতিঃদর্শন বা জ্যোতির্মধ্যে ইষ্টদেব দর্শন হইলে কিম্বা নাদে মনোলয় করিতে পারিলে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
—জীবন্মুক্তি গীতা

এই জীবই শিবস্বরূপ, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত

আছেন; এরূপ দর্শনকারীকে জীবন্মুক্ত বলে। অতএব পাঠকগণ এই গ্রন্থ-সন্নিবেশিত যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া সংসারে পরমানন্দ ভোগ ও অন্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি যোগ-সাধনে অক্ষম, সে সংস্কার, বাসনা-কামনা, সুখ, দুঃখ, শীত, আতপ, মান, অভিমান, মায়া, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, প্রাণের ঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে পারিলে মুক্তি লাভ হয়।*

পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক পথহারা ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি একজনও এতদ্ গ্রন্থ পাঠে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার লেখনী-ধারণ সার্থক। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও এই প্রক্রিয়ার সাধন করিয়া ফল পাইতে পারেন, সন্দেহ নাই। যদি কেহ রীতিমত যোগ শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হইলে, আমার যতদূর শিক্ষা আছে এবং আলোচনা-আন্দোলনে যে সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদনুসারে বুঝাইতে ও যত্নের সহিত ক্রিয়াদি শিক্ষা দিতে ক্রুটী করিব না। কিন্তু আমি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা
নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ওঁ মহাশান্তিঃ

* ভক্তিপথে মুক্তি, ভক্তির সাধন, প্রেমভক্তির মাধুর্য্যাস্বাদ, বৈরাগ্য-সন্ন্যাস প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের চরম বিষয়গুলি মৎপ্রণীত "প্রেমিক গুরু" গ্রন্থে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

তৃতীয় অংশ

মন্ত্র-কল্প

যোগী গুরু

তৃতীয় অংশ—মন্ত্র-কল্প

দীক্ষা-প্রণালী

নমোঽস্তু গুরবে তস্মায়িষ্টদেবস্বরূপিণে।

যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞিতম্ ॥

অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, অখণ্ড মণ্ডলাকার জগদ্ব্যাপ্ত ব্রহ্মপদ যাঁহা কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ নিত্যারাধ্য গুরুদেবের পদ-পঙ্কজে প্রণতিপুরঃসর তদুপদিষ্ট মন্ত্রকল্প আরম্ভ করিলাম।

দীক্ষাগুরু হিন্দুদিগের নিত্যারাধ্য দেবতা। গুরুপূজা ব্যতীত হিন্দুদের ইষ্টদেবতার পূজা সুসিদ্ধ হয় না। গুরুপূজা করিবার প্রথা হিন্দুদিগের অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত। গুরু সর্ব্বত্রই পূজ্য ও সম্মানার্হ। বৈদিক হউন, তান্ত্রিক হউন, বৈষ্ণব হউন, অথবা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য যাহাই হউন, হিন্দুমাত্রেই গুরুপূজা এবং গুরুর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—

ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্ ॥
ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্ ॥
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্‌দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে। যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতি কেহই তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে দান করিলে তাঁহার নিকটে ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন—

গুরু ত্যজি গোবিন্দ ভজে,
সেই পাপী নরকে মজে।

গুরুর এতাদৃশী পূজ্যভাব কেন হইল ? বাস্তবিক যে গুরুকর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়,—যিনি অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, সংসারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সাধন করেন, তাঁহার অপেক্ষা জগতে আর কে গরীয়ান, মহীয়ান্ ও আত্মীয় আছেন ? তাঁহাকে আমরা ভক্তি-প্রীতি প্রদান করিব না, তবে কাহাকে করিব ? কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে শিষ্যের পথ-প্রদর্শক গুরু গৃহস্থ লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। আজকাল

গুরুগিরি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে গুরুর গুরুত্ব নাই, কর্ত্তব্যবোধ নাই; দীক্ষার উদ্দেশ্য গুরু-শিষ্য কেহই বুঝেন না। দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ?

দীয়তে জ্ঞানমত্যর্থং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনম্।
অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥

—যোগিনী-তন্ত্র, ৬ষ্ঠ পঃ

আরও দেখ,—

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ন্ততঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রস্য সম্মতা॥

—বিশ্বসার-তন্ত্র ২য় পঃ

এই সকলের ভাবার্থ এই যে, দীক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞান হয় এবং পাপ ক্ষয় ও পাপ-বন্ধন দূর হয়। ইহাই দীক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং দীক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কয়জনের সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়?—হইবে কেন?

অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ।

—কুলমূলাবতার-কল্পসূত্র টীকা

অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারে; কিন্তু অনভিজ্ঞ মূর্খ মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারে না। ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায় মধ্যে সাধক-শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া তাহার উদ্ধারাভিলাষী সদ্‌গুরু অতি কম। যে ব্যক্তি নিজে অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধনদশায় থাকিয়া হাত-পা সঞ্চালন করিতে পারে না, সে ব্যক্তি অপরের বন্ধন মোচন করিয়া দিবে কি প্রকারে? গুরুদেবই অন্ধকার মধ্যে থাকিয়া আকুলি-বিকুলি করিয়া ঘুরিতেছেন; শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবেন কিরূপে? এইরূপ কাণ্ড-

জ্ঞানশূন্য ব্যবসাদার গুরু-নামধারী অদ্ভুত জীব কলির এক কলি। এই সমস্ত গুরু-গোস্বামিগণ আহ্নিক ও পূজাদির সময় ধ্যানে 'সোহং' ভাবনার স্থলে অন্ধকার দর্শন কিম্বা বাজারের অভিলষিত দ্রব্য ক্রয়, নয়ত বিষয়-চিন্তায় অতিবাহিত করে। কেহবা সর্ব্বগাত্রে গোপীমৃত্তিকা লেপন, মুখে হরদম্ গোপীবল্লভ রব, আকণ্ঠবক্ষ-লম্বিত লংক্লথ কিম্বা রঙ্গিন রেশমী ঝোলায় নিয়ত মালা ঠক্ ঠক্ করিতেছেন; কিন্তু মনে নানাচিন্তা এবং মুখে নানা কথা চলিতেছে। মন-কাণ নানাদিকে আকৃষ্ট, মুখেও অনবরত কথা, এদ্দিকে ঝোলার ও মালার বিরাম নাই। এই গুরু-সম্প্রদায় ছলেকৌশলে কেবল শিষ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় নিয়ত ভ্রমণ করে। প্রকৃত জ্ঞানিগণ অশেষ সাধ্য-সাধনায় শিষ্য করিতে স্বীকৃত হয়েন না; আর আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক ব্যবসাদার গুরু তোষামোদ করিয়া—নিজে বাড়ী হইতে ঘৃত, পৈতাদি আনিয়া যাচিয়া-সাধিয়া শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করেন; কিন্তু একবার শিষ্য করিতে পারিলে যায় কোথায়—নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট বার্ষিকী না পাইলে শিষ্যের মুণ্ডপাত করিয়া থাকেন। এইসকল গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দেন,—যথা—

"হরি বল মোর বাছা,
বৎসরান্তে দিও চারি গণ্ডা পয়সা আর একখানা—কাছা।"

এরূপ গুরু সংসারে বিরল নহে। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনিময়ে বার্ষিক রজতখণ্ড আদায় করিয়া কৃত-কৃতার্থ করিলে দীক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যহই দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুরু শিষ্যালয়ে আসিয়া শিষ্যের কর্ণে এক ফুঁকা দিয়া কিঞ্চিৎ রজত মুদ্রা সঞ্চিত এবং পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করিবার জন্য মৌরশী মোতকদমী সম্পত্তি স্বায়ত্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। গুরু তো স্বকার্য্য সাধন করিয়া স্বার্থো-

দেশে অপর কাহারও মুণ্ডপাত করিতে যাউন ; শিষ্য বেচারী এদিকে গুরুদত্ত সেই শুষ্ক বর্ণমালাংশ যথাসাধ্য জপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যে তিমিরে, সেই তিমিরে—তাহার হৃদয়ক্ষেত্রের অবস্থা "যথাপূর্ব্বং তথাপরং" —সেই একই প্রকার। শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার—বন্ধন মোচন করিবার—দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার এক ক্রান্তি শক্তি সে গুরু-দেবের নাই। হাররে স্বার্থান্ধ কলির গুরু! যদি টাকা লইয়া পাঁচ মিনিটে জীবাত্মার উদ্ধার সাধিত হইত, তাহা হইলে এত শাস্ত্রের আবশ্যক হইত না এবং মুনি-ঋষিগণ দীর্ঘকাল বনবাসী হইয়া কঠোর সাধনা করিতেন না। আধুনিক কুলবাবুর ন্যায় ঘড়ি-ছড়ি লইয়া টেরি বাগাইয়া মজা করিতে কসুর করিতেন না।

আরও এক কথা। শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের দীক্ষার সঙ্গে শাক্তা-ভিষেক হওয়া কর্ত্তব্য। বামকেশ্বর তন্ত্র ও নিরুত্তর তন্ত্রাদিতে উক্ত আছে যে, "যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশবিদ্যার কোন মন্ত্র দীক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, তাবৎকাল নরকে বাস করিবে। আর যে ব্যক্তি অভিষিক্ত না হইয়া তান্ত্রিক মতে উপাসনা করে, তাহার জপ-পূজাদি অভিচার স্বরূপ হয়।" যথা—

> অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ।
> তস্য পূজাদিকং কর্ম্ম অভিচারায় কল্পতে॥
>
> —বামকেশ্বর তন্ত্র

দেখ, ব্যাপারখানা কি! কিন্তু কয়জন দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যকে অভিষেক করিয়া থাকে? শাক্তগণের প্রথমে শাক্তাভিষেক, তৎপর পূর্ণাভিষেক, তদনন্তর ক্রমদীক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য। ক্রমদীক্ষা ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না। যথা—

ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কথং সিদ্ধিঃ কলৌ ভবেৎ।
ক্রমং বিনা মহেশানি সর্ব্বং তেষাং বৃথা ভবেৎ ॥

—কামাখ্যাতন্ত্র, ৩২ পঃ

ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কলিযুগে কোন মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না এবং ক্রম বিনা পূজাদি সমস্তই বৃথা। আমাদের দেশের সাধকাগ্রগণ্য ৬দ্বিজ রামপ্রসাদ ক্রমদীক্ষিত হইয়া * পঞ্চমুণ্ডীর আসনে মন্ত্র জপ করতঃ সিদ্ধি লাভ করেন। অনেকে বলে, "রামপ্রসাদ গান গাহিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।" কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নহে; আজিও তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন বিদ্যমান আছে, আমি স্বচক্ষে ঐ আসন দেখিয়াছি।

মহাত্মা রামপ্রসাদ ব্যতীত আর কেহ মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এরূপ শুনা যায় না। ইহার প্রধান কারণ গুরুকুলের অবনতি। উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে মন্ত্রযোগে ফল হয় না। এইত গেল এক পক্ষের কথা; দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রায়ই কেহ সদ্‌গুরু চিনে না। মানবজীবন-পণ্ডকারী ভণ্ড গুরুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভুলিয়া, বহ্বাড়ম্বরশূন্য সাধকগণকে উপেক্ষা করিতেছে, কাজেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও অভাব পূর্ণ হইতেছে না। কেহবা কুলগুরুত্যাগজনিত মহাপাপপঙ্কে নিমজ্জন আশঙ্কায় হ্রস্ব-দীর্ঘ-বোধবিবর্জ্জিত ষণ্ডতুল্য গণ্ডমূর্খের চরণে লুণ্ঠিত হইয়াও অন্তিমে সেই দণ্ডধারীর দূতগণের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মনে করিয়া গণ্ডে হস্ত দিয়া ভয়ে লণ্ডভণ্ড হইতেছে। বাস্তবিক কুলগুরু পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রানুসারে পৈতৃক গুরুত্যাগ জন্য দুরদৃষ্টশালী হইতে হয়; তবে উপায় কি?

উপায় আছে। পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার নিকট

* বিধানানুযায়ী দুইটী চণ্ডালের মুণ্ড, একটী শৃগালের মুণ্ড, একটী বানরের মুণ্ড এবং একটী সর্পের মুণ্ড, এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়া জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হয়।

মন্ত্র-গ্রহণান্তর পরে শিক্ষার জন্য জগদ্গুরু মহেশ্বর

সদ্গুরু

লাভের বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ ॥

—তন্ত্রবচন

মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্য ফুলে গমন করে তদ্রূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

অতএব সকলেই পৈতৃক গুরুর নিকট প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তদনন্তর উপযুক্ত গুরুর নিকটে উপদেশ লইবে এবং সাধনাভিলাষিগণ ক্রিয়াদি শিক্ষা করিবে। কিন্তু সাবধান!—ভিতরের খবর না জানিয়া বেশ-বিন্যাস বা হাব-ভাব বাক্যাড়ম্বর দেখিয়া যেন ভুলিও না। গুরু চিনিয়া ধরিতে না পারিলে ক্রমাগত এক গুরু হইতে অন্য গুরু, এইরূপ নিয়ত বেড়াইলে আর সাধন করিবে কবে? বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, আমাদের দেশের গৃহস্থ গুরুর নিকট সাধকের অভাব পূরণ হইবে না। সেই জন্য বলি, উপগুরু ধরিয়াও যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিতে না হয়। যাহাদের কুলগুরু নাই, তাহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবে। আমি এ বিষয়ে ভুক্তভোগী; অনেক ভণ্ডের হাতে পড়িয়া কত দিন পণ্ড করিয়াছি। অতএব শাস্ত্রাদিতে যেরূপ গুরুর লক্ষণ লেখা আছে, তদনুসারে উপযুক্ত গুরু ধরিয়া উপদেশ লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা সুফল আশা

সুদূরপরাহত। একেই তো বহুজন্ম না খাটিলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধি হয় না। তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার সাধনের মধ্যে মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অল্পজ্ঞানী অধম অধিকারিগণই মন্ত্রযোগ সাধন করিয়া থাকে। তদুপরি উপযুক্ত উপদেষ্টার উপদেশে অনুষ্ঠিত না হইলে গত্যান্তর নাই।

মন্ত্রতত্ত্ব

—*—

নাদতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে কিছুই ছিল না ; প্রথমে গুণ ও শক্তির বিকাশ। গুণত্রয় ও শক্তিত্রয় লইয়াই সপ্ত-লোকের সৃজন, পালন ও লয় সংঘটিত হইতেছে। গুণ অব্যক্ত জীবের ন্যায় সমস্ত বস্তুতেই থাকে, কিন্তু শক্তির সাহায্যে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। পরমাণু, তন্মাত্রা এবং বিন্দু লইয়াই জগৎ। পরমাণুকেই গুণ বলা যায়। আর অহঙ্কার তত্ত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্রে সাকল্যে জগৎ সৃষ্টি হয়। বিন্দু শব্দ-ব্রহ্মের অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং চিদংশবীজ। ফলে বিনাশই একার্থবোধক এবং বিনাশই নিত্য সূক্ষ্মশক্তি-ব্যঞ্জক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি অমূর্ত্ত গুণ—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী ইঁহারাই তাঁহাদের সূক্ষ্ম শক্তি। গুণ-গুলি শক্তিসম্বলিত হইয়া স্থূল হইয়াছেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি সরস্বতী। সরস্বতী নাদরূপিণী শব্দব্রহ্ম ; সরস্বতী সেই শব্দব্রহ্মের চিদংশবীজ। ইহাই আমাদের মন্ত্রবাদের মূলাত্মিকা শক্তি। এই শব্দ যে কার্য্যের জন্য একত্রে গ্রথিত হইয়া যোগবলশালী ঋষিদিগের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া পদার্থ-সংগ্রহে শক্তিমান হইয়াছিল,

তাহাই মন্ত্ররূপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব মন্ত্রশব্দ যে অলৌকিক শক্তিশালী ও বীর্য্যশালী, তাহাতে সন্দেহ কি? যোগযুক্ত হৃদয়ের অত্যধিক স্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও বিকীরিত হয়।

বীজমন্ত্র সমুদয় শক্তির ব্যক্ত সূক্ষ্মবীজ। যেমন "ক্লীং" কৃষ্ণের সূক্ষ্ম ব্যক্ত বীজ। একটী অশ্বত্থ বীজের উপমা ধর। বীজের যাহা খোসা ভুসি, তাহাতে এমন কি আছে যাহাতে ঐ প্রকাণ্ড মহীরুহের সৃষ্টি হইয়াছে? রাসায়নিক বিশ্লেষণেও যদি কিছু বাহির করিতে না পারি, তবে চারি-পাঁচ দিন মাটীর মধ্যে থাকিয়া একদিনে বৃক্ষাঙ্কুর কোথা হইতে বাহির হইল? ক্রমে তাহা কোন অজানা শক্তির প্রভাবে গগন ধাইয়া উঠিয়া পড়িল? ঐ ক্ষুদ্র সর্ষপ পরিমিত বীজের মধ্যে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ কারণরূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির সহায়তায় সে কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। তদ্রূপ দেব-দেবীর বীজমন্ত্রে তাঁহাদের সূক্ষ্ম শক্তি নিহিত থাকে; শুনিতে সামান্য বর্ণ মাত্র, কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা তাহার শক্তি জাগাইয়া দিলে, যে দেবতার যে বীজ, সেই দেবতাশক্তির কার্য্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, মন্ত্র যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তাহা সেই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যাইবেক। তন্ত্রে উক্ত রহিয়াছে যে—

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিধ্যন্তি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥

—কুলার্ণবে

মন্ত্রজপ কালে মন, পরম শিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শত কল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। এইসকল তথ্য সম্যক্ না জানিয়া, সকলে বলে যে "মন্ত্র জপ

করিয়া ফল হয় না।” কিন্তু ফল যে আপনাদের ক্রটীতে হয় না, তাহা কেহ বুঝে না। এই দেখ না, জগদ্‌গুরু যোগেশ্বর কি বলিয়াছেন—

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি॥

—সরস্বতী-তন্ত্র

মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানিয়া শতকোটী জপ করিলেও মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হয় না।

অন্ধকারগৃহে যদ্বন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে।
দীপনীরহিতো মন্ত্রস্তথৈব পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—সরস্বতী-তন্ত্র

আলোক-বিহীন অন্ধকার গৃহে যেরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ দীপনীহীন মন্ত্রজপে কোন ফল হয় না। অন্য তন্ত্রে ব্যক্ত আছে—

মণিপুরে সদা চিন্ত্যা মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকম্।

অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুর চক্রে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। বাস্তবিক মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে, তাহা জানিয়া ক্রিয়া না করিলে মন্ত্র কখনই চৈতন্য হইবে না; সুতরাং প্রাণহীন দেহের ন্যায় অচৈতন্য মন্ত্র জপ করিলে কোনই ফল হয় না। কিন্তু এই যে মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে কি প্রকার, তাহা কোন ব্যবসায়ী গুরু বুঝাইয়া দিতে পারে কি? আমি জানি, গৃহস্থ লোকের মধ্যে একজনও নাই; যোগী ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই ঐ সঙ্কেত ও ক্রিয়ানুষ্ঠান জ্ঞাত আছেন।

অতএব সাধনাভিলাষী জাপকগণের যদি মন্ত্র জপ করিয়া ফল লাভ করিবার বাসনা থাকে, তবে রীতিমত মন্ত্র চৈতন্য করাইয়া জপ করিবে। জপ-রহস্য সম্পাদনপূর্ব্বক রীতিমত জপ করিয়া, বিধিপূর্ব্বক জপসমর্পণ

করিলে জপজনিত ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। জপরহস্য সম্পাদন ব্যতিরিকে জপফল লাভ করা একান্তই অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জপরহস্য ও জপসমর্পণবিধি প্রায় কেহই জানে না।* ইহার কারণ উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে জপাদির প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকল ব্যক্তিরই জপরহস্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কল্লুকা সেতু, মহাসেতু, মুখশোধন, করশোধন প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রকার জপরহস্য ক্রমান্বয়ে পর পর যথানিয়মে সম্পাদনপূর্ব্বক জপান্তে বিধিপূর্ব্বক জপসমর্পণ করিতে হইবে। জপরহস্য আবার দেবতাভেদে পৃথক্ পৃথক্ আছে। সুতরাং বিংশতিপ্রকার জপরহস্য দেবতাভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। বিশেষতঃ গ্রন্থদৃষ্টে সাধারণে ঐ জপরহস্য সম্পাদন করিতে পারিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। অন্য উপায়েও মন্ত্রচৈতন্য করা যায়। আমাদের দেশে সাধারণত পুরশ্চরণ করিয়া মন্ত্রচৈতন্যের চেষ্টা হইয়া থাকে।

মন্ত্র জাগান

চলিত ভাষায় পুরশ্চরণ-ক্রিয়াকে "মন্ত্র-জাগান" বলে। পুরশ্চরণ না করিলে মন্ত্র-চৈতন্য হয় না, মন্ত্র-চৈতন্য না হইলে সে মন্ত্রপ্রয়োগে কোন ফল লাভ হয় না। অতএব যে কোন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এখনকার যজমান বা শিষ্য—গুরু

* জপরহস্য ও জপ-সমর্পণবিধি প্রভৃতি মন্ত্রের নানাবিধ জপের কৌশল ও সাধনাদি মৎপ্রণীত "তান্ত্রিক গুরু" পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

বা পুরোহিতের নিকট হইতে পুরশ্চরণ-পদ্ধতি জানিয়া লইয়া যে পুরশ্চরণ করে, তাহাতে তাহারা কেবল অনর্থক অর্থব্যয় ও উপবাসাদি করিয়া থাকে মাত্র। ঐসকল কারণেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে। কেননা, অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া যে কার্য্য সমাপন করিল, তাহাতে যদি কোনপ্রকার সুফল দৃষ্ট না হয়, তবে সে কার্য্য করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? ইহারাই আবার বলিয়া থাকে, "এখনকার লোক ইংরাজি পড়িয়া ধর্ম্মকর্ম্ম মানে না বা শাস্ত্রাদি বিশ্বাস করে না।" কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে যে তাহারাই সমধিক দোষী, তাহাদের ত্রুটিতেই যে লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হইতেছে, তাহা স্বীকার করে না।

পুরশ্চরণ ত মন্ত্রজপ নহে। মন্ত্র যে ভাবে উচ্চারণ করিলে স্বরকম্পন হয়, মন্ত্র জাগানতে তাহাই শিক্ষা করিতে হয়। সঙ্গীত-শিক্ষার্থীকে রাগ-রাগিণী অভ্যাস করিতে যেমন স্থানবিশেষ দিয়া ঐ স্বর বাহির করিতে হয় অর্থাৎ গলা সাধিতে হয়, মন্ত্র উচ্চারণ করিতেও তদ্রূপ নাড়ী সাধিতে হয়। পুরশ্চরণ সেই নাড়ী-সাধা। ইহা আমি রচাইয়া বলিতেছি না; তন্ত্রে উক্ত আছে—

মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে।
মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ॥
—গৌতমীয়ে

মূলমন্ত্রকে সুষুম্নার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য পরিজ্ঞানপূর্ব্বক জপ করিবে।

মন্ত্র যথাভাবে উচ্চারণপূর্ব্বক কিরূপে জপ করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা করা পুরশ্চরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব জাপকগণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে পুরশ্চরণ-ক্রিয়া শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই জপজনিত ফললাভ করিবে।

——*——

মন্ত্রশুদ্ধির সপ্ত উপায়

সম্যক্‌রূপে পুরশ্চরণাদি সিদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ নিয়মে পুরশ্চরণাদি করিবে। এই-রূপে যথানিয়মে তিনবার পুরশ্চরণ করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ যদি কৃত-কার্য্য হইতে না পারে, তথাপি ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষান্ত হইবে না; শঙ্করোক্ত সপ্ত উপায় অবলম্বন করিবে। যথা—

ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং শোষপোষণে।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনু॥

—গৌতমীয়ে

ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, শোষণ, পোষণ ও দাহন, ক্রমশঃ এই সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে।

ভ্রামণ—

যং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সকল গ্রন্থন করিবে। অর্থাৎ শিলা-রস, কর্পূর, কুঙ্কুম, বেণার মূল ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা মন্ত্রান্তর্গত বর্ণ সকল ভিন্ন ভিন্ন করতঃ একটী বায়ুবীজ এবং একটী মন্ত্রাক্ষর, এইরূপে মন্ত্রেতে সমস্ত মন্ত্রবর্ণ লিখিবে। পরে, ঐ লিখিত মন্ত্র দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও জল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পূজা, জপ ও হোম করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ভ্রামণের দ্বারাও যদি মন্ত্রসিদ্ধ না হয়, তবে রোধন করিতে হইবে।

রোধন—

ওঁ এই বীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ জপের

নাম রোধন। যদি রোধনক্রিয়া দ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে বশীকরণ করিও।

বশীকরণ—

আলতা, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্র, ধুস্তুরবীজ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে; এইরূপ করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে চতুর্থ উপায় অবলম্বন করিবে।

পীড়ন—

অধোত্তর যোগে মন্ত্র জপ করিয়া অধোত্তররূপিণী দেবতার পূজা, করিবে। পরে আকন্দের দুগ্ধ দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া পাদদ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক সেই মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবে—এই কার্য্যকে পীড়ন বলে। ইহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে মন্ত্রের শোষণ করিও।

শোষণ—

বং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে এবং ঐ মন্ত্র যজ্ঞীয় ভস্ম দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে। এইরূপ শোষণ করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পোষণ করিতে হইবে।

পোষণ—

মূলমন্ত্রের আদি ও অন্তে ত্রিবিধ বালাবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং গোদুগ্ধ ও মধু দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে। ইহারই নাম মন্ত্রের পোষণ ক্রিয়া। যদি ইহাতেও মন্ত্রশুদ্ধি না ঘটে, তবে শেষ উপায় দাহন ক্রিয়া করিবে।

দাহন—

মন্ত্রের এক এক অক্ষরের আদি, মধ্য ও অন্তে রং এই অগ্নিবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং পলাশবীজের তৈল দ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া স্কন্ধদেশে ধারণ করিবে। মহাদেব বলিয়াছেন, এই সকল ক্রিয়া অতি সহজ, চারি পাঁচ দিনেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

*

মন্ত্রসিদ্ধির সহজ উপায়

—❀❀❀—

উপরে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যে সপ্ত ক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহা কোন অভিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হয়। কেননা, জ্বলন্ত অগ্নিতে বর্ত্তিকা ধরান সহজ দ্বিতীয়তঃ কথা এই—যে, মন্ত্র পুরশ্চরণরূপ অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধ হইল না, তখন বুঝিতে হইবে, হয় সে সাধকের ব্রহ্মপথ মুক্তির উপায় হয় নাই, নয় তাহার গুরুদত্ত মন্ত্র উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে মন্ত্র লওয়া হইয়াছে, সে মন্ত্র আর পরিত্যাগের উপায় নাই। পত্যন্তর গ্রহণে যেমন বিবাহিতা নারীগণের ব্যভিচার ঘটে, তদ্রূপ এক মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করিলেও শাস্ত্রানুসারে ব্যভিচার হয়। অতএব তখনকার অবশ্য কর্ত্তব্য, কোন মন্ত্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ক্রিয়ার যে কোন ক্রিয়া দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি করাইয়া লইবে। ঐ সকল দ্রব্যাদি ও বীজাদি দ্বারা তিনি সাধকের শরীরে ঐ মন্ত্রেরই তেজ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু কথা এই—সেরূপ মন্ত্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তি সুলভ নহে। কাহারও দুরদৃষ্ট বশতঃ ঐরূপ সিদ্ধব্যক্তি নাও জুটিতে পারে। অতএব উপায় কি? উপায় আছে,—

নিজে নিজেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে "ইথারের ভাইব্রেষণে" (Vibration of the ether) মন্ত্র চৈতন্য করা সহজ; কিন্তু তাহাও স্বল্পজ্ঞানী সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। একটী অতি সহজ ও সকলের করণীয় প্রণালীতে মন্ত্র চৈতন্য করা যায়। সে ক্রিয়ানুযায়ী জপ করিলে বিনা আয়াসে মন্ত্র চৈতন্য হয়। অগ্রে জপের বিশিষ্ট নিয়ম জানিয়া এবং মন্ত্রের

ছিন্নাদি দোষশান্তি

করিয়া লইতে হয়। মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ এই যে, মন্ত্র সকল বহুদিন হইতে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, যদি কোন ভুল ভ্রান্তিতে তাহার কোন অংশ পতিত বা ছাড় হইয়া থাকে, তবে কম্পন ঠিক হয় না। কাজেই মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অক্ষরে শব্দ উত্থাপিত করে, অতএব অন্য অক্ষরাদির একত্র যোগে জপ করিলে ঐ মন্ত্রের সে দোষের শান্তি হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাকে কম্পনযুক্ত করিয়া লইতে পারে।

মন্ত্রের ছিন্নাদি যে সমস্ত দোষ নিরূপিত হইয়াছে, মাতৃকাবর্ণ প্রভাবে সেই সকল দোষের শান্তি হইয়া থাকে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের এক একটি বর্ণ পূর্ব্বে এবং এক একটী বর্ণ পরে যোগ করিয়া অষ্টোত্তর শতবার (কলিতে চারি শত বত্রিশ বার) জপ করিবে, তাহা হইলেই মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষের শান্তি হয় এবং সেই মন্ত্র যথোক্ত ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে। আরও এক কথা—সেতু ভিন্ন জপ নিষ্ফল হয়, অতএব

সেতু নির্ণয়

শাস্ত্রে কথিত আছে। কালিকা পুরাণাদিতে লিখিত আছে, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রেরই ওঁ এই বীজ সেতু। জপের পূর্ব্বে ওঁকাররূপী সেতু না থাকিলে, সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে ঐ মন্ত্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। অতএব সাধকগণ মন্ত্রজপের পূর্ব্বে ও পরে সেতুমন্ত্র জপ করিবে।

শূদ্রগণের ওঁ উচ্চারণে অধিকার নাই। চতুর্দ্দশ স্বর ঔ, ইহাতে নাদবিন্দু যোগ করিলে ঔঁ হয়। ইহাই শূদ্রের সেতুমন্ত্র জানিবে। পূজা-জপাদিতে

ভূতশুদ্ধি

না করিলে অধিকার হয় না। অতএব জপের পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। বাহুল্যভয়ে ভূতশুদ্ধির সংস্কৃতাংশ বাদ দিয়া সাধারণের সুবিধার জন্য বঙ্গভাষায় লিখিত হইল।

"রং" এই মন্ত্র পড়িয়া জলধারার দ্বারা নিজের শরীরকে বেষ্টন করতঃ ঐ জলধারাকে অগ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিয়া হাত দুইটী উত্তানভাবে বাম-দক্ষিণ ক্রমে উপর্য্যুপরি স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সোঽহং (শক্তি বিষয়ে "হংসঃ" ও শূদ্র সম্বন্ধে "নমঃ") এইরূপে চিন্তা করিয়া হৃদয়স্থিত দীপ-কলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্রক্রমে ভেদ পূর্ব্বক শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যগত পরমাত্মাতে সংযোগ করিয়া, তাহাতেই শারীরিক ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে লীন চিন্তা করিবে। তৎপরে বাম নাসাপুটে "যং" এই বায়ুবীজকে ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া প্রাণায়াম-প্রণালী অনুসারে উক্ত বীজকে ষোলবার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করতঃ বাম নাসাপুট রোধ করিয়া চৌষট্টিবার জপ করতঃ কুম্ভক করিয়া বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্ব পিঙ্গলাক্ষ পিঙ্গলকেশ

পাপপুরুষের সহিত স্বদেহকে শোষণ পূর্ব্বক ঐ বীজ বত্রিশবার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ করিবে। আবার রক্তবর্ণ "রং" এই বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাপুটে চিন্তা করিয়া উহা ষোলবার জপ করতঃ বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় রোধ করিয়া উহার চৌষট্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া উক্তবীজজনিত মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নি দ্বারা পাপপুরুষের সহিত স্বদেহ দগ্ধ করিয়া পুনরায় বত্রিশবার জপ করিয়া বামনাসা দ্বারা দগ্ধ ভস্মের সহিত বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় শুক্লবর্ণ "ঠং" এই চন্দ্রবীজ বাম নাসায় চিন্তা করিয়া তাহা ষোলবার জপ করতঃ শ্বাস আকর্ষণ করিয়া ঐ বীজাকার চন্দ্রকে ললাটে চিন্তা করিয়া উভয় নাসাপুট রোধ করতঃ "বং" এই বরুণবীজ চৌষট্টিবার জপ করতঃ কুম্ভক দ্বারা ললাটস্থ উক্ত চন্দ্র হইতে নিঃসৃত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ স্বরূপ অমৃত ধারার দ্বারা শরীরকে নূতন গঠিত চিন্তা করিয়া "লং" এই পৃথ্বীবীজ বত্রিশবার জপ করতঃ আত্মদেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। পরে "হংস" (স্ত্রী ও শূদ্রগণ "নমঃ") এই মন্ত্র দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে পুনরায় স্বস্থানে চালনা করিবে। অনন্তর, "সোঽহং" এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধক জপে বা পূজাদিতে নিযুক্ত হইবে।

লক্ষ লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিও প্রকৃত ভূতশুদ্ধি করিতে পারে কি না সন্দেহ। ইড়া বা পিঙ্গলার পথে হইবে না ; সুষুম্নাপথে দেহের সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত বৃত্তি ঐ কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে সর্ব্বতোভাবে একমুখী করাই ভূতশুদ্ধির মুখ্য উদ্দেশ্য। কেহ যদি যথানিয়মে ভূতশুদ্ধি করিতে না পারে, তাহারও সহজ উপায় আছে। যথা—

জ্যোতির্ম্মন্ত্রং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
এতজ্জ্ঞানপ্রভাবেন ভূতশুদ্ধিফলং লভেৎ॥

—ভূতশুদ্ধিতন্ত্র

জ্যোতির্ম্মন্ত্র অর্থাৎ "ওঁ হ্রৌঁ" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিলে ভূতশুদ্ধির ফল হয়। আর এক প্রকার সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি আছে। যথা—

(১) ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃসুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

(২) ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।

(৩) ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা।

(৪) ওঁ পরমশিবসুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল সোহহং হংসঃ স্বাহা।

কেবল এই চারিটী মন্ত্র পাঠ করিলেই ভূতশুদ্ধির ফল হয়। অএতব পাঠকগণের মধ্যে যাহার যেটী সুবিধা হয়, সে তদনুসারে ভূতশুদ্ধি করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে।
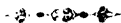
জপের কৌশল
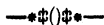
লিখিত হইতেছে। সাধকগণ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দোষশান্তি ও সেতুমন্ত্র যোগে এইপ্রকার অনুষ্ঠানে পূজা-হোমাদি বিহনেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যথা—

মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে॥

—গৌতমীয়-তন্ত্র

সাধক প্রথমতঃ মনঃসংযম পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুর ধ্যান-প্রণামান্তর মন্ত্রার্থ ভাবনা করিবে।

মন্ত্রার্থঃ দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি।
বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ॥

ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন ভাবিলে মন্ত্রার্থ ভাবনা হয়। মন্ত্রার্থ ভাবনা করিয়া মন্ত্র চৈতন্য করিবে অর্থাৎ আপন আপন মূলমন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে "ঈং" এই বীজ যোগ করিয়া হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে। অনন্তর মূলাধার পদ্মের অন্তর্গত যে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ আছেন, সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সেই স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; সাধক জপকালে মন্ত্রাক্ষরসমুদয় সেই কুণ্ডলিনী শক্তিতে গ্রথিত ভাবনা করিয়া নিঃশ্বাসের তালে তালে অর্থাৎ পূরক কালে চিন্তা দ্বারা ঐ কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থাপিত করতঃ সহস্রার-কমল-কর্ণিকার মধ্যবর্ত্তী পরমানন্দময় পরমশিবের সহিত ঐকাত্ম্য পাওয়াইবে, এবং রেচককালে ঐ শক্তিকে যথাস্থানে আনিবে। এইরূপ নিঃশ্বাসের তালে তালে যথাশক্তি জপ করতঃ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া ভাবনার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে একবার সহস্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে আনিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে সুষুম্না পথে বিদ্যুতের ন্যায় দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে।

প্রত্যহ এইরূপ নিয়মে জপ করিলে, সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। নতুবা মালা-ঝোলা লইয়া বাহ্য অনুষ্ঠানে শত কল্পেও ফল পাইবে না।

ব্রাহ্মণগণ যথাবৎ প্রণব উচ্চারণ করিয়াও সিদ্ধিলাভ ও মনোলয় করিতে পারিবে। যথাবৎ উচ্চারণ বলিতে, জপে স্বর-কম্পন, তাহার

অর্থ ভাবনা ও তাহাতে মনের অভিনিবেশ করার নামই প্রণবের সার্থক উচ্চারণ। যথা—

অ—উ—ম এই তিনটী শব্দ লইয়া ওঁ শব্দ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক ঐ তিনটী অক্ষর—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ব্যক্ত বীজ। সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা উদারা, মুদারা, তারা, স্বরের এই তিনটী বিভাগ করিয়াছেন। ওঁ এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে যে স্বর ঝঙ্কারটী উত্থিত হইবে, তাহার মধ্যে ঐ বিভাগ তিনটী থাকিবে এবং জীবের অবস্থান-স্থল ষড়্দল কমল হইতেই প্রথমে স্বরের উৎপত্তি হইবে, তৎপরে অনাহত পদ্মে প্রতিধ্বনি করিয়া সহস্রারে ধ্বনিত হইবে, এমন ভাবে একটানে স্বরটী চালিত করিতে হইবে। চীৎকার করিয়া বলিলেই যে এমন হইবে, তাহা নহে। মনে মনে বলিলেও ঠিক এইরূপ স্বর কম্পন করা যায়। সংসারের কাজ করিতে করিতেও ঐ ধ্যানে, ঐ জ্ঞানে নিমগ্ন থাকা যায়।

সর্ব্বদা প্রণবের অর্থধ্যান ও প্রণব জপ করিলে সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হয়। তখন প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা-সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের সহিত উপাসনার যে সঙ্কেত ভাব অর্থাৎ "ওঁ" বলিলে ঈশ্বরের স্বরূপ সাধকহৃদয়ে সমুদিত হয়। কেন হয়, তাহা বড় জটিল ও কঠিন সমস্যা। তবে ইহা নিশ্চিত যে প্রণব (ওঁ) ঈশ্বরের অতি ঘনিষ্ঠ অভিধেয় সম্বন্ধ।

———*———

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ

—*—

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্ ।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি ।
গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

—তন্ত্রসার

জপকালে হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ, সর্ব্ব-অবয়বের বর্দ্ধিষ্ণুতা, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ এবং গদ্‌গদভাষণ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। মনোরথ-সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। দেবতা-দর্শন, দেবতার স্বর-শ্রবণ, মন্ত্রের ঝঙ্কার, শব্দ-শ্রবণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য লক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক যাঁহারা প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ শিব-তুল্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ফল কথা, যোগ-সাধনায় আর মন্ত্র-সাধনায় কোন প্রভেদ নাই; কারণ উদ্দেশ্যস্থান একই, তবে পথের বিভিন্নতা এই মাত্র।

—*—

শয্যাশুদ্ধি

—*—

যাহারা রাত্রে শয্যায় বসিয়া জপ করিয়া থাকে, তাহাদের শয্যাশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। শয্যাশুদ্ধির মন্ত্র ও নিয়ম এই—

প্রথমে "ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা"

—এই মন্ত্রে শয্যার উপরে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। স্ত্রীদেবতার উপাসকগণ ত্রিকোণের কোণ নিম্নদিকে ও পুংদেবতার উপাসকগণ কোণ উপরদিকে রাখিবে। পরে "হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে মানস-পূজা করিয়া, "হ্রীং মৃতকায় নমঃ ফট্" বলিয়া শয্যার উপরে তিনবার আঘাত ও ছোটিকা (তুড়ী) দ্বারা দশদিক বন্ধন করিবে। তদনন্তর করজোড়ে—

"ওঁ শয্যে ত্বং মৃতরূপাসি সাধনীয়াসি সাধকৈঃ।
অতোঽত্র জপ্যতে মন্ত্রো হ্যস্মাকং সিদ্ধিদা ভব॥"

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে।

মন্ত্রসিদ্ধি-লাভ ও এইসকল বিষয় বিশেষ করিয়া যে সকল সাধকের জানিবার ইচ্ছা, প্রয়োজন হইলে শিখাইয়া দিতে পারা যায়। যাহাদের শিক্ষা ও সংসর্গ-দোষে মন্ত্র বা হিন্দুশাস্ত্রাদিতে বিশ্বাস নাই, তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইলে গুরুকৃপায় মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা ও যোগের দু'একটী বিভূতি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি।

ক্ষমধ্বং পণ্ডিতা দোষং পরপিণ্ডোপজীবিনঃ।
মমাশুদ্ধ্যাদিকং সর্ব্বং শোধ্যং যুষ্মাভিরুত্তমৈঃ॥

ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ

চতুর্থ অংশ

স্বর-কল্প

যোগী গুরু

চতুর্থ অংশ—স্বরকল্প

স্বরের স্বাভাবিক নিয়ম

সর্ব্ববর্ণসংপূজিতং সর্ব্বগুণসমন্বিতং।
ব্রহ্ম-মুখ-পঙ্কজ-জ-ব্রাহ্মণায় নমোনমঃ॥

দ্বিজরাজ-গামী ত্রিজগৎস্বামী নারায়ণের হৃদি-সরোজে যে দ্বিজরাজের পদ-পঙ্কজ বিরাজিত, সেই দ্বিজবংশাবতংস ব্রহ্মাংশসম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞগণের চরণ-সরোজে নতশিরে নমস্কার করিয়া স্বরকল্প আরম্ভ করিলাম।

যোগ-সাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যেমন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ হয়, তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে সংসারে প্রত্যেক কার্য্যে সুফল লাভ করা যায়, ভাবী বিপদাপদ ও মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞাত হওয়া যায় এবং বিপদাদির হস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ভাবী রোগাদির আক্রমণ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় বুঝিতে পারা যায়। বিনা ব্যয়ে স্বল্পায়াসে পীড়াদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ

পাওয়া যায়। ফলে স্বরজ্ঞানানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে সংসারে পুঞ্জীকৃত নানাকার্য্যময় কর্ম্মক্ষেত্রে সকল কার্য্যেই সুফল লাভ করতঃ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করা যায়।

বিশ্বপিতা বিধাতা মনুষ্যের জন্মসময় দেহের সঙ্গে এমন চমৎকার কৌশলপূর্ণ অপূর্ব্ব উপায় করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা জানিতে পারিলে সাংসারিক বৈষয়িক কোন কার্য্যে বিফলমনোরথজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। আমরা সেই অপূর্ব্ব কৌশল জানি না বলিয়াই আমাদের কার্য্যনাশ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও রোগ ভোগ করিতে হয়। এই সকল বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার নাম স্বরোদয় শাস্ত্র। এই স্বরশাস্ত্র যেমন দুর্লভ, স্বরজ্ঞ গুরুরও তেমনি অভাব। স্বরশাস্ত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। আমি এই শাস্ত্র পর্য্যালোচনায় পদে পদে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। সমগ্র স্বরশাস্ত্র যথাযথ লিপিবদ্ধ করা একান্ত অসম্ভব। কেবল সাধকগণের প্রয়োজনীয় কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

স্বরশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

কায়ানগরমধ্যে তু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ।

দেহনগর মধ্যে বায়ু রাজাস্বরূপ। প্রাণবায়ু নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু গ্রহণের নাম নিঃশ্বাস এবং বায়ু পরিত্যাগের নাম প্রশ্বাস। জীবের জন্ম হইতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতিনিহত শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য হইয়া থাকে। এই নিঃশ্বাস আবার দুই নাসিকায় এক সময়ে সমভাবে প্রবাহিত হয় না। কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। ক্বচিৎ কখন এক-আধ মুহূর্ত্ত দুই নাসিকায় সমভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়। বাম নাসা-

পুটের শ্বাসকে ইড়ার বহন, দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলার বহন ও উভয় নাসাপুটে সমান ভাবে বহিলে, তাহাকে সুষুম্নার বহন বলে। এক নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া অন্য নাসিকা দ্বারা শ্বাস রেচনকালে বুঝিতে পারা যায় যে এক নাসিকা হইতে সরলভাবে শ্বাস প্রবাহ চলিতেছে, অন্য নাসাপুট যেন বন্ধ; তাহা হইতে অন্য নাসার ন্যায় সরলভাবে নিঃশ্বাস বাহির হইতেছে না। যে নাসিকার দ্বারা সরলভাবে শ্বাস বাহির হইবে, তখন সেই নাসিকার শ্বাস ধরিতে হইবে। কোন নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পাঠকগণ এইরূপে অবগত হইবে। ক্রমশঃ অভ্যাসবশে অতি সহজেই কোন নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, তাহা জানা যায়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবারাত্র মধ্যে বারো বার বাম, বারো বার দক্ষিণ নাসিকায় ক্রমান্বয়ে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন দিন কোন্ নাসিকায় প্রথমে শ্বাসের ক্রিয়া হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। যথা—

> আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে।
> প্রতিপত্তো দিনান্যাহুঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে॥
>
> —পবন-বিজয়-স্বরোদয়

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া চন্দ্র অর্থাৎ বাম নাসায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় প্রথমে শ্বাস প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী. ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা—এই নয়দিনের প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় সময় প্রথমে বাম নাসিকায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী এই ছয় দিনের

প্রাতঃকালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস আরম্ভ হইয়া আড়াই দণ্ড থাকিবে। পরে বিপরীত নাসিকায় উদয় হইবে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা—এই নয়দিন সূর্য্যোদয় সময় প্রথমে দক্ষিণনাসায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী এই ছয়দিনে দিনমণির উদয় সময় প্রথমে বাম নাসায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া আড়াই-দণ্ডান্তরে অন্য নাসায় উদয় হইবে। এইরূপ নিয়মে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাই মনুষ্যজীবনে শ্বাস-বহনের স্বাভাবিক নিয়ম।

বহেত্তাবদ্‌ঘটিমধ্যে পঞ্চতত্ত্বান নির্দ্দিশেৎ।

—স্বরশাস্ত্র

প্রতিদিন দিবা রাত্র ষাট দণ্ডের মধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসায় নির্দ্দিষ্ট মতে ক্রমান্বয়ে শ্বাস বহন কালে ক্রমশঃ পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। এই শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়; ফলে সাংসারিক, বৈষয়িক সকল কার্য্যে সুফল লাভ করতঃ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়।

বাম নাসিকার শ্বাসফল

—✱—

যখন ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন স্থির কর্ম্ম সকল করা কর্ত্তব্য। সেই সময়ে অলঙ্কার ধারণ দূরপথে গমন, আশ্রমে প্রবেশ, রাজমন্দির ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং

দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। দীঘী, কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় ও দেবস্থস্তাদি প্রতিষ্ঠা করিবে। তৎকালে যাত্রা, দান, বিবাহ, নববস্ত্র পরিধান, শান্তিকর্ম্ম, পৌষ্টিককর্ম্ম, দিব্যৌষধি সেবন, রসায়ন কার্য্য, প্রভু দর্শন, বন্ধুত্ব সংস্থাপন এবং বহির্গমন প্রভৃতি শুভকার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিবে। বামনাসাপুটে নিঃশ্বাস বহন কালে শুভকার্য্য সকল করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু বায়ু, অগ্নি ও আকাশ তত্ত্বের উদয় সময়ে উক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতে নাই।

দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসফল

যখন পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন কঠিন ও ক্রূর বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করণ, স্ত্রীসংসর্গ, বেশ্যাগমন, নৌকাদি আরোহণ, দুষ্টকর্ম্ম, সুরাপান, তান্ত্রিক মতে বীরমন্ত্রাদি সম্মত উপাসনা, দেশাদি ধ্বংশ, বৈরীকে বিষদান, শাস্ত্রাভ্যাস, গমন, মৃগয়া, পশু বিক্রয়, ইষ্টক, কাষ্ঠ, পাষাণ এবং রত্নাদি ঘর্ষণ ও বিদারণ, গীতাভ্যাস, যন্ত্রতন্ত্র নির্ম্মাণ, দুর্গ ও গিরি আরোহণ, দ্যূতক্রিয়া, চৌর্য্য, হস্তী, অশ্ব ও রথাদি যানে আরোহণ শিক্ষা, ব্যায়ামচর্চ্চা, মারণ ও উচ্চাটনাদি ষটকর্ম্ম সাধন, যক্ষিণী, বেতাল ভূতাদি সাধন, ঔষধ সেবন, লিপিলিখন, দান, ক্রয়, বিক্রয়, যুদ্ধ, ভোগ, রাজদর্শন, স্নানাহার প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মহাদেব বলিয়াছেন, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেষণ, ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গমে পিঙ্গলনাড়ী সিদ্ধদায়িকা হইয়া থাকে।

সুষুম্নার শ্বাসফল

—※—

উভয় নাসিকায় নিঃশ্বাস বহনকালে কোন প্রকার শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। করিলে তৎসমস্ত নিষ্ফল হইবে । সে সময় যোগাভ্যাস ও ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা কেবল ভগবানকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সুষুম্নানাড়ী বহন সময়ে কাহাকেও শাপ বা বর প্রদান করিলে তাহা সফল হইয়া থাকে।

শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞানানুসারে তিথি-নক্ষত্রানুযায়ী যথাযথ নিয়মে ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলে, কোন কার্য্যে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না; কিন্তু তৎসমস্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। বুদ্ধিমান পাঠক এই সংক্ষিপ্ত অংশ পড়িয়া যথাযথভাবে কার্য্য করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই সফল-মনোরথ হইবে।

রোগোৎপত্তির পূর্ব্বজ্ঞান ও প্রতিকার

—※—

পূর্ব্বে বলিয়াছি শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া সূর্য্যোদয় সময় প্রথমে বাম নাসিকায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া সূর্য্যোদয়কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু—

প্রতিপত্তো দিনাণ্যাহুর্বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥

প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে যদি নিঃশ্বাসবায়ু নির্দ্দিষ্ট মতের বিপরীতভাবে উদিত হয়, তবে অমঙ্গল ঘটনা হইবে সন্দেহ নাই। যথা—

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গকালে সূর্য্যোদয় সময় প্রথমে যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে পূর্ণিমা মধ্যে গরমজনিত কোন পীড়া হইবে; আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত আরম্ভ হইলে, সেইদিন হইতে অমাবস্যার মধ্যে শ্লেষ্মাঘটিত বা ঠাণ্ডাজনিত কোন পীড়া হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

দুই পক্ষ ঐরূপ বিপরীতভাবে নিঃশ্বাসবায়ু উদয় হইলে আত্মীয়-স্বজন কাহারও গুরুতর পীড়া কিম্বা মৃত্যু অথবা কোন প্রকার বিপত্তি হইবে। তিন পক্ষ উপর্য্যুপরি ঐরূপ হইলে নিজের নিশ্চিত মৃত্যু হইবে।

শুক্ল কিম্বা কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ দিন প্রভাতে যদি ঐরূপ বিপরীত নিঃশ্বাস বহন বুঝিতে পার, তবে সেই নাসিকা কয়েকদিন বন্ধ রাখিলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এমন ভাবে সে নাসিকা বন্ধ রাখিতে হইবে, যেন সেই নাসাপুট দিয়া নিঃশ্বাস প্রবাহিত না হয়। এইরূপ কয়েক দিন দিবারাত্রি নিয়ত (স্নানাহারের সময় ব্যতীত) বন্ধ রাখিলে ঐ তিথির মধ্যে একেবারেই কোন রোগ ভোগ করিতে হইবে না।

যদি অসাবধানতা বশতঃ নিঃশ্বাসের ব্যতিক্রমে কোন পীড়া জন্মে, তবে যে পর্য্যন্ত রোগ আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষে দক্ষিণ এবং কৃষ্ণ পক্ষে বাম নাসিকায় যাহাতে শ্বাস বহন না হয়, এরূপ করিলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইবে। গুরুতর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অতি সামান্য ভাবে হইবে, আর হইলে স্বল্প-দিন মধ্যে আরোগ্য হইবে। এরূপ করিলে রোগজনিত কষ্ট ভোগ করিতে ও চিকিৎসককে অর্থ দিতে হইবে না।

নাসিকা বন্ধ করিবার নিয়ম

নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় সেই পরিমাণ পুরাতন পরিষ্কার তুলা পুঁটুলি মত করিয়া, পরিষ্কৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা মুড়িয়া মুখ শেলাই করিয়া দিবে। ঐ পুঁটুলি দ্বারা নাসাছিদ্রমুখ এরূপে রুদ্ধ করিয়া দিবে, যেন সেই নাসিকা দিয়া কিছুমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য না হইতে পারে। যাহাদের কোনরূপ শিরোরোগ আছে কিম্বা মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, তাহারা তুলা দ্বারা নাসারন্ধ্র রোধ না করিয়া, পরিষ্কার সূক্ষ্ম ন্যাকড়ার পুঁটুলি দ্বারা নাসিকা বন্ধ করিবে।

যে কোন কারণে যতক্ষণ বা যতদিন নাসিকা বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন হইবে, ততক্ষণ বা ততদিন অধিক শ্রমজনক কার্য্য, ধূমপান, চীৎকারশব্দ দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য নহে। বঙ্গীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে যাহারা আমার ন্যায় তাম্রকূটের সুরসাল ধূমপানের সুমধুরাস্বাদে রসনাকে বঞ্চিত করিতে রাজী নহে, তাহারা যখন তামাক খাইবে, তখন নাকের পুঁটুলি খুলিয়া রাখিবে। তামাক খাওয়া হইলে নাসারন্ধ্র বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া পূর্ব্ববৎ পুঁটুলি দিয়া নাসাছিদ্র বন্ধ করিবে। যখন যে কোন কারণে নাসিকা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখনই এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিতে উপেক্ষা করিও না। যেন নূতন বা অপরিষ্কৃত খানিকটা তুলা নাসাছিদ্রে গুঁজিয়া দেওয়া না হয়।

নিঃশ্বাস পরিবর্ত্তনের কৌশল

—:*:—

কার্য্যভেদে ও অন্যান্য নানা কারণে এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কখন কার্য্যানুযায়ী নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইবে বলিয়া বসিয়া থাকা কাহারই সম্ভবে না। স্বেচ্ছানুসারে শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য ক্রিয়া অতি সহজ, সামান্য চেষ্টায় শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। যথা—

যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিপরীত নাসিকা বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে; পরে সেই নাসিকা চাপিয়া ধরিয়া বিপরীত নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে; পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই পার্শ্বে শয়ন করিয়া ঐরূপ করিলে অতি অল্প সময়ে শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নাসিকায় প্রবাহিত করা যায়। ঐরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া যে নাসাপুটে শ্বাস বহিতেছে, কেবল সেই পার্শ্বে কিছু সময় শয়ন করিয়া থাকিলেও শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

পাঠক! এই গ্রন্থে যে যে স্থানে নিঃশ্বাস পরিবর্ত্তনের নিয়ম লিখিত হইবে, সেখানে এই কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তন করিবে। যে স্বেচ্ছানুসারে এই বায়ু রোধ ও রেচন করিতে পারে, সেই পবনকে জয় করিয়া থাকে।

বশীকরণ

আধুনিক অনেক ব্যক্তিকে বশীকরণ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। অনেকে সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে অগ্রে ঐ প্রার্থনা করিয়া থাকে। বশীকরণ-বিদ্যা তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে যেরূপ উক্ত আছে, তদনুসারে যথাযথ কার্য্য সম্পন্ন করা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। বশীকরণ প্রকরণে নিঃশ্বাসের মত সহজ ও অব্যর্থ ফলদায়ক আর কিছু নাই। পাঠকগণের অবগতির জন্য দু'একটী ক্রিয়া লিখিত হইল।

চন্দ্রং সূর্য্যেণ চাকৃষ্য স্থাপয়েজ্জীবমণ্ডলে।
আজন্মবশগা বামা কথিতোঽয়ং তপোধনৈঃ॥

সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা) দ্বারা চন্দ্রনাড়ীকে (ইড়াকে) আকর্ষণপূর্ব্বক হৃদয়স্থ বায়ুর সহিত সংস্থাপন করিয়া যে বামাকে ভাবনা করিবে, সেই রমণী আজীবন সাধকের বশীভূত থাকিবে।

জীবেন গৃহ্যতে জীবো জীবো জীবস্য দীয়তে।
জীবস্থানে গতো জীবো বালাজীবনান্তবশ্যকৃৎ॥

প্রথমে পূরক, পরে রেচক, তদনন্তর কুম্ভক পুরঃসর যে বামাকে চিন্তা করিবে, সে জীবনাবধি বশীভূত থাকিবে।

রাত্রৌ চ যামবেলায়াং প্রসুপ্তে কামিনীজনে।
ব্রহ্মবীজং পিবেদ্ যস্তু বালাজীবহরো নরঃ॥

প্রহরেক নিশাযোগে কুলকুণ্ডলিনী দেবীর নিদ্রাকালে ব্রহ্মবীজ অর্থাৎ শ্বাসবায়ু পান করিয়া তাহার বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধক যে

নায়িকাকে ভাবনা করিবে, সেই নায়িকা আজীবন তাহার বশীভূত থাকিবে।

উভয়োঃ কুম্ভকং কৃত্বা মুখে শ্বাসো নিপীয়তে।
নিশ্চলা চ যদা নাড়ী দেবকন্যাবশং কুরু॥

কুম্ভক পূর্ব্বক মুখ দ্বারা নিঃশ্বাস বায়ু পান করিবে, এইরূপ করিতে করিতে যখন নিঃশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া থাকিবে, তখন যাহাকে ভাবনা করিবে, সেই বশীভূত হইবে। এই প্রক্রিয়ায় দেবকন্যাকে পর্য্যন্ত সাধক বশীভূত করিতে পারিবে।

বশীকরণ-প্রকরণে অনেক অব্যর্থ ফলপ্রদ ক্রিয়া লিখিত আছে; কিন্তু তৎসমস্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ করি না। পশু-প্রকৃতির মনুষ্য স্বীয় পাশববৃত্তি চরিতার্থ মানসে ইহা প্রয়োগ করিতে পারে। যে কামরিপুর উত্তেজনায় শিবোক্ত শাস্ত্রবাক্যের অপব্যবহার করে, তাহার তুল্য নারকী ত্রিজগতে নাই। অনেকে পুস্তকদৃষ্টে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসী হয়; কিন্তু রীতিমত অনুষ্ঠানের ত্রুটীতে যে ফল হয় না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।*

বশীকরণ কার্য্যে মেষচর্ম্মের আসন, কামদা নামক অগ্নি, মধু, ঘৃত ও খৈ দ্বারা হোম, পূর্ব্বমুখে বসিয়া জপ, প্রবাল, হীরক বা মণির মালায় অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা চালনা করিতে হয়; বায়ুতত্ত্বের উদয়ে, দিবসের পূর্ব্বভাগে, মেষ, কন্যা, ধনু বা মীন লগ্নে উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা নক্ষত্রে; বৃহস্পতি বা সোমবারযুক্ত অষ্টমী, নবমী বা দশমী তিথিতে এবং বসন্তকালে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এই

* তন্ত্রোক্ত অধিকার ও কার্য্যানুষ্ঠানগুলি মৎপ্রণীত "তান্ত্রিক গুরু" পুস্তকে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে। অনধিকারী কেবলমাত্র কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ফল পাইবে কিরূপে?

কার্য্যে "বাণী" দেবতা এবং কলিতে মন্ত্রসংখ্যা চতুর্গুণ জপ করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে কাজ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফললাভ করিতে পারিবে। স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে যাইলে সুফল আশা দুরাশা মাত্র। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ক্রিয়া করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিও; কিন্তু সাবধান!—কেহ যেন পাপানুসন্ধিৎসু হইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরকালের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিও না।

বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য

অনিয়মিত ক্রিয়া দ্বারা যেমন মানবদেহে রোগোৎপত্তি হয়, তেমনি ঔষধ ব্যবহার না করিয়াও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা রোগ নিরাময়ের উপায় নির্দ্ধারিত আছে। আমরা সেই ভগবৎ-প্রদত্ত সহজ কৌশল জানি না বলিয়া দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ ও অনর্থক চিকিৎসককে অর্থ দিয়া থাকি। আমি দেশ পর্য্যটন কালে সিদ্ধযোগি-মহাত্মগণের নিকট বিনা ঔষধে রোগ-শান্তির সুকৌশল শিক্ষা করি; পরে বহু পরীক্ষায় তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া সাধারণের উপকারার্থে তাহার মধ্য হইতে কতিপয় অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ পশ্চাল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবে। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ, অর্থব্যয় কিম্বা ঔষধ দ্বারা উদর বোঝাই করিতে হইবে না। এই স্বরশাস্ত্রোক্ত কৌশলে একবার আরোগ্য হইলে, সে রোগের আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা নাই। পাঠকগণকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

জ্বর—

জ্বর আক্রমণ করিলে কিম্বা আক্রমণের উপক্রম বুঝিতে পারিলে, তখন যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে। যে পর্য্যন্ত জ্বর আরোগ্য ও শরীরসুস্থ না হয়, তাবৎ ঐ নাসিকা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। দশ পনর দিন ভুগিবার মত জ্বর পাঁচ সাত দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। আর জ্বরকালে মনে মনে সর্ব্বদা রূপার ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধ্যান করিলে শীঘ্র ফল লাভ হয়।

নিসিন্দার মূল রোগীর হাতে বাঁধিলে সর্ব্ববিধ জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পালাজ্বর—

শ্বেত অপরাজিতা কিম্বা বকফুলের কতকগুলি পাতা হাতে রগ্‌ড়াইয়া কাপড় দিয়া মুড়িয়া পুটলি করিয়া, জ্বরের পালার দিন ভোর বেলা হইতে ঘ্রাণ লইলে পালাজ্বর বন্ধ হইবে।

মাথাধরা—

মাথা ধরিলে দুই হাতের কনুইয়ের উপর কাপড়ের পা'ড় বা দড়ি দ্বারা কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পাঁচ সাত মিনিটে মাথাধরা আরোগ্য হইবে। এরূপ জোরে বাঁধিতে হইবে যেন রোগী হাতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে। যন্ত্রণা আরোগ্য হইলে বাঁধন খুলিয়া দিবে।

আর একরূপ মাথাধরা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ আধ্‌কপালে মাথাধরা বলে। কপালের মধ্যস্থান হইতে বাম বা দক্ষিণ দিকের অর্দ্ধেক কপাল ও মস্তকে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হয়। প্রায়ই এই পীড়া সূর্য্যোদয় কালে আরম্ভ হইয়া, বেলা যত বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রণাও তত বাড়িতে থাকে; অপরাহ্নে কমিয়া যায়। এই রোগে আক্রমণ করিলে যে পার্শ্বের কপালে যন্ত্রণা হইবে, সেই পার্শ্বের হাতে কনুয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জোরে

বাঁধিয়া রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে যন্ত্রণা উপশম ও রোগ শান্তি হইবে। পরের দিন যদি আবার মাথা ধরে এবং প্রত্যহ একই নাসিকায় নিঃশ্বাস বহন কালে মাথাধরা আরম্ভ হয়, তবে মাথাধরা বুঝিতে পারিলেই সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে এবং পূর্ব্বমত হাত বাঁধিয়া দিবামাত্র আরাম হইবে। আধ কপালে মাথাধরায় এই ক্রিয়া করিলে আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শিরঃপীড়া—

শিরঃপীড়াগ্রস্ত রোগী ভোরে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসাপুট দিয়া শীতল জল পান করিবে ; ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে, মাথা ধরিবে না বা সর্দ্দি লাগিবে না। এই ক্রিয়া বিশেষ কঠিনও নহে। একটী পাত্রে শীতল জল রাখিয়া তাহার মধ্যে নাসিকা ডুবাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গলার ভিতর জল টানিতে হয়। অভ্যাসে ক্রমশঃ সহজ হইয়া যায়। এই পীড়া হইলে চিকিৎসক রোগীর আরোগ্য-আশা পরিত্যাগ করে : রোগীও বিষম কষ্ট পাইয়া থাকে ; কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভ করিবে।

উদরাময়, অজীর্ণাদি—

অন্ন, জলখাবার প্রভৃতি যখন যাহা আহার করিবে, তাহা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহনকালে করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহই এই নিয়মে আহার করিলে অতি সহজে জীর্ণ হয়, কখনও অজীর্ণ রোগ জন্মিবে না। যাহারা এই রোগে কষ্ট পাইতেছে, তাহারাও প্রত্যহ এই নিয়মে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইবে এবং ক্রমে রোগও আরাম হইবে। আহারান্তে কিছু সময় বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। যাহাদের সময় অল্প, তাহারাও আহারান্তে যাহাতে দশ পনর মিনিট দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তুলা দ্বারা বাম

নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে। গুরু ভোজন হইলেও এই নিয়মে শীঘ্র জীর্ণ হয়।

স্থিরভাবে বসিয়া একদৃষ্টে নাভিমণ্ডলে দৃষ্টিপূর্ব্বক নাভিকন্দ ধ্যান করিলে এক সপ্তাহে উদরাময় আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বাসরোধ পূর্ব্বক নাভি আকর্ষণ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ একশত বার মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিলে, আমাদি উদরাময় সঞ্জাত সকল পীড়া আরোগ্য হয় এবং জঠরাগ্নি ও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

প্লীহা—

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া এবং প্রাতে শয্যাত্যাগের সময় হস্ত ও পদ সঙ্কোচ করিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর এপার্শ্বে ওপার্শ্বে আড়ামোড়া ফিরিয়া সর্ব্বশরীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিতে থাকিবে। প্রত্যহ চারি পাঁচ মিনিট ঐরূপ করিলে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য হইবে। চিরদিন এইরূপ অভ্যাস থাকিলে প্লীহা যকৃৎ রোগের জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

দন্তরোগ

প্রত্যহ যতবার মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, ততবার দুই পাটী দাঁত একত্র করিয়া একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। যতক্ষণ মল কিম্বা মূত্র নিঃসরণ হয়, ততক্ষণ দাঁতে দাঁতে চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দুই চারি দিন এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে শিথিল দন্তমূল দৃঢ় হইবে। চিরদিন এইরূপ অভ্যাস রাখিলে, দন্তমূল দৃঢ় ও দীর্ঘকাল কার্য্যক্ষম থাকে এবং দন্তের কোনরূপ পীড়া হইবার ভয় থাকে না।

ফিক্‌বেদনা—

বুকে, পিঠে বা পার্শ্বে—যে কোন স্থানে ফিক্‌বেদনা বা অন্য কোন প্রকার বেদনা হইলে, যেমন বেদনা বুঝিতে পারিবে, অমনি কোন্ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিও, তাহা হইলে দুই চারি মিনিটে নিশ্চয়ই বেদনা আরোগ্য হইবে।

হাঁপানি—

যখন হাঁপানি বা শ্বাস প্রবল হইবে, তখন যে নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া অন্য নাসিকায় নিঃশ্বাসের গতি প্রবর্ত্তিত করিবে; তাহা হইলে দশ পনের মিনিটে টান কমিয়া যাইবে। প্রতিদিন এইরূপ করিলে একমাস মধ্যে পীড়া শান্তি হইবে। দিবসের মধ্যে যত অধিক সময় ঐ ক্রিয়া করিবে তত শীঘ্র ঐ রোগ আরোগ্য হইবে। হাঁপানির মত কষ্টদায়ক পীড়া নাই, হাঁপানি বৃদ্ধির সময় এই নিয়ম পালন করিলে, কোনরূপ ঔষধ না পান করিয়াও আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইবে।

বাত—

প্রত্যেক দিন আহারান্তে চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচ্ড়াইবে। এরূপভাবে চিরুণী চালনা করিবে যেন মস্তকে চিরুণীর কাঁটা স্পর্শ হয়। তৎপরে বীরাসনে অর্থাৎ দুই পা পশ্চাৎ দিকে মুড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া পনের মিনিট বসিয়া থাকিবে। প্রত্যহ দুই বেলা আহারের পর ঐরূপ বসিয়া থাকিলে যতদিনের বাত হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ঐরূপভাবে বসিয়া পান তামাক খাইতেও ক্ষতি নাই। সুস্থ ব্যক্তি ঐ নিয়ম পালন করিলে বাতরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না; বলা বাহুল্য, রবারের চিরুণী ব্যবহার করিও না।

চক্ষুরোগ—

প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে মুখের ভিতর যত জল ধরে, তত জল রাখিয়া, অন্য জল দ্বারা চক্ষুতে বিশবার ঝাপ্টা দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

প্রত্যেক দিন দুই বেলা আহারান্তে আচমন সময় অন্ততঃ সাতবার চক্ষুতে জলের ঝাপটা দিবে।

যতবার মুখে জল দিবে, ততবার চক্ষু ও কপাল ধুইতে ভুলিবে না।

প্রত্যহ স্নানকালীন তৈল-মর্দ্দনের সময় অগ্রে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে তৈল মাখিবে।

এই কয়েকটী নিয়ম চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতে দৃষ্টিশক্তি সতেজ ও চক্ষু স্নিগ্ধ থাকে এবং চক্ষুর কোন পীড়া হইবারি সম্ভাবনা থাকে না। চক্ষু মনুষ্যের পরম ধন; অতএব প্রত্যহ নিয়ম পালন করিতে কেহ ঔদাস্য করিও না।

বর্ষফল নির্ণয়

চৈত্রমাসীয় শুক্লাপ্রতিপদ তিথির দিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হইবার সময়ে এবং দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ প্রারম্ভে বিচক্ষণ ব্যক্তি-গণ তত্ত্বসাধনের ভেদাভেদ নিরূপণ ও নিরীক্ষণ করিবে। যদি ঐ সময়ে চন্দ্র নাড়ী প্রবাহিত হয় এবং পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব কিম্বা বায়ুতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে বসুমতী সর্ব্বশস্যশালিনী হইয়া দেশে সুভিক্ষ উপস্থিত হইবে। আর যদি অগ্নিতত্ত্বের কি আকাশতত্ত্বের উদয় পরিলক্ষিত হয়, তবে পৃথিবীতে বিষম ভয় ও ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে যদি সুষুম্না নাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্য পণ্ড, পৃথিবীতে রাষ্ট্রবিপ্লব, মহারোগ ও কষ্ট যন্ত্রণাদি উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেষ-সংক্রমণ দিনে অর্থাৎ মহাবিষুব-সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে যদি পৃথিবী-তত্ত্বেরউদয় হয়, তাহা হইলে অতিবৃষ্টি, রাজ্যবৃদ্ধি, সুভিক্ষ, সুখ

সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং পৃথিবী বহুশস্যশালিনী হয়। জলতত্ত্বের উদয়েও ঐরূপ ফল জানিবে। যদি অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তবে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, অল্পবৃষ্টি এবং দারুণ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ুতত্ত্বের উদয় হইলে উৎপাত, উপদ্রব, ভয়, অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়, আর আকাশতত্ত্বের উদয়ে মানবের উদ্গার, সন্তাপ, জ্বর ও ভয় এবং পৃথিবীতে শস্যহানি হইয়া থাকে।

পূর্ণে প্রবেশনে শ্বাসে স্ব-স্ব-তত্ত্বেন সিদ্ধিদঃ।

—স্বরোদয় শাস্ত্র

মেষ সংক্রান্তি কালে যখন যেদিকেই নাসাপুট বায়ুপূর্ণ থাকে অথবা নিঃশ্বাস-বায়ু প্রবেশ করে, সেই সময়ে যদি সেই সেই নাসিকায় নির্দ্দিষ্ট মত তত্ত্ব সকলের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরের ফল শুভজনক হইয়া থাকে। অথন্যথায় অশুভ জানিবে।

যাত্রা-প্রকরণ

কোনস্থানে কোন কার্য্যোপলক্ষে যখন যাত্রা করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যেদিকের নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বামাচারপ্রবাহেন ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব উত্তরে।
দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্যপশ্চিমে॥

—পবন-বিজয়-স্বরোদয়

যখন বাম নাসিকায় শ্বাস চলিতে থাকিবে, তখন পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে গমন করিবে না এবং যখন দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাত্রা করিবে না। ঐ সকল দিকে ঐ ঐ সময়ে যাত্রা করিলে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, এমন কি যাত্রাকারীর আর গৃহে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

যদি সম্পদ-কার্য্যের জন্য যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে 'ইড়া' নাড়ীর বহন কালে গমন করিলে শুভফল লাভ করিতে পারিবে। আর যদি কোন রূপ বিষম অর্থাৎ ক্রূর কর্ম্ম সাধনের জন্য গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যখন পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহিত হইবে, সেই সময় যাত্রা করিলে সিদ্ধি-লাভ হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি শুক্র ও শনিবারে কোন স্থানে গমন করিলে মৃত্তিকাতে সাতবার, আর অন্য যে কোন বারে যাত্রা করিতে হইলে একা-দশবার ভূতলে পাদ প্রক্ষেপ করতঃ যাত্রা করিবে, কিন্তু বৃহস্পতিবারে কোন কার্য্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে অর্দ্ধপদ মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া যাত্রা করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারা যায়। কোন কার্য্যোদ্দেশ্যে যদি শীঘ্র গমন করিবার আবশ্যক হয়, কুশল কার্য্যেই হউক, শত্রুসহ কলহেই হউক, কি কোন ক্ষতি নিবারণার্থেই হউক, যাত্রা করিতে হইলে তৎকালে যেদিকের নাসিকায় নিঃশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই দিকের অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে হইবে, পরে সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া সে সময়ে চন্দ্র নাড়ী বহিতে থাকিলে চারিবার এবং সূর্য্য নাড়ী বহিতে থাকিলে পাঁচবার মৃত্তিকাতে পদনিক্ষেপ করিয়া গমন করিবে। এইরূপ নিয়মে যাত্রা করিলে তাহার সহিত কাহারও কলহ হয় না এবং তাহার কোন হানিও হয় না; এমন কি তাহার পায়ে একটী কণ্টকও বিদ্ধ হয় না। সে ব্যক্তি সর্ব্ব আপদ-বিপদ-বিবর্জ্জিত হইয়া সুখে, স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারে, শিববাক্যে সন্দেহ নাই।

কোন কোন স্বরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন, দূরদেশে যাত্রা করিতে হইলে চন্দ্র নাড়ীই মঙ্গলজনক এবং নিকটস্থ স্থানে গমন করিতে হইলে সূর্য্যনাড়ীই কল্যাণকর। সূর্য্যনাড়ী দক্ষিণ নাসায় প্রবেশ কালে যাত্রা করিতে পারিলে শীঘ্রই কার্য্যোদ্ধার হইয়া থাকে।

আক্রম্য প্রাণপবনং সমারোহেত্ত বাহনম্।
সমুত্তরেৎ পদং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

কোনরূপ যানারোহণ করিয়া কোন কার্য্যে গমন করিতে হইলে, প্রাণ-বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া গমন করিবে, তৎকালে যে দিকের নাসায় শ্বাস বহন হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যানারোহণ করিবে; তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু বায়ু, অগ্নি বা আকাশতত্ত্বের উদয়ে গমন করিবে না। স্বর-জ্ঞানানুসারে যাত্রা করিলে, শুভযোগের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না।

গর্ভাধান

—*—

ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শদিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণের কাল। ঋতু-স্নাতা স্ত্রী সূর্য্য-চন্দ্র সংযোগে পৃথিবীতত্ত্ব কি জলতত্ত্বের উদয়কালে শঙ্খবল্লী ও গোরক্ষ পান করতঃ স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া স্বামীর নিকট পুত্র-কামনা করিবে। সূর্য্য নাড়ী ও চন্দ্রনাড়ীকে একত্র সংযুক্ত করতঃ ঋতু রক্ষা করিলে পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয় না। চন্দ্র-সূর্য্য সংযোগ অর্থাৎ

রাত্রিকালে যখন পুরুষের সূর্য্যনাড়ী বহিবে, তখন যদি স্ত্রীর চন্দ্রনাড়ী বহে, তবে সেই সময়ে উভয়ে সঙ্গত হইবে।

বিষমাঙ্কে দিবারাত্রৌ বিষমাঙ্কে দিনাধিপঃ।
চন্দ্রনেত্রাগ্নিতত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

কি দিবা, কি রাত্রিতে যদি সুষুম্নানাড়ী বহিতে থাকে, অথবা সূর্য্যনাড়ী বহে, আর সেইকালে যদি অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, সেই সময় ঋতুরক্ষা হইলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হইবে। যখন সুষুম্নানাড়ী দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত হয়, সেই সময় ঋতুরক্ষা করিলে পুত্র জন্মিবে, কিন্তু হীনাঙ্গ ও কৃশ হইবে। স্ত্রী-পুরুষের একই নাসায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত থাকিলে, গর্ভ হইবে না। জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি হইবে, সে ধনী, সুখী ও ভোগী হইবে এবং তাহার যশঃকীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপিনী হইবে। পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে সন্তান অতি ধনী, সুখী ও সৌভাগ্যশালী হইবে। পৃথিবী-তত্ত্বের উদয়ে গর্ভ হইলে পুত্র এবং জল-তত্ত্বের উদয়ে গর্ভ হইলে কন্যা জন্মিয়া থাকে। অগ্নি, বায়ু ও আকাশ-তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে গর্ভপাত হইবে, অথবা সেই গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র বিনষ্ট হইবে।

কার্য্য সিদ্ধি করণ

— * —

কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য কাহারও নিকট গমন করিতে হইলে, যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইতেছে, সেই দিকের পা অগ্রে বাড়াইয়া গমন

করিবে। কিন্তু বায়ু, অগ্নি কিম্বা আকাশ-তত্ত্বের উদয়ে যাত্রা করিবে না। তদনন্তর গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, যাহার নিকট হইতে কার্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে, তাহাকে সেই দিকে রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। চাকুরি প্রভৃতির উমেদারী করিতে যাইয়া এই নিয়মে কার্য্য করিলে সুফল লাভ করিতে পারিবে।

মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে উপরোক্ত নিয়মে বিচারকের নিকট এজ্বাহারাদি প্রদান করিলে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারা যায়।

প্রভু বা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত যখনই কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে নাসিকায় নিঃশ্বাস বায়ু প্রবাহিত থাকিবে, তাহাদের সেই পার্শ্বে রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে, তাহা হইলে মনিবের প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। দাসত্ব-উপজীবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা কম সুবিধার বিষয় নহে। তাহাদের সযত্নে এই ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

যে দিকের নাসিকায় নিঃশ্বাস বায়ু বহিতে থাকে, সেই দিক আশ্রয় পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করিবে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু—

শত্রু বশীকরণ

কার্য্যে তদ্বিপরীত ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ যে নাসিকায় নিঃশ্বাস বায়ু বহিতে থাকিবে, শত্রুকে তাহার বিপরীত পার্শ্বে রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে, তাহা হইলে ঘোর শত্রুও তোমার অনুকূলে কার্য্য করিবে।

উভয়োঃ কুম্ভকং কৃত্বা মুখে শ্বাসো নিপীয়তে।
নিশ্চলা চ যদা নাড়ী ঘোরশত্রুবশং কুরু ॥

—পবন-বিজয় স্বরোদয়

কুম্ভক পূর্ব্বক মুখ দ্বারা নিঃশ্বাস বায়ু পান করিবে, এইরূপ করিতে করিতে যখন নিঃশ্বাস বায়ু স্থির হইয়া থাকিবে, তখন শত্রুকে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ ঘোর শত্রুও তাহার বশীভূত হইয়া থাকিবে। চন্দ্রনাড়ী বহন সময়ে বামদিকে, সূর্য্যনাড়ী বহিবার কালে দক্ষিণ দিকে এবং সুষুম্না চলিবার কালে মধ্যভাগে থাকিয়া কার্য্য করিলে বিবাদে জয় লাভ করিতে পারা যায়।

যত্র নাড্যাং বহেদ্বায়ুস্তদন্তঃ প্রাণমেব চ।
আকৃষ্য গচ্ছেৎ কর্ণান্তং জয়ত্যেব পুরন্দরম্ ॥

—যোগ-স্বরোদয়

যে নাড়ীতে বায়ু বহন হয়, তন্মধ্যস্থিত প্রাণবায়ুকে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের চরণ অগ্রে ক্ষেপণপুরঃসর গমন করিলে শত্রুকে পরাভব করিতে পারিবে।

অগ্নি নির্ব্বাপণের কৌশল

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর আগুণ লাগিয়া অনেকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। নিম্নলিখিত উপায়টী জানা থাকিলে অতি সহজে ও অত্যাশ্চর্য্যরূপে অগ্নি নির্ব্বাপিত করা যায়।

আগুণ লাগিলে যে দিকে তাহার গতি, সেই দিকে দাঁড়াইয়া যে নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাসিকা দ্বারাই জল পান করিবে। একটী ছোট ঘটিতে করিয়া যাহার তাহার দ্বারা আনীত জলে ঐ কার্য্য হইতে পারে। তদনন্তর সপ্ত রতি জল

"উত্তরাস্যাঞ্চ দিগ্‌ভাগে মারীচো নাম রাক্ষসঃ।
তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতো বহ্নিঃ স্তম্ভ স্বাহা ॥"

এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। এই কার্য্যটী না করিয়া কেবল মাত্র উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সুফল লাভ করিতে পারিবে। আমরা বহুবার ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছি; অনেকের ধন-সম্পত্তিও রক্ষা হইয়াছে।

রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল

যথানিয়মে প্রত্যহ শীতলীকুম্ভক করিলে কিছুদিনে শরীরের রক্ত পরিষ্কার ও শরীর জ্যোতির্বিশিষ্ট হয়। শীতলীকুম্ভকের নিয়ম—

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ।
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা

জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ ঠোঁট দুখানি সরু করিয়া বাহিরের বাতাস ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপন আপন

দম্‌ভোর বায়ু টানিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ঢোক গিলিবার মত করিয়া বায়ুকে উদরে চালনা কর ; পরে ক্ষণকাল ঐ বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা ধারণ করিয়া উভয় নাসা দ্বারা রেচন করিবে। এইরূপ নিয়মে বারম্বার বায়ু টানিলে কিছুদিন পরে রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর কন্দর্পসদৃশ কান্তি-বিশিষ্ট হইবে। শীতলীকুম্ভক করিলে অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মিতে পারে না। চর্ম্ম-রোগ প্রভৃতি রোগে রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবহার না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে এই ক্রিয়া করিয়া দেখিবে, সালসা অপেক্ষা শীঘ্র স্থায়ী সুফল লাভ করিতে পারিবে।

প্রত্যহ দিবা-রাত্রের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারি বার পাঁচ সাত মিনিট স্থিরভাবে বসিয়া ঐরূপে মুখ দিয়া বায়ু টানিতে ও নাসিকা দ্বারা ছাড়িতে হইবে। ফলে যত বেশী বার ঐরূপ করিতে পারিবে, তত শীঘ্র সুফল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

ময়লা, আবর্জ্জনাদিপূর্ণ বায়ুদূষিত স্থানে, বৃক্ষতলে, কেরোসিন তৈল দ্বারা আলো-জ্বালিত গৃহে ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে এই ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। বায়ু রেচনান্তে হাঁপাইতে না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্থানে স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে রেচক ও পূরকের কার্য্য করিবে।

ঐ প্রক্রিয়ায় দুর্জ্জয় শূলবেদনা এবং বুক, পেট প্রভৃতিতে যে কোন আভ্যন্তরীণ বেদনা থাকিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

কয়েকটী আশ্চর্য্য সঙ্কেত

—:*:—

১। জ্বর হউক, কিম্বা কোন প্রকার বেদনা, কি স্ফোটক, ব্রণাদি যাহাই হউক, কোনরূপ পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে পা রলে তখন যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিকা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিবে। যতক্ষণ বা যতদিন শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন সেই নাক বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শীঘ্র শরীর সুস্থ হইবে, বেশীদিন ভুগিতে হইবে না।

২। রাস্তা চলিয়া বা কোন প্রকার পরিশ্রমজনক কার্য্যান্তে শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত হইলে অথবা তজ্জনিত ধাতু গরম হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিবে; তাহা হইলে অচিরে—অতি অল্প সময়ে শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইয়া শরীর সুস্থ হইবে।

৩। প্রত্যহ আহারান্তে আচমন করিয়া চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়াইবে। চিরুণী এমন ভাবে চালাইবে যে, তাহার কাঁটা মস্তক স্পর্শ করে। ইহাতে শিরঃপীড়া ও ঊর্দ্ধগ সম্বন্ধীয় কোন পীড়া এবং বাতব্যাধি জন্মিবার ভয় থাকিবে না। ঐরূপ কোন পীড়া থাকিলেও তাহা বৃদ্ধি হইবে না; বরঞ্চ ক্রমে আরোগ্য হইবে। শীঘ্র চুল পাকিবে না।

৪। প্রখর রৌদ্রের সময় কোন স্থানে যাইতে হইলে, রুমাল বা চাদর তোয়ালে প্রভৃতির দ্বারা কর্ণ দুইটা আচ্ছাদন করিয়া, রৌদ্রমধ্যে হাঁটিলে রৌদ্রজনিত কোন দোষ শরীর স্পর্শ করিবে না এবং রৌদ্রতাপে শরীর তাপিত বা ক্লিষ্ট হইবে না। কর্ণ দুইটা এরূপে আচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য যে, সমস্ত কাণ ঢাকা পড়ে এবং কাণে বাতাস না লাগে।

৫। স্মরণশক্তি হ্রাস হইলে, মস্তকের উপর একখানি কাষ্ঠকীলক

রাখিয়া, তাহার উপর আর একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া, ধীরে ধীরে তাহাতে আঘাত করিবে।

৬। প্রত্যহ অর্দ্ধঘণ্টা পদ্মাসনে বসিয়া দন্তমূলে জিহ্বাগ্র চাপিয়া রাখিলে সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়।

৭। ললাটোপরি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ জ্যোতিধ্যান করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং কুষ্ঠাদি আরোগ্য হয়। সর্ব্বদা দৃষ্টির অগ্রে পীতবর্ণ উজ্জ্বল জ্যোতির্ধ্যান করিলে বিনা ঔষধে সর্ব্বরোগ আরোগ্য ও দেহ বলিপলিবিহীন হয়। মাথা গরম হইলে বা ঘুরিতে থাকিলে মস্তকে শ্বেতবর্ণ বা পূর্ণ শরচ্চন্দ্র ধ্যান করিলে পাঁচ সাত মিনিটে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবে।

৮। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপরে অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য আছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। শরীর উষ্ণ হইলে শীতল বস্তুর এবং শীতল হইলে উষ্ণ বস্তুর ধ্যান করিবে।

৯। প্রত্যহ দুইবেলা স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাভিদেশে একদৃষ্টে চাহিয়া, নাভিতে বায়ু ধারণ ও নাভিকন্দ ধ্যান করিলে অগ্নিমান্দ্য, দুরারোগ্য অজীর্ণ ও উৎকট অতিসার ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উদরাময় নিশ্চয় আরোগ্য এবং পরিপাকশক্তি ও জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

১০। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যে নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইবে, সেই দিকের করতল মুখে সংস্থাপন করিয়া শয্যা হইতে উঠিলে বাঞ্ছাসিদ্ধি হইয়া থাকে।

১১। রক্ত অপামার্গের মূল হস্তে ধারণ করিলে ভূতপ্রেতাদিসম্ভূত সর্ব্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয়।

১২। তেঁতুলের চারা তুলিয়া তাহার মূল গর্ভিণীর সম্মুখস্থ চুলে বাঁধিয়া দিবে, যাহাতে ঐ মূলের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়; তাহা হইলে গর্ভিণী তৎক্ষণাৎ সুখে প্রসব করিবে। প্রসবান্তে চুল সমেত ঐ তেঁতুলমূল

কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিও, নতুবা প্রসূতির নাড়ী পর্য্যন্ত বাহির হইবার সম্ভাবনা। যখন গর্ব্ভিণী প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, সে সময় ব্যস্ত না হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিও। শ্বেত পুনর্ণবার মূল চূর্ণ করিয়া জননেন্দ্রিয়ের ভিতর দিলে গর্ভিণী শীঘ্র সুখে প্রসব করিতে পারে।

১৩। যে দিবাভাগে বাম নাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন রাখে, তাহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না, আলস্য দূরীভূত ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। দশ পনর দিন তূলা দ্বারা ঐরূপ অভ্যাস করিলে, পরে আপনা হইতেই ঐরূপ নিয়মে নিঃশ্বাসের গতি হইবে।

১৪। প্রাতে ও বৈকালে কাগ্‌জি লেবুর পাতার ঘ্রাণ লইলে পুরাতন ও ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আরোগ্য হয়।

১৫। প্রত্যহ একচিত্তে শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণাদির ধ্যান করিলে দেহস্থ সমস্ত বিকার নষ্ট হয়। এই জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হিন্দুর নিত্যধ্যেয়। ব্রাহ্মণগণ নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিলে সর্ব্বরোগ মুক্ত হইয়া সুস্থশরীরে জীবন যাপন করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, অস্মদ্দেশীয় দ্বিজগণের মধ্যে অনেকে সন্ধ্যাদি করিয়া সময়ের অপব্যয় করে না। যাহারা করে, তাহারাও উপযুক্তরূপে সন্ধ্যাদি করিতে জানে না। সন্ধ্যার উদ্দেশ্য কি—এমন কি সন্ধ্যা গায়ত্রীর অর্থাদি পর্য্যন্ত জানে না; প্রাণায়ামাদিও উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। সন্ধ্যার সংস্কৃত বাক্যাবলী আওড়ান্ এই পর্য্যন্ত—নতুবা সন্ধ্যাদি দ্বারা কি করিতেছে, ছাইভস্ম, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে না। আমার বিশ্বাস, ভাব হৃদয়ঙ্গম না হইলে ভক্তি আসিতে পারে না; ঐরূপ সন্ধ্যা করা অপেক্ষা ভক্তিযুত-চিত্তে আপন ভাষায় হৃদয়ের প্রার্থনা ভগবান্‌কে জানাইলে অধিক সুফলের আশা করা যায়। পরমেশ্বর আর তো মহারাষ্ট্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই যে, সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গালা শব্দ বুঝিতে পারিবেন না! সন্ধ্যায় প্রাণায়াম যেরূপ বিধিবদ্ধ আছে,

তাহাতে প্রাণায়াম ক্রিয়া এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ধ্যানে যথাক্রমে লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের চিন্তা—এই দুই মহতী ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার এক একটী ক্রিয়ার কত গুণ তাহা কেহই বুঝে না। আবার ত্রিসন্ধ্যার গায়ত্রীর ধ্যানেও ঐরূপ বর্ণ চিন্তা হইয়া থাকে। আর্য্য-ঋষিগণের সন্ধ্যা-পূজাদির মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না, অথচ নিজে সূক্ষ্ম বুদ্ধির মুন্সিয়ানা চালে ঐ সমস্ত বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি। নিশ্চয় জানিও,—হিন্দু দেবদেবীর নানা মূর্ত্তি ও নানা বর্ণ যাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বৃথা নহে। সকল প্রকার ধর্ম্মসাধন ও তপস্যার মূল সুস্থ শরীর। শরীর সুস্থ না থাকিলে ও দীর্ঘজীবী না হইলে ধর্ম্মসাধন ও অর্থোপার্জ্জনাদি কিছুই হয় না। অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যঋষিগণ শরীর সুস্থ ও পরমার্থ সাধন করিবার সহজ উপায়-স্বরূপ দেবদেবীর নানা বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সন্ধ্যা উপাসনার সময় শ্বেত, রক্ত ও শ্যামাদি বর্ণের ধ্যান করিতে হয়। তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই ত্রিধাতু সাম্য হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। এইজন্য সেকালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ কত অনিয়মে থাকিয়াও সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইতেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে শিরস্থিত শুক্লাব্জে শ্বেতবর্ণ গুরুদেব ও রক্তবর্ণ তৎশক্তির ধ্যান করিবার বিধি আছে; ইহাতে যে শরীর কত সুস্থ থাকে, বিলাতি বাবুগণ তাহা বুঝিবে কি? যাহা হউক, কেহ যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবমূর্ত্তির কিম্বা গুরু ও তৎশক্তির ধ্যান করিয়া পৌত্ত-লিক, জড়োপাসক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধতমসে নিক্ষিপ্ত হইতে রাজী না হও, তবে সভ্যতার অমল ধবল আলোকে থাকিয়া অন্ততঃ শ্বেত, লোহিত ও শ্যামবর্ণ ধ্যান করিলেও আশাতীত ফল পাইবে। বর্ণ ধ্যান করিলে তো আর বর্ণ কাল হইবে না; বরং বিস্কুট-পাঁউরুটী-খাওয়া জীর্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ শরীর সুবর্ণ সদৃশ হইবে। যাহা হউক, আমি সকলকে এই বিষয় পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

১৬। পুরুষের দক্ষিণ নাসায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসায় নিঃশ্বাস বহন-কালে দাম্পত্য-সম্ভোগ-সুখ উপভোগ করিবে। ইহাতে উভয়ের শরীর ভাল থাকিবে, দাম্পত্য-প্রেম বর্দ্ধিত হইবে; প্রণয়িণীও বশীভূতা থাকিবে।

১৭। সম্ভোগান্তে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দম্‌ভোর শীতল জল পান করিলে শরীর সুস্থ হইয়া থাকে।

১৮। প্রত্যহ এক তোলা ঘৃতে আট দশটী গোল মরিচ ভাজিয়া, ঐ ঘৃত পান করিলে রক্ত পরিষ্কার ও দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

চিরযৌবন লাভের উপায়

যৌবন লাভ করিতে—আশা করি, সকলেই আশা করিয়া থাকে। মহাভারতে উক্ত আছে, যযাতি স্বীয় পুত্রকে নিজের জরা অর্পণ করিয়া পুত্রের যৌবন লইয়া সংসারসুখ লুটিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও দেখা যায়, বালকগণ ঘন ঘন বদনে ক্ষুর ঘষিয়া মোচ-দাড়ি তুলিয়া অসময়ে যুবক সাজিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকে, আর বৃদ্ধগণ পাকা চুল-দাড়িতে কলপ চড়াইয়া এবং নীরদন বদন-গহ্বরে ডাক্তার সাহায্যে কৃত্রিম দন্ত বসাইয়া পার্ব্বতীর ছোট ছেলেটীর ন্যায় সাজসজ্জা করতঃ পৌত্রের সহিত ইয়ারকি দিয়া বাই, খেমটা, থিয়েটারের আড্ডায় যুবকের হদ্দমজা লুটিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ইংরেজ নারীগণও যৌবন-জোয়ারে ভাটা ধরিলে প্রাণান্ত পণ করিয়াও যৌবনের অযথা অত্যাচারজনিত মেছেতা, ব্রণাদির কলঙ্ক বিনষ্ট করিবার জন্য বদনের চর্ম্ম উত্তোলন-পূর্ব্বক যৌবন-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত

থাকিতে সাধ করে। স্বরশাস্ত্রানুসারে স্বল্পায়াসে যৌবন রক্ষা করা যায়। যথা—

যখন যে অঙ্গে যে নাড়ীতে শ্বাসবহন হইবে, তখন সেই নাড়ী রোধ করিতে হইবে। যে পুনঃ পুনঃ শ্বাসবায়ুর রোধ ও মোচন করিতে সমর্থ হয়, সে দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন লাভ করিতে পারে। পাকা চুল, ফোক্‌লা দাঁত, শিথিল চামড়ায় যুবক সাজিতে গিয়া বিড়ম্বনা ভোগ না করিয়া, পূর্ব্বে এই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারিলে, আর লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

অনাহত পদ্মের বর্ণনায় বলিয়াছি যে, উক্ত পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে অরুণ বর্ণ সূর্য্যমণ্ডল আছে, সহস্রারস্থিত অমাকলা হইতে যে অমৃত ক্ষরণ হয়, সেই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হয়। এজন্য মানব-দেহে বলি, পলি ও জরা উপস্থিত হয়। যোগিগণ বিপরীতকরণ মুদ্রা অর্থাৎ ঊর্দ্ধপদে হেঁট-মুণ্ডে থাকিয়া কৌশলক্রমে ক্ষরিত অমৃত সূর্য্যমণ্ডলের গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। তাহাতে দেহ বলি, পলি ও জরা রহিত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু—

গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন চ শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ।

অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণ গুরূপদেশ-সাপেক্ষ। বিপরীতকরণ মুদ্রা ব্যতীত খেচরী মুদ্রা দ্বারা সহজে ঐ ক্ষরিত অমৃত রক্ষা করা যায়। খেচরী মুদ্রার নিয়ম যথা—

রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েৎ।
কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে গতা দৃষ্টির্ম্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

ঘেরণ্ডসংহিতা।

জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে তালুমধ্যে প্রবেশ করাইবে। পরে জিহ্বাকে ঊর্দ্ধদিকে উল্টাইয়া কপালকুহরে প্রবিষ্ট করাইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিলে খেচরী মুদ্রা হইবে।

কেহ কেহ তালুমূলে রসনাগ্র স্পর্শ করাইয়া ওস্তাদি করে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!—আসলে কিছু হয় না। ঐরূপে জিহ্বা রাখিয়া কি করিতে হয়, তাহা কেহ জানে না। খেচরী মুদ্রা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র-গলিত সোমধারা পান করিলে অভূতপূর্ব্ব নেশা হয়। মাথা ঘোরে, চক্ষু আপনি অর্দ্ধনিমীলিত ও স্থির থাকে; ক্ষুধা-তৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়। এইরূপে খেচরীমুদ্রা সিদ্ধ হয়। খেচরীমুদ্রাসাধন দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সুধা ক্ষরণ হয়, তাহা সাধকের সর্ব্বশরীর প্লাবিত করে। তাহাতে সাধক দৃঢ়কায়, বলি, পলি ও জরা রহিত, কন্দর্পের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং পরাক্রমশালী হইয়া থাকে। প্রকৃত খেচরীমুদ্রা সাধন করিতে পারিলে সাধক ছয় মাস মধ্যে সর্ব্বব্যাধি-মুক্ত হয়।

খেচরীমুদ্রা সিদ্ধ হইলে নানাবিধ রসাস্বাদ অনুভূত হয়। স্বাদ-বিশেষে পৃথক্ ফল হইয়া থাকে। ক্ষীরের স্বাদ অনুভূত হইলে ব্যাধি নষ্ট হয়। ঘৃতের আস্বাদ পাইলে অমর হয়।

আরও অন্যান্য উপায়ে শরীর বলি, পলি ও জরারহিত করিয়া যৌবন চিরস্থায়ী করা যায়। বাহুল্য ভয়ে সমস্ত উপায় লিখিত হইল না।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়

সংসারে দীর্ঘকাল বাঁচিতে কাহার না ইচ্ছা? কচিৎ কেহ রোগে, শোকে বা অন্যান্য দারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করে, আর যোগিগণ জীবন ও মৃত্যু উভয়ের প্রতি উদাসীন। তদ্ভিন্ন সকলেরই দীর্ঘকাল বাঁচিতে সাধ আছে। কয়জন মনুষ্যকে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়? অকালমৃত্যু এত লোককে প্রত্যহ শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছে যে, জীবনের পূর্ণ সংখ্যা যে কতদিন, তাহা কাহাকেও জানিতে দেয় না। অকাল মৃত্যু কেন হয় এবং তন্নিবারণের উপায় কি? আর্য্যঋষিগণ মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে নিজেই নিজ মৃত্যুর কারণ। অদৃষ্ট বা দৃষ্ট, এই উভয় কারণের মূলই স্বয়ং। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মফল লাভের জন্য দেহ তদুপযোগী হইয়া থাকে। সঙ্কল্প-বিকল্পই জীবের জন্মমৃত্যুর প্রধান কারণ। সুতরাং কর্ম্মফল যতক্ষণ, দেহও ততক্ষণ; যখন কর্ম্মফল থাকিবে না, তখন আর দেহের প্রয়োজন কি? অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেহ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তবে দেহের পরিত্যাগ দুই প্রকারে হয়; এক, কর্ম্ম নিঃশেষিত হইলে, জীব যখন পূর্ণজ্ঞানের সহিত অনায়াসে পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিত দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন তাহাকে মোক্ষ বলা যায়; অপর, যখন জীবের সঞ্চিতকর্ম্ম দেহকে অনুরূপ ভোগের অনুপযুক্ত বোধে, জীবকে অবশ ও অজ্ঞানাবৃত করতঃ বলপূর্ব্বক স্থূলদেহ পরিত্যাগ করায়, তখন তাহাকে মৃত্যু বলা যায়। এইরূপ মৃত্যুকে জ্ঞান অথবা যোগানুষ্ঠানাদি দ্বারা অতিক্রম করা যাইতে পারে। চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার বাসনা, দুরাশা প্রভৃতি হইতে নিবৃত্ত রাখা দীর্ঘজীবন লাভের উপায়। কাম, ক্রোধ, লোভাদি প্রবল রিপুগণ

যাহাতে কোনমতে চিত্তকে পীড়া দিতে না পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে ভক্তি ও নির্ভর করিয়া সন্তোষসুধাপানে রত হইতে পারিলে দীর্ঘজীবন লাভ বিশেষ অসাধ্য বোধ হয় না। দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তাগণ বিশেষ গবেষণাপূর্ণ যুক্তি দ্বারা জীবের জন্ম-মৃত্যুর কারণ এবং দীর্ঘজীবন লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনা, আন্দোলন এখানে নিষ্প্রয়োজন। স্বরশাস্ত্রানুসারে কিরূপে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

মানবশরীরে দিবারাত্র যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, তাহার নাম প্রাণ। শ্বাস বাহির হইয়া পুনঃ দেহে প্রবেশ না করিলেই জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে। নিঃশ্বাসের একটী স্বাভাবিক গতি আছে। যথা—

প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তো নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলম্‌ ॥

—স্বরোদয়

মনুষ্যের নিঃশ্বাস গ্রহণ সময় অর্থাৎ নাসিকার দ্বারা সহজ নিঃশ্বাস টানিবার সময় দশ অঙ্গুলি পরিমিত নিঃশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় বা'র অঙ্গুলি শ্বাসবায়ু বহির্গত হয়। নাসারন্ধ্র হইতে একটী কাঠি দ্বারা অঙ্গুলি মাপিয়া সেই স্থলে একটু তুলা ধরিয়া দেখিও, যদি তাহা ছাড়াইয়াও বায়ু যায়, তবে তুলা সরাইয়া দেখিবে, কতদূর তাহার গতি হইল;—স্বাভাবিক অবস্থায় বা'র অঙ্গুলির অধিক গতি হইলে বুঝিতে হইবে, জীবন ক্ষয়ের পথে গিয়াছে। প্রাণায়াম জানা থাকিলে, সহজে সেই ক্ষয় নিবারণ করা যায়।

মানবের নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় বা'র আঙ্গুল পরিমাণে নিঃশ্বাসবায়ু নির্গত হয়, কিন্তু ভোজন, গমন, রমণ, গান প্রভৃতি কার্য্যবিশেষে স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। যথা—

দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিদশাঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতৌ মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে॥

গান করিবার সময়ে ষোল অঙ্গুলি, আহার করিবার সময়ে কুড়ি অঙ্গুলি, গমন কালে চব্বিশ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ত্রিশ অঙ্গুলি এবং স্ত্রী-সংসর্গকালে ছত্রিশ অঙ্গুলি নিঃশ্বাসের গতি হইয়া থাকে। শ্রমজনক ব্যায়াম কার্য্যে তাহারও অধিক নিঃশ্বাস পাত হইয়া থাকে।

যে কোন কার্য্যকালেই হউক, বা'র অঙ্গুলির অধিক নিঃশ্বাসের গতি হইলেই জীবনী শক্তির বা প্রাণের ক্ষয় হইতেছে বুঝিতে হইবে। প্রাণায়ামাদি দ্বারা এই অস্বাভাবিকী গতিকে স্বভাবে রাখাই দীর্ঘজীবন লাভের প্রধানতম উপায়। মৈথুনে যে জীবনের হানি হয়, নিঃশ্বাসের গতির দীর্ঘতাই তাহার প্রধান কারণ। আবার যাহাদের জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়াছে, স্থূল কথায় ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ জন্মিয়াছে, তাহাদের নিঃশ্বাস অতি ঘন ঘন ও আশী আঙ্গুল দীর্ঘ পাত হয়, কাজেই তাহাদিগকে আরও শীঘ্র মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া থাকে।

যোগাঙ্গীভূত ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা ঐ নিশ্বাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই জীবনী-শক্তি রক্ষার একমাত্র উপায়। আবার যে ব্যক্তি যোগ প্রভাবে স্বাভাবিক গতি দু'এক অঙ্গুলি করিয়া হ্রাস করিতে পারে,

সর্ব্বসিদ্ধি ও অমানুষী ক্ষমতা তাহার করতলগত।* এই রূপে যোগের উচ্চাবস্থায় উপনীত হইলে একেবারে বায়ু নিরোধ করিয়া বহুদিন কাটাইয়া দিতে পারা যায়। প্রাচীন যোগিগণের কথা স্বতন্ত্র; বর্ত্তমান কালেও ভূকৈলাসের সাধুর কথা কে না জানে? ৺কাশীধামের ত্রৈলঙ্গস্বামীর বিবিধ বিচিত্র শক্তিলীলা কে না শুনিয়াছে? ত্রৈলঙ্গস্বামী দুই চারি ঘণ্টা জলমগ্ন হইয়া থাকিতেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইত না। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে ম্যাক্‌গ্রেগর প্রভৃতি সাহেবের সম্মুখে হরিদাস সাধুকে চল্লিশদিন এক বাক্সের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল; চল্লিশদিন পরে দেখা হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

প্রাণবায়ুর বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নিঃশ্বাস নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইলে আয়ুক্ষয় নিশ্চিত। নিদ্রা, গান, মৈথুন প্রভৃতি যে যে কার্য্যে প্রাণবায়ু অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, সেই কার্য্য যত অল্প করিবে, ততই সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে সন্দেহ নাই। নিয়মিত রূপে প্রাণায়াম করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে। প্রাণ শব্দে বায়ু, আর আয়াম অর্থে নিরোধ; প্রাণায়ামের সময় কুম্ভক করিলে প্রাণবায়ু নিরোধ হয়, শ্বাস প্রবাহ হয় না, এই হেতু জীবন দীর্ঘ ও রোগশূন্য হয়।

---

* একাঙ্গুলকৃতন্যূনে প্রাণে নিষ্কামতি মতা।
আনন্দস্তু দ্বিতীয়ে স্যাৎ কবিশক্তিস্তৃতীয়কে॥
বাচঃ সিদ্ধিশ্চতুর্থে তু দূরদৃষ্টিস্তু পঞ্চমে।
ষষ্ঠে ত্বাকাশগমনং চণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে॥
অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধয়ো নব।
দশমে দশমূর্ত্তিশ্চ ছায়ানাশো দশৈককে॥
দ্বাদশে হংসচারশ্চ গঙ্গামৃতরসং পিবেৎ।
আনখাগ্রে প্রাণপূর্ণে কস্য ভক্ষ্যঞ্চ ভোজনম্॥

—পবন-বিজয় স্বরোদয়।

শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন, কার্য্য গুণে পরমায়ু বৃদ্ধি এবং কার্য্য দোষে অল্পায়ু হয়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বলেন, কাম, ক্রোধ, চিন্তা, দুরাশা প্রভৃতিই জীবের মৃত্যুর কারণ। একই কথা,—স্বরশাস্ত্রকারগণ এক কথায় ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়েছেন। শ্বাসের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতাই দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু হইবার প্রধান কারণ। শাস্ত্রবেত্তাগণের যুক্তির সহিত স্বরজ্ঞানীর সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। কেননা তাঁহারা যে সকল কার্য্যে মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই সকল কার্য্যেই নিঃশ্বাসের দীর্ঘগতি অবধারিত হইয়াছে। অতএব যাহার যত প্রাণবায়ু অল্প খরচ হইবে, তাহার তত আয়ুবৃদ্ধি ও রোগাদি অল্প হইবে। তদন্যথায় নানাবিধ পীড়া ও আয়ুনাশ হইবে, সন্দেহ নাই। বিচক্ষণ পাঠক নিঃশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্যাদি করিতে পারিলে দীর্ঘজীবন লাভ বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে বুঝিতে পারিবে। নিঃশ্বাসবায়ুর একেবারে বাহ্যগতি রুদ্ধ করিয়া তাহা অন্তরাভ্যন্তরে প্রবাহিত করিতে পারিলে, সেই যোগেশ্বর হংস স্বরূপ হইয়া গঙ্গামৃত পান করতঃ অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার মস্তকের চুল হইতে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রাণ বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে; সুতরাং তাঁহার পান-ভোজনের প্রয়োজন নাই। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করতঃ অন্তরমধ্যে পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। যে উপায়ে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, তাহাতেই মানবের মুক্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই মৃত্যু জানিবার উপায়

—•—

প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে সূর্য্যাস্ত যেমন অবশ্যম্ভাবী, দিবালোক অপসারিত হইলে যামিনীর অন্ধকার যেমন নিশ্চিত, তেমনি জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু হইবেই। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্

—মোহ-মুদ্গর

বাস্তবিক অনবরত পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর সংসারে কোন বিষয়ের স্থিরতা নিশ্চয়তা নাই; কেবল মৃত্যু নিশ্চিত। আমাদের দেশের মধু কবি মধুর স্বরে গাহিয়া গিয়াছেন—

জন্মিলে মরিতে হবে,

অমর কে কোথা কবে,

চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে?

এই মর জগতে কেহই অমরত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কেবল শাস্ত্র মুখে শুনা যায় যে—

"অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ॥

কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥"

এই সাতজন মাত্র মৃত্যুকে রম্ভা দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাহাও লোক লোচনের প্রত্যক্ষীভূত নহে। মৃত্যু অনিবার্য্য, জন্মগ্রহণ করিলে আর কিছু হউক বা না হউক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আজ হউক, কাল হউক কিম্বা দশ বৎসর পরে হউক, একদিন সকলকেই সেই সর্ব্বগ্রাসী শমন সদনে গমন করিতেই হইবে।

একদিন মৃত্যু যখন নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য, তখন কতদিন পরে প্রেম-পুত্তলিকা প্রণয়িণী ও প্রাণাধিক পুত্র কন্যা ছাড়িয়া, ধনজনপূর্ণ সুখের সংসার ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে জানিতে পারিলে সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় এবং নাবালক পুত্র-কন্যার তত্ত্বাবধারণের ও রক্ষণা-বেক্ষণের সুবন্দোবস্ত, বিষয়বিভবের সুশৃঙ্খলা বিধান করা যায়। আরও সুবিধা এই যে মৃত্যুযবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি নিপতিত হইলে পরকালের পথও পরিষ্কৃত করা যায়। সংসার আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান ও মায়ামরীচিকায় মুহ্যমান, বিবিধ বিলাস-বাসনা-বিজড়িত হইয়া যাহারা মরজগতে অমর ভাবিয়া সতত স্বার্থসাধনে রত—ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তিতে স্থান দেয় না, তাহারাও যদি জানিতে পারে যে মৃত্যু ভীষণবদন ব্যাদান করিয়া সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, আর ছয় মাস, এক মাস কি দশদিন পরে প্রাণা-রামদায়িনী সহধর্ম্মিণী ও আত্মৈকাংশ ছাড়িয়া—পুত্রকন্যা, সাধের ধন-ভবন, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ ইত্যাদি ভব সংসারের সব ছাড়িয়া শূন্য হস্তে নিঃসম্বল অবস্থায় একা চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে অবশ্য তাহারা তত্ত্বপথের পথিক হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা পরলোকের ইষ্ট সাধন করিতে পারে। তন্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ ও স্বরোদয় প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুপ্রকার মৃত্যুলক্ষণ লিখিত আছে। তৎপাঠে মৃত্যুলক্ষণ নির্দ্ধারণ করা সাধারণের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য। আমি যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট যে সকল মৃত্যুলক্ষণ শুনিয়া বহুবার বহুলোকের দ্বারা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ সত্য ফল দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বহু-পরীক্ষিত কয়েকটী লক্ষণের মূল উদ্ধৃত করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া সাধারণের সুবিধার্থে বঙ্গভাষায় লিখিত হইল।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিনে এক দিবারাত্র যাহার উভয়

নাসিকায় সমান বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ তিন বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইবে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে দুই দিবারাত্র যাহার দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, সেই দিন হইতে দুই বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে তিন দিবারাত্র যাহার দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নিঃশ্বাস বাহির হয়, সেই দিন হইতে এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইবে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে নিরন্তর যাহার রাত্রিকালে ইড়া ও দিবসে পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে ষোল দিন পর্য্যন্ত যাহার দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিন হইতে এক মাসের শেষ দিনে তাহার মৃত্যু হইবে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিনে ক্ষণমাত্রও বাম নাসাপুটে শ্বাসবহন না হইয়া, যাহার দক্ষিণ নাসায় নিরন্তর নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, পনর দিন মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার মল, মূত্র, শুক্র ও অধোবায়ু এককালে নির্গত হয়, দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়।

যে ব্যক্তি নিজের ভ্রূর মধ্যস্থান দেখিতে না পায়, সেই দিন হইতে সপ্তম কিম্বা নবম দিনে তাহার মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি নাসিকা দেখিতে না পায়, তিন দিনে এবং জিহ্বা দেখিতে না পাইলে, এক দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে সন্দেহ নাই। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি আকাশস্থ অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃকামণ্ডল নামক নক্ষত্র দেখিতে পায় না।

যাহার উভয় নাসাপুটে একেবারেই নিঃশ্বাস প্রবাহ রহিত হইয়া মুখ দিয়া শ্বাস বাহির হয়, সদ্য সদ্যই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

যাহার নাসিকা বক্র, কর্ণদ্বয় উন্নত হয় এবং নেত্র দ্বারা অনবরত অশ্রু নির্গত হয়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়।

ঘৃত, তৈল অথবা জলচ্ছায়ায় আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনকালে যে ব্যক্তি নিজ মস্তক দেখিতে না পায়, সে এক মাসের অধিক বাঁচে না।

সুরতে রত হইলে প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে যে ব্যক্তির হাঁচি হয়, সে ব্যক্তি পঞ্চম মাসের অধিক জীবিত থাকে না।

স্নান করিবা মাত্র যাহার হৃদয়, চরণ ও মস্তক শুষ্ক হয়, তিন মাসে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে গর্দ্দভারূঢ়, তৈললিপ্ত ও ভূষিত দর্শন করে, সে ব্যক্তি শীঘ্র যমালয়ে নীত হয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে লৌহদণ্ডধারী, কৃষ্ণবস্ত্রপরিধান, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে সম্মুখে দর্শন করে, সে ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে যমালয়ে অতিথি হইয়া থাকে।

যাহার সর্ব্বদা কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক হয়, তাহার ষণ্মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়।

বিনা কারণে সহসা স্থূলকায় ব্যক্তি যদি কৃশ হয় এবং কৃশ ব্যক্তি স্থূল হয়, তবে এক মাস মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

হস্ত দ্বারা কর্ণকুহর অবরুদ্ধ করিলে, কর্ণের অভ্যন্তরে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার শব্দ শুনিতে না পায়, এক মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে।

বাঙ্গালীর চিরপ্রচলিত মাটির প্রদীপ, যাহা সর্ষপ তৈল দ্বারা সলিতা সহযোগে জ্বালিত হয়, সেই প্রদীপ নির্ব্বাণের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হইলে ষণ্মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

যাহার দন্ত ও কোষ টিপিলে বেদনা অনুভূত হয় না, তিন মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ মৃত্যু চিহ্ন আছে; কিন্তু সমস্ত বলা সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। আর এক কথা, এই সকল লক্ষণ কাহারও শরীরে প্রকাশ পা হইলেও না হইতে পারে। বিশেষতঃ নিঃশ্বাসের গতি ও শ্বাসের পরিচয় জানা না থাকিলে, প্রথম লক্ষণগুলি বুঝা যায় না। সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, কয়েকটী লক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তির হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। পরীক্ষায় তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য একটী লক্ষণ লিখিত হইল।

দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নাকের সমান মস্তকের উপর কিম্বা ভ্রূর উর্দ্ধে কপালের উপর রাখিয়া নাসিকার সম্মুখে হাতের কব্জীর নীচে সমান ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে. হাত অত্যন্ত সরু দেখা যায়; ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যে দিন হাতের সহিত মুষ্টির যোগ নাই, হাত হইতে মুষ্টি বিভিন্ন দৃষ্ট হইবে, সেই দিন হইতে ছয় মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে বুঝিতে হইবে।

ঐ লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পরে প্রত্যহ প্রাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নেত্রের কোন কোণ কিঞ্চিৎ টিপিয়া ধরিলে তাহার বিপরীত দিকে নেত্রাভ্যন্তরে সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় একটী বিন্দু দৃষ্ট হয় কি না পরীক্ষা করিবে। যে দিন হইতে ঐ জ্যোতিঃ দেখা না যাইবে, সেই দিন হইতে দশ দিনে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

আমি অনেক লোকের দ্বারা ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ দুইটী লক্ষণ সকল ব্যক্তির শরীরে হইবে; ঐ লক্ষণ বুঝিবার জন্য কাহারও নিকট বিদ্যা-বুদ্ধি ধার করিতে হইবে

না। এই দুইটী পরীক্ষা সকলেই নিজে নিজ নিজ শরীরে দৃষ্টি করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব-লক্ষণ বুঝিতে পারিবে।

যোগী, অযোগী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে মৃত্যুর পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার ঘটিয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ সকল লক্ষণ বুঝিতে পারিলে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া অতি কর্ত্তব্য। যেন ধন-সম্পদ্, বিষয়-বিভব, স্ত্রী-পুত্রাদির ভাবনা ভাবিয়া, অসার মায়ামোহে মুহ্যমান হইয়া আসল কথা ভুলিও না। কিছুই সঙ্গে যাইবে না। কেবল—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

অতএব পরজন্মে যাহাতে পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখসম্পদ্ ভোগ করা যায়, তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া একান্ত, কর্ত্তব্য। মৃত্যুকালীন সাংসারিক কোন বিষয়ে চিত্ত আসক্ত থাকিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

—গীতা, ৮-৬

মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য পরমযোগী রাজা ভরত, হরিণশিশুকে চিন্তা করিতে করিতে মরিয়াছিলেন বলিয়া পরজন্মে হরিণদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "তপ জপ বৃথা কর মরিতে জানিলে হয়" এই চলিত বাক্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল কারণে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে যেরূপ রূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সে তদনুরূপ রূপ প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। এই জন্য মৃত্যুকালে বিষয়-বিভবাদি ভুলিয়া ভগবানের পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

গীতা, ৮।৫

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের চিন্তা করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব সকলেরই মরণের পূর্ব্বলক্ষণগুলি জানিয়া সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহারা যোগী, তাহারা মৃত্যুকে নিকট জানিয়া যোগাবলম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে জ্যোতিঃর পথে গমন করিয়া উত্তমাগতি লাভ করিতে পারিবে। অন্ততঃ মৃত্যুকালে যদি যোগ-স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তবে জন্মান্তরে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে। আর যাহারা অযোগী, তাহারা মরণের লক্ষণগুলি দেখিয়া অস্থির না হইয়া, যাহাতে ভগবানের প্রতি সতত মন সমর্পণ করিয়া থাকিতে পার, নিয়ত সেই চেষ্টা করিবে। ভগবানের ধ্যান ও তাঁহার নাম স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না। পরিশেষে—

উপসংহার

—*—

কালে ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় আমার প্রত্যক্ষ সত্য—বিশেষতঃ স্বরকল্পের "বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য" শীর্ষক হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল, তাহা বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। অতএব পাঠকগণ জ্ঞান-গরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠগণের প্রচারিত সাধনে অবিশ্বাস করিও না। তাঁহাদের সাধনসমুদ্র মন্থনে এই সুধার উদ্ভব হইয়াছে, এ সুধাপানে মর জগতে মানুষ অমরত্ব লাভ করিবে, আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইবে। পাশ্চাত্য দেশীয়গণের বাহ্য বিজ্ঞান দেখিয়া ভুলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে অনাদর করিলে, স্বগৃহে পায়সান্ন পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহে মুষ্টিভিক্ষা করার ন্যায় বিড়ম্বনা ভোগ করা হইবে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার সীমায় পৌছিতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে। আজিও হিন্দুগণ যে জ্ঞান বক্ষে রক্ষা করিতেছে, তাহা বুঝিবার শক্তি অন্যের নাই। এই দেখ না, বাঙ্গালী ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করতঃ হোমার, ভার্জ্জিল, ডান্টে, সেক্সপিয়র প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজ-কবিগণের পুঁজিপাটা তন্ন তন্ন করিয়া বেওয়ারিস ময়দা ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহাতেই পরিণত করিতেছে; কিন্তু কয়জন ইংরাজ শঙ্করাচার্য্যের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? কোন্ ইংরাজ পাতঞ্জলসূত্রের এক ছত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইবে? তবে হিন্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতা-শৃঙ্খল পরিয়া জড় হইয়াছে, কাজেই হিন্দুকে জড়োপাসক প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে,—নতুবা যে জড়বাদীদের ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জায় জড়ত্ব, যাহাদের ধর্ম্ম এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় যথেচ্ছাগমনে পরমুখাপেক্ষী, আশ্চর্য্যের বিষয়

তাহারাই হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি পাঠক! "গওায় আণ্ডা" বলার ন্যায় অপরের যুক্তিতে "হাঁ" বলিয়া যাওয়া লঘুচেতার কার্য্য। হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, হিন্দু যাহা করে, তাহা একবিন্দুও কুসংস্কার এবং মিথ্যা নহে। হিন্দুধর্ম্ম গভীর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানসম্মত, দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত ব্যক্তিগণ ভাবিয়া থাকে যে, যাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই, তাহার কোনও মূল্যও নাই ;—তাই তাহারা সকল কাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। বিজ্ঞান জ্ঞানের একমাত্র উপায় হইলেও সকল বিষয়ের উপযোগী নহে অথবা বুদ্ধি সকল লোকের সকল কালের উপযোগী নহে। সকল অবস্থাতেই যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হয়, তাহা হইলে মানবের দুঃখের সীমা থাকে না। প্রত্যেক কার্য্যের বৈজ্ঞানিক সত্য জানিয়া তবে তাহারঅনুষ্ঠান করিব, ইহা বিবেচনা ভুল। নির্জীব রজঃকণা হইতে এমন দেবোপম মনুষ্যসন্তান কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? রজনীতে কেনই বা জীব নিদ্রাতে আচ্ছন্ন হয়, রজনী অবসানেই বা কে আবার তাহাদের জাগাইয়া দেয়? পালাজ্বর এক বা দুই দিন অন্তর ঘড়ি দেখিয়া ঠিক নিয়মিত সময়ে অলক্ষিতে আসিয়া কিরূপে রোগীকে আক্রমণ করে? এই সকল বিষয়ের যুক্তি কেহ খুঁজিয়া পাইয়াছ কি?—তবে অসম্ভব, অযৌক্তিক বলিয়া চীৎকার করা কেন? বিশ পনর টাকা বেতনের রেলওয়ে সিগ্ন্যালারগণ "টরেটক্কা" শিখিয়া তবে সংবাদ "আদান-প্রদান" না করিয়া যদি বলে, "কোন্ শক্তির বলে তারযোগে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া ফাঁকা সংবাদদাতার কার্য্য করিব না"—তবে তো তাহার এ জীবনে চাকুরীর মধুর স্বাদ উপভোগ হইবে না। কেননা, তাহাদের স্থূল বুদ্ধিতে সেই বিশাল তত্ত্বের ধারণা একেবারেই অসম্ভব। নিজ বিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করে

বলিয়া শিক্ষিতের মান নহে। পশুতেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছে, কিরূপ কার্য্য করিয়া লোকে কিরূপ ফল পাইয়াছে ; সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া যথা-প্রয়োগ করিতে পারে বলিয়া শিক্ষিতের এত মান। মূর্খ কিছুই জানে না, আপন প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করে, তাই তাহার পদে পদে দোষ। বর্ত্তমান যুগে হীনবুদ্ধি অল্পায়ু হইয়া আমরা ধর্ম্মেরও যুক্তি-বিজ্ঞান খুঁজিয়া বেড়াই ; কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই, তাহা কে জানে ? তবে বহুকালের বহুপুরুষপরম্পরায় প্রকাশিত জ্ঞান-গরিমা গণ্ডূষে উদরসাৎ করা একেবারে অসম্ভব। ভগবানের বিশাল বিচিত্র ভাণ্ডারে অনন্তশক্তি-সম্পত্তি সঞ্চিত, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, পশ্চাতে, সম্মুখে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, ইহপরকালের কত অগণিত, অজানিত, অপ্রকাশিত তত্ত্ব স্তরে স্তরে সজ্জিত, কে তাহার ইয়ত্তা করে ? অনন্তের অনন্ত শক্তিতত্ত্ব নিরূপণ করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে। তাই বলিতেছি, জ্ঞান-গরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধিকার অনুসারে ধর্ম্মকার্য্য করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আমাদের কি যে স্বভাবের দোষ, কেহই আপন বুদ্ধির হীনতা স্বীকার করিতে চাই না। যে সর্ব্ববাদিসম্মত বোকা, সেও তাহা বিশ্বাস করে না। একদা আমি, আমার জন্মপল্লীর সূত্রধরগণের কারখানায় বসিয়া একটী বন্ধুর সহিত নিউটন-প্রচারিত মাধ্যাকর্ষণের আলোচনা করিতেছিলাম। নিকটে এক জন সূত্রধর গাড়ীর পায়া গড়িতেছিল, "ফলটী শূন্যে বা ঊর্দ্ধে কিম্বা আশে পাশে না যাইয়া নিম্নে কেন পড়িল ?" এই বাক্যে সে হাসিয়া অস্থির ;—সে নিম্নে পড়ার কতকগুলি কাঠকাটা বুদ্ধির যুক্তি দেখাইয়া আমাদের এমন কি নিউটনকে পর্য্যন্ত গএ-আকার + ধএ-আকা"

বানাইয়া দিল। তবেই দেখ, আমরা নিজে সেই আর্য্য-ঋষিগণের জ্ঞান-গরিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই বিশালতত্ত্বের ধারণা হয় না—তাহা স্বীকার না করিয়া শাস্ত্রবাক্যকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেই। পাঠক! আমিও একদিন এই শ্রেণীর অগ্রণী ছিলাম। আমার যে গ্রামে জন্ম হয়, তথায় ভদ্রলোকের বাস নাই, যে দু'দশঘর ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের আলোক দেখে নাই অথচ পাশ্চাত্য-শিক্ষাদীপ্তও নহে—অন্ধ বিশ্বাসী। কেবল বিরাট তর্কজাল, জাতীয় দলাদলি, গ্রামে না যাইয়া পিঁড়েই বসিয়া পেঁড়োর সমাচার প্রভৃতি গ্রাম্য বিজ্ঞতার বড়াই লইয়া কালযাপন করে। সন্ধ্যা, আহ্নিক, তপ-জপ, পূজাদির প্রকৃত মর্ম্ম জানে না ও উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। কেবল সে গ্রাম নহে, প্রায় পৌণে ষোল আনা গ্রামেই এইরূপ দেখা যায়। এই জন্যই ক্রমে লোকের ধর্ম্মেকর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। আমিও ঐরূপ স্থানে জন্মিয়া তাহাদের সংসর্গে লালিত-পালিত হইয়া সেইরূপ শিক্ষাই প্রাপ্ত হই। পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা স্থানে নানা সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া মনের গতি কেমন কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দাঁড়াইল; তখন দেবতাতত্ত্ব ও আরাধনা কুসংস্কার মনে করিলাম। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞানে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই মহান্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যা উপাসনা নিত্যকার্য্য পর্য্যন্ত প্রত্যবায় মনে করিলাম। জ্ঞানের অভাবে বুঝিতাম না, সৃষ্টি-রাজ্যের সীমা কোথায়? হাল্‌ফ্যাসনের বিবেকবাদিগণের বিবেকবুদ্ধি-সম্মত নজিরে নব্য অভিজ্ঞ সাজিয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় বিজ্ঞ বৃদ্ধগণের কথা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না; অদৃষ্টচক্রনেমির আবর্ত্তনে—মতিগতির পরিবর্ত্তনে—গুরুর কৃপায় ও শাস্ত্র-মাহাত্ম্যে এবং কার্য্যকারণের প্রত্যক্ষতা ফলে পূর্ব্বের অপূর্ব্ব সংস্কার উড়িয়া

গিয়াছে ; সুতরাং এখন স্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্মমতের অসার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সেই জন্য বলিতেছি, আর্য্যশাস্ত্রের জটিল রহস্য উদ্ভেদ করিতে না পারিলে, নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধির ত্রুটী ভুলিয়া তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণের মহদ্বাক্য অগ্রাহ্য করিও না।

এই গ্রন্থের পরে রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি যোগের উচ্চাঙ্গ ও সাধন-কৌশল, ব্রহ্মচর্য্য-সাধনোপায়, বিন্দুসাধন, শৃঙ্গারসাধন, কুমারীসাধন, পঞ্চমকারে কালীসাধন প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত গুহ্যসাধন এবং রসতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধনা প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের জটিল রহস্য আমি "জ্ঞানী গুরু" "তান্ত্রিক গুরু" ও "প্রেমিক গুরু" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাধনপিপাসু সুকৃতিবান্ সাধকগণ যদি শাস্ত্রোক্তসাধনের সম্যক্ তত্ত্ব জানিবার বাসনায় এই দীনের আশ্রমে অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হন, তবে গুরুকৃপায় যেরূপ শিক্ষা আছে এবং আলোচনা-আন্দোলনে যে ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদনুসারে সাদরে সযত্নে বুঝাইতে ত্রুটী করিব না।

এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, অজ্ঞানের সুস্থূল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে, এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিরাজ্যের সীমা কোথায়—তখন বুঝিতে পারিবে, আর্য্যঋষিগণের যুগযুগান্তরের আবিষ্কৃত ও তপঃপ্রভাবে বিজ্ঞাত এবং লোকহিতার্থে প্রচারিত কি অমূল্য রত্ন শাস্ত্রে সজ্জিত আছে। অন্ধবিশ্বাস ভাল নহে, অনুসন্ধান করিয়া—সাধন করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি কর। পিতামহ, প্রপিতামহের অবলম্বিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তদনুসারে সাধন-ভজন করিয়া মানবজন্ম সার্থক ও পরমানন্দ উপভোগ কর। হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভিবাদ্যে দিগ-

দিগন্তর প্রতিধ্বনিত কর। হিন্দুধর্ম্মের বিমল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিয়া সমগ্র দেশের সমগ্র জাতিকে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্ল কর। আমরাও এখন জনম-মরণ-ভয়নিবারণ সত্যসনাতন সচ্চিদানন্দ পুরুষের পদারবিন্দ-বন্দনাপুরঃসর ভাবুক ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবো মাং প্রসাদতু॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু